অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

ভূমিকা

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

Albert Einstein,
a biography by Rabin Bandyopadhyay,

এপ্রিল ১৯৬২

প্রকাশক
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রক
হরিহর প্রেস
৯৩।২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীমতী ক্যাথেরীন ওয়েল্স্ পেয়্যার রচিত 'অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন' গ্রন্থ অবলম্বনে সম্প্রতি স্নেহাস্পদ শ্রীমান রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় একটি জীবনী লিখেছেন। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। শ্রীমতী পেয়্যার ছোটদের উপযোগী আইনষ্টাইনের জীবনী প্রথম ১৯৪৯ সালে লিখেছিলেন। বইটির ভূমিকায় তিনি বলেছেন, অধ্যাপক আইনষ্টাইনের সেক্রেটারী মিস্ হেলেন ডুকাস এবং তাঁর বন্ধু ও চিকিৎসক ডাঃ রুডল্ফ্ এরম্যানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই বইটি লিখেছেন। আইনষ্টাইনের বাল্য জীবনের অনেক কথা এ থেকে আমি জেনেছি। সকলেরই কৌতূহল হয়—এই রকম মনীষী কি পরিবেশে জন্মেছিলেন, বাল্যকালে কাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, কোথায় বা তাঁর শিক্ষাদীক্ষা হয়েছিল এবং এই অলোকসামান্য মহামানবের মানসিক পরিণতি কিভাবে ও কোথায় বিকাশ লাভ করেছিল। শ্রীমতী পেয়্যার লিখেছেন: যদিও আইনষ্টাইন জার্মানীর উলম্ শহরে জন্মেছিলেন, কিন্তু প্রথম যৌবনে যখন বার্নে সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেন তখন তিনি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মান দেশের নাগরিকত্ব বরণ করে নেন। আমি তাঁর সংস্পর্শে আসি ১৯২৫-২৬ সালে। তখন তিনি নিজেকে জার্মান বলেই গণ্য করতেন। জার্মানীর রাজনৈতিক পটভূমি তখন স্পষ্ট রূপ নেয় নি। হিটলার তখনও একজন অজ্ঞাত সৈনিক মাত্র। ষ্ট্রেশম্যান তখন চেষ্টা করছিলেন মিত্র শক্তির সঙ্গে যথাসম্ভব মিলেমিশে শান্ত পরিবেশে জার্মানীর শাসনকার্য চালাতে। আইনষ্টাইন তাঁদের দেশের লোক বলে জার্মান সরকার তখন গর্ব বোধ করতেন। পটসডাম মানমন্দিরের একটা অংশের নাম তখন 'আইনষ্টাইন টুরম্' বলে বিখ্যাত ছিল।

অনেক সময় তাঁর সঙ্গে ৫ নম্বর হ্যাবারল্যাণ্ড ষ্ট্রাসের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছি। অনেক সময় আমার সঙ্গে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানীরা থাকতেন। কাজেই বিদেশীদের চক্ষে তখন আইনষ্টাইনের প্রতি জার্মানীর বিরূপ মনোভাব ধরা পড়ার কথা নয়। আমার দেখা হবার কিছুদিন আগে তিনি জাপানে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং নানা কারণে ভারতবর্ষে আসা হয় নি বলে দুঃখও

প্রকাশ করেছিলেন আমার কাছে। অবশ্য আইনষ্টাইনের মনে ইহুদীদের ঐতিহ্যের ওপর শ্রদ্ধা ছিল। অনেক সময় তাঁর কথাবার্তায় সে কথা আমি বুঝতে পারতুম।

জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে একটা ইহুদী উপনিবেশ গড়ে উঠুক, যার রাজনৈতিক তত্ত্বাবধান ইংরেজদের হাতে থাকলে সবার চেয়ে কল্যাণকর হবে ইহুদীদের পক্ষে—এটা তিনি আমাকে একবার বলেছিলেন। আমি স্বদেশে ফিরে আসি ১৯২৬ সালের শেষভাগে। একনায়কদের স্বৈরাচার তিনি আদৌও পছন্দ করতেন না। একটা ছোট ঘটনা থেকে সকলে তাঁর এই মনোভাবের আভাস পাবেন।

১৯২৭ সালে কোমো নগরে ভল্টা শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইটালীর একনায়ক মুসোলিনী একটা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন আহ্বান করেন। যাবার নিমন্ত্রণ ছড়ানো হয়েছিল সারা বিশ্বে—এমন কি আমাদের দেশ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু সেখানে গিয়েছিলেন। অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন এবং মুসোলিনী তাঁদের আপ্যায়ন করেছিলেন প্রচুর। একমাত্র আইনষ্টাইন এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি এবং কোমোতে উপস্থিত ছিলেন না। মনে হয়, তিনি নিজের আচার-ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ভুল ধারণার সুযোগ দিতেন না যে, তিনি স্বৈরাচারী একনায়কদের সঙ্গে কোনরূপ আপোষ করতে ব্যগ্র।

১৯২৬ সালের পর থেকে মিত্রশক্তির সঙ্গে জার্মানীর সম্পর্ক ক্রমশ অবনতির দিকে যেতে লাগল। এর রাজনৈতিক কারণ ও তার ফলাফল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে সব প্রামাণিক ইতিহাস লেখা হয়েছে তাঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

দারুন আর্যামির বিষ যখন নাৎসী পার্টিতে গভীরভাবে প্রবেশ করলো, তখন জার্মানীর অনেক শহরে ইহুদীদের ওপর নির্মম অত্যাচার হলো। আইনষ্টাইন তখন বিশ্বজনের দরবারে তার প্রতিবাদ ও দমননীতির কঠোর সমালোচনা করেন। এর ফলে তাঁকে জন্মভূমি জার্মানী ছাড়তে হয় এবং অবশেষে তিনি আমেরিকার প্রিন্সটন শহরে আশ্রয় নেন। এখানে বিজ্ঞানী সমাজ তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলেন। শেষের দিকে তিনি আমেরিকার নাগরিকত্বও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নির্ভীক ও সতেজ মত সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার বহু উর্ধ্বে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকত। তাঁর লেখায়, কথাবার্তায় সবসময় সেটা প্রকাশ পেয়েছে।

মানুষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। অত্যাচার কিংবা অসত্যের কাছে কখনও মাথা নত করেন নি। মানুষের ওপর বিশ্বাস ছিল তাঁর অপরিসীম। নিজে অনেক অবহেলা সহ্য করেছিলেন, তাই বিজ্ঞানের নবীন ব্রতীদের তিনি স্নেহ করতেন। নতুন মতবাদ, যার মধ্যে সত্য নিহিত আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন তাকে তিনি খোলাখুলি সাহায্য ও প্রশ্রয় দিয়েছেন। সর্বক্ষেত্রেই তাঁর মতামতের একটা অভিনবত্ব ছিল। তুচ্ছ আত্মগরিমা কিংবা নিজের আর্থিক প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি কখনও ব্যগ্র ছিলেন না। অনেক সময় অনেক কথা হয়তো সকলের মনঃপূত হত না, তবু সকলেই জানত তিনি কোন ব্যক্তিগত কোণ থেকে সমালোচনা বা প্রচার করছেন না। আমার দুঃখ এই যে, জার্মানী ছাড়ার পরও আমি চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু আমেরিকায় গিয়ে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করতে পারি নি। আশা করেছিলুম যে আপেক্ষিকতাবাদের স্বর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে যখন তিনি বার্নে আসবেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু তার আগেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটলো। বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। এই মহাপুরুষের বিচিত্র জীবন-কথা বাংলায় প্রকাশ করে শ্রীমান রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

২ আগস্ট, ১৯৬২

সত্যেন বোস

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

বেশ কয়েক বছর আগে শ্রীমতী ক্যাথেরীন ওয়েনস্ পেয়্যার রচিত একটি গ্রন্থ অবলম্বনে বাংলাভাষায় মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের একটি জীবনী লিখেছিলুম। সেটি ছিল মূলত ভাষান্তর গ্রন্থ। পূজ্যপাদ মাস্টার মশাই বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। গ্রন্থটি পাঠকমহলে সমাদৃত হওয়ায় কয়েক বছরের মধ্যে সেই সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। কিন্তু নানা কর্মব্যস্ততার দরুন দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে প্রবৃত্ত হতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে যায়। ইতিমধ্যে আইনষ্টাইনের জন্মশতবার্ষিকী সমাসন্ন হওয়ায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন স্বরূপ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। সেই সঙ্গে শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানীর কর্ণধার শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ ও তাঁর পুত্র শ্রীমান ভাস্কর বারবার তাগিদ দিয়ে আমাকে এবিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দিয়ে মনে হলো, গ্রন্থটি নতুন করে লেখা প্রয়োজন এবং এতে কয়েকটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করা কর্তব্য। সেই অনুযায়ী এই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে দুটি নতুন অধ্যায় এবং কয়েকটি নতুন ছবি সংযোজিত হয়েছে। আগের সংস্করণের মূল ধারা অনুসৃত হলেও এটিকে আদ্যোপান্ত নতুন করে লেখা হয়েছে। তাই রূপান্তরিত এই সংস্করণটি এখন আর ভাষান্তর নয়, নিজস্ব রূপেই আত্মপ্রকাশিত।

পরিবর্ধিত এই সংস্করণটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে প্রকাশের জন্যে শ্রীভূমির কর্তৃপক্ষ চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। এজন্যে তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তবু যদি কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে থাকে, তার দায়িত্ব তাঁদের নয়, লেখক হিসেবে দায়িত্ব আমারই। বিড়লা শিল্প ও কারিগরী প্রদর্শনশালার কর্তৃপক্ষ আইনষ্টাইনের কয়েকটি ছবি দিয়ে আমাকে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন; তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। প্রথম সংস্করণের মতো পরিবর্ধিত এই নতুন সংস্করণটি পাঠকসমাজের সমাদর লাভ করলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

প্রথম অধ্যায়

নৌ-কম্পাস

পাঁচ বছরের একটি ছেলে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। এই কিছুদিন হলো সে অসুখ থেকে সেরে উঠেছে, কিন্তু এখনও তার জ্বর-জ্বর মনে হচ্ছে। ছেলের এই অস্বস্তি দেখে তার বাবা বেশ উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি তাকে এমন একটা ছোট খেলনা দিতে চাইলেন, যা তার অস্বস্তির কারণ না হয়ে তাকে আনন্দই দেবে। তিনি ছেলের হাতে একটা নৌ-কম্পাস এনে দিলেন এই ভেবে যে, কম্পাস-বাক্সের মধ্যেকার ঘূর্ণ্যমান কাঁটাটা হয়তো তার মনে কিছু আনন্দের খোরাক যোগাবে। তখন কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, কি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সূচনা তিনি করে দিলেন! যন্ত্রটা পেয়ে ছেলেটি প্রথমে অলসভাবেই তা নাড়াচাড়া করলো। কিন্তু পরে যখন সে দেখলো একটা সজীব পদার্থের মত সেটা সব সময় নড়াচড়া করছে, তখন জিনিসটার প্রতি সে কৌতূহলী হয়ে উঠলো। এতক্ষণ সে বিছানায় শুয়ে শুয়েই যন্ত্রটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, কিন্তু এবার জিনিসটাকে ভাল করে দেখবার জন্যে সে উঠে বসলো।

ক্ষুদে বাক্সটা হাতে নিয়ে সে যখন দেখলো, বাক্সের ভেতরকার কাঁটাটা তার ঘরবাড়ির বাইরে পৃথিবীর প্রান্তভাগের এক রহস্যময় শক্তির প্রভাবে ঘুরছে, তখন উত্তেজনায় সে কাঁপতে লাগলো।

বিজ্ঞানের রহস্যময় জগতের সঙ্গে এই হলো অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের প্রথম পরিচয়। এতক্ষণ তার যে ছটফটানি ছিল তা দূর হয়ে গেল। সে চিৎ হয়ে বালিশে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো। কম্পাসটা ছেলেকে কেন উত্তেজিত করছে, তার কারণ বুঝতে না পেরে বাবা একটু ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু ছেলে তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলো। তিনি তার উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন।

ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতির রহস্যে অ্যালবার্ট মুগ্ধ হয়ে থাকত। ছোট ছেলেরা সাধারণত ছুটোছুটি ও খেলা করে বেড়ায়। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণের দরুন অ্যালবার্ট অন্যান্য ছেলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকত। ছেলেদের ছুটোছুটি চিৎকার ভুলে গিয়ে সে শান্ত ও স্বপ্নালু হয়ে একা ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত। যে ছেলের মধ্যে এত অল্প বয়সে বিজ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল, তাকে কোনো কোনো ব্যাপারে কিন্তু পিছিয়ে-পড়া বলে মনে হত। কথা বলতে শেখা ও নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাপারে তার দেরী হয়েছিল অনেক। চলাফেরার ব্যাপারেও সে ছিল মন্থর। সৌভাগ্যক্রমে বালক অ্যালবার্ট এমন মা-বাবা পেয়েছিল, যাঁরা পরম ধৈর্যের সঙ্গে তাকে বোঝবার চেষ্টা করতেন। আমরা কোনো সময় এমন ঘটনার কথা জানি না যখন তাঁরা বালক অ্যালবার্টকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজে বা বন্ধুত্ব স্থাপনে বাধ্য করতেন। শুধু এক স্কুলে পাঠাবার সময় তাঁরা জোর করতেন এবং সেটা না করে তাঁদের উপায়ান্তর ছিল না। সারা জীবন ধরে, বিশেষ করে শিশু-বয়সে, অ্যালবার্ট ছিল ভীষণ লাজুক। তার মা-বাবা একথা জানতেন বলেই তাঁরা তাকে মনমতো বন্ধু ছেড়ে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করবার জন্যে চাপ দিতেন না। চিন্তাশীল ও কল্পনাপ্রবণ এই ছেলেটি প্রকৃতি, ফুল-পাখি ও তার বাবার বাগানের যাবতীয় আশ্চর্যজনক জিনিস নিয়েই মেতে থাকতে ভালবাসত। বাবার বাগানে সে খেলা করত এবং নিজে গান বেঁধে নিজের মনেই গাইত।

জার্মানীর দক্ষিণে ব্যাভেরিয়া নামে একটি প্রদেশ আছে। এই

প্রদেশের উল্‌ম শহরে ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ অ্যালবার্ট আইন-স্টাইনের জন্ম হয়। ডানিয়ুব নদীর বাম তীরে উল্‌ম শহরটি অবস্থিত। এই শহরটি তিনটি নদীর সঙ্গমস্থল। ইলার নদী শহরের ঠিক ওপর দিকে ডানিয়ুব নদীতে এসে পড়েছে। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ছোট নদী ব্লাউ এবং ঠিক নিচে ডানিয়ুব এসে মিলেছে। ব্লাউ নদীর একেবারে জলের ধারে ষোড়শ শতাব্দীর বিচিত্র ঘরবাড়ি দেখা যায়।

নবম শতাব্দী থেকে উলম্‌ শহরের পথের ওপর বহু ইতিহাস রচিত হয়েছে। ইউরোপের অপর যে-কোনো স্থান অপেক্ষা দীর্ঘকাল ধরে সেখানে মিয়েস্তার সিঙ্গারস সম্প্রদায় সঙ্গীত-উৎসব ও প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠান করেছে। এমন কি উৎসবের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হানস্‌ সার্কাসের উপস্থিতিও অসম্ভব নয়। এই শহরে সেনাপতি ম্যাক্‌ ও তাঁর অস্ট্রীয় সৈন্যরা নেপোলিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর গথিক গীর্জাসমূহের অন্যতম সেখানে অবস্থিত। শহরের ঘরবাড়ির শীর্ষদেশ ছাড়িয়ে এই গীর্জার চূড়া গগন স্পর্শ করেছে। উলম্‌-এর এই সমস্ত ঐতিহ্যমণ্ডিত পটভূমিকায় অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন জন্মগ্রহণ করেন।

পুত্র-সন্তানের জন্মে আইনষ্টাইন দম্পতিকে অভিনন্দন জানাতে এলেন প্রতিবেশীরা। কিন্তু তাঁরা তখন মানবসভ্যতার অন্যতম মহা-মনীষীর আবির্ভাবকে স্বাগত জানান নি। এবং প্রবীণ পারিবারিক ডাক্তারও প্রসবের কাজ সুসম্পন্ন হওয়ায় স্বভাবতই আনন্দিত হয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি তখন উপলব্ধি করতে পারেন নি যে মানব-জাতির প্রতি কী এক মহৎ কর্তব্য তিনি সম্পাদন করলেন !

অ্যালবার্ট যখন মাত্র এক বছরের শিশু, তখন তার মা-বাবা উলম্‌ শহর ছেড়ে অপর একটি ঐতিহাসিক ও আগের মতোই সৌন্দর্যমণ্ডিত শহরে চলে এলেন। এই শহরটির নাম মিউনিক। এটি দক্ষিণ জার্মানীর অন্তর্গত ব্যাভেরিয়ার গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। অ্যালবার্টের বয়স যখন দুবছর তখন মিউনিকে তার বোন মাজা জন্মগ্রহণ করে।

এরপর তার আর কোনো ভাইবোন হয় নি। সুতরাং মাজাকে নিয়েই তাদের চারজনের পরিবার সম্পূর্ণ হলো।

অ্যালবার্টের বাবার ব্যবসাগত প্রয়োজনের তাগিদেই সমগ্র পরিবারটিকে মিউনিকে আসতে হয়েছিল। বৃহত্তর ও অধিকতর সমৃদ্ধিশীল শহরের কথা চিন্তা করেই তার বাবা হারম্যান আইনষ্টাইন মিউনিকে যেতে মনস্থ করেন এবং সেখানে তাঁর ছোট ভাই জ্যাকবের সাহায্যে একটি ছোটখাটো বিদ্যুৎ রাসায়নিক কারখানা চালু করলেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুফলপ্রসু বলে পরে প্রমাণিত হয়েছিল। এরপর পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো এবং কয়েক বছর পরে যখন অ্যালবার্টের বয়স পাঁচ ও তার বোনের বয়স তিন বছরের কাছাকাছি, তখন তারা ভাড়া-করা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে শহরতলীতে একটা বড়ো বাড়িতে উঠে যেতে পেরেছিল। এই নতুন বাড়িটি বালক আইনষ্টাইনের কাছে পরম আনন্দদায়ক হয়েছিল। কারণ এই বাড়িটির পরিবেশ ছিল অপূর্ব। চারিদিকে বড়ো বড়ো গাছ, সাজানো বাগান ও তার মাঝখানে এই বাড়িটি। এই শান্ত, মনোরম ও নির্জন পরিবেশে অ্যালবার্ট তার ষোল বছর বয়সকাল পর্যন্ত পরম আনন্দে কাটিয়েছিল।

অ্যালবার্টের কাকা জ্যাকব তার বাবার ব্যবসায়ে সহযোগী ছিলেন এবং তাদের পরিবারের সঙ্গেই বাস করতেন। এই কাকা অ্যালবার্টের জীবনগঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনিই একদিন এক আকস্মিক মন্তব্যের দ্বারা অ্যালবার্টের কাছে গণিত-রাজ্যের সিংহদ্বার খুলে দেন।

দশ বছরের বালক অ্যালবার্ট একদিন তার কাকাকে জিজ্ঞেস করলে, 'কাকা, বীজগণিত জিনিসটা কি?'

বালক আইনষ্টাইনের কাছ থেকে প্রতিদিন এরকম অজস্র প্রশ্ন শুনতে জ্যাকব অভ্যস্ত ছিলেন। তাই এই প্রশ্ন শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটা মজার উত্তর দিলেন, 'বীজগণিত হচ্ছে এক ধরনের অলসের পাটীগণিত। যে জিনিসটা তুমি জানো না তার

নাম দাও x এবং তারপর ওই অজানা জিনিসটাকে খুঁজে বার কর।'

এইরকম আরো কঠিন কঠিন হেঁয়ালি অ্যালবার্টের ভালো লাগত। কাকার পরিহাসজনক কথাটা তার কাছে এক নতুন জগতে অভিযানের প্রেরণা জোগালো। বীজগণিত সম্বন্ধে আরো ভালো-ভাবে জানবার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো এবং x, y, z-এর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে সে নিজে নিজেই পরীক্ষা শুরু করে দিলো। যে-কেউ তাকে বীজগণিত বা পাটীগণিতের বই এনে দিত সে-ই তার কাছে বন্ধু হয়ে উঠত। বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে যে ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের বই পেলে খুশী হয় সে-সব বই-এর চেয়ে অ্যালবার্ট বেশি পছন্দ করত বীজগণিত বা পাটীগণিতের বই। গণিতের বই পেলে তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না করা পর্যন্ত সে পাগলের মতো সেগুলো নিয়ে মেতে থাকত। এইভাবেই সে গণিত বিষয়ে তার সহপাঠীদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যায়। আইনষ্টাইনের শিশুকালে জার্মানীর স্কুলে জ্যামিতি পড়ানো হত না। কিন্তু আইনষ্টাইন যখন ডক্টর স্পীকার রচিত একখানা জ্যামিতি বই (লেহার বুক্ ডের এ বেনেন জিওমেট্রি) পেল, তখন দু তিনটি সম্পাদ্য ছাড়া গোটা বইটাই সে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আয়ত্ত করে ফেললো। গণিতে তার প্রতিভা দেখে শিক্ষকেরা বিস্মিত হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁরা চাইতেন এই অদ্ভুত প্রতিভার কিছুটা সে অন্যান্য বিষয়েও প্রয়োগ করুক।

তার পারিবারিক সুখশান্তি আইনষ্টাইনের শিশুজীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার বাবার সঙ্গীতে যদিও অনুরাগ ছিল না, কিন্তু সাহিত্যে অনুরাগ ছিল গভীর। সারাদিনের কাজ শেষ হবার পর সমগ্র পরিবার আলোর কাছে এসে বসতেন এবং তার বাবা জার্মানীর ধ্রুপদী সাহিত্য শিলার, হাইনে বা গ্যেটের কোনো রচনা তাদের পড়ে শোনাতেন।

আইনষ্টাইনের মা সঙ্গীত, বিশেষত বেটোফেনের সঙ্গীত ভাল-বাসতেন। সন্ধ্যাবেলায় তাদের বাড়িতে বাবা-কাকা ও তাঁদের

বন্ধুবান্ধবেরা যখন এসে উপস্থিত হতেন তখন প্রায়ই গানের আসর বসত।

তিনজন অভিভাবক যাঁরা শিশু আইনষ্টাইনের জীবন গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন তাঁরা এই শিশুর জীবনে তিনটি আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন। বাবা সৃষ্টি করেছিলেন সাহিত্যপ্রীতি, মা করে-ছিলেন সঙ্গীতপ্রীতি আর কাকা করেছিলেন গণিত ও বিজ্ঞানপ্রীতি।

অ্যালবার্ট যখন বড়ো হয়ে স্কুলে যেতে আরম্ভ করলো, তখন বহির্জগতের নির্মমতা থেকে তার আশ্রয়স্থল ছিল গৃহকোণ। স্কুলে তার দিনগুলো যতই দুর্বহ মনে হোক না কেন বা তার চারধারে যতকিছুই কুৎসিত সে দেখুক না কেন, সন্ধ্যাবেলায় গৃহে ফিরে এসে সব সময়ই সে পেত সুখনীড়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যে বালক মুখস্থ করতে অপারগ

অ্যালবার্টের বয়স যখন ১২ বছর, তখন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে একটি পরবর্তী জীবনে সর্বদাই তাকে আনন্দ দান করছিল এবং অপরটি বহু বছর ধরে তার দুঃখ ও বিরক্তির কারণ হয়েছিল। পূর্বোক্ত ঘটনাটি হচ্ছে তার প্রথম বেহালাবাদন শিক্ষা এবং শেষোক্তটি হচ্ছে তার বিদ্যালয়ে প্রবেশ। যে বাড়িতে সকলেই সঙ্গীত ভালবাসে ও উপভোগ করে, সেখানে স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় পরিবারের ছেলেমেয়েদের কোনো না কোন রকম গানবাজনা শেখানো হবে। অ্যালবার্টের মা-বাবা তাকে বেহালা শেখাবেন বলে ঠিক করেন। এই বয়সে ছোট অথচ জ্ঞানে পরিণতবুদ্ধি ছেলেটির চরিত্রে এমন একটা জিনিস ছিল যার দরুন সে কখনও বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে পারত না। কাজেই প্রথম যখন তাকে বেহালা শেখানোর চেষ্টা করা হয়, তখন সে বিরূপতাই প্রকাশ করেছিল। বাধ্যতামূলকভাবে কোনো কিছু করানোতেই ছিল তার আপত্তি। আর সেজন্যেই সে বেহালার পাঠ অভ্যাস করতে প্রথম বিরক্তি প্রকাশ করত। কিন্তু সঙ্গীত তার মনে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে সাড়া জাগিয়ে তুললো। ক্লান্তিজনক ও বিরক্তিকর প্রথম পাঠ আয়ত্ত করবার পর যখন সে বেহালা থেকে একটা যথার্থ স্বরমূর্ছনা বার করতে সমর্থ হলো, তখন তার কাছে বেহালাবাদন হয়ে উঠলো পরম উপভোগ্য। কৈশোরের প্রারম্ভে সে মোৎসার্টকে আবিষ্কার করে এবং তারপর সারাজীবন ধরে

বেহালা ও সঙ্গীত তার জীবনে অন্যতম আনন্দের সহচর হয়ে ওঠে। যে সব সুর সে সবচেয়ে ভালবাসত সেগুলো সুনিপুণভাবে বাজাবার জন্যে সে কঠিন অভ্যাস করত।

এই বেহালাই ছিল আইনষ্টাইনের জীবনে অবসর বিনোদন ও আনন্দ উপভোগের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু তার সময়কার জার্মানীর স্কুলের সংকীর্ণ ও নির্মম গণ্ডীর মধ্যে সে কোনদিনই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি। অ্যালবার্টকে যে স্কুলে তার মা-বাবা পাঠিয়েছিলেন সে স্কুলটি জার্মান সৈন্যদলের মতো কঠিন নিয়মানুবর্তিতায় পরিচালিত হত। উচ্চপদস্থ সৈনিকেরা যেমন দয়ামায়া ও সহানুভূতিহীন হয়ে থাকে, সেখানকার শিক্ষকেরা ছিলেন ঠিক সেইরকম। মুখস্থ করে শেখাই ছিল সেখানকার রীতি এবং ক্লাশে নিয়মানুবর্তিতার একচুল ব্যতিক্রমও সহ্য করা হত না। শিক্ষকেরা ক্লাশে যে পাঠ দেবেন সেই পাঠের প্রতিটি শব্দ ছাত্ররা পুনরাবৃত্তি করবে এবং যখন তাদের বলা হবে, শুধু তখনই তারা কথা বলবে—এটাই ছিল সেখানে একমাত্র প্রত্যাশিত। আইনষ্টাইনের সতেজ ও মুক্ত মন এই মুখস্থ বিদ্যাকে বরদাস্ত করতে পারত না। এ কারণে স্কুলের শিক্ষা তার কাছে দাসত্ব বলে মনে হত। বেতের ভয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে ও রূঢ় কথার ঝকুনি খেতে খেতে এই ভাবপ্রবণ, নম্র ও অত্যন্ত লাজুক ছেলেটির মানসিক অবস্থা যে কী হয়েছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

বালক আইনষ্টাইন কথাবার্তা তাড়াতাড়ি শিখতে পারত না। তার মা-বাবা যখন তাকে স্কুলের প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন, তখনও তার এই অনগ্রসরতা বা নিজেকে ব্যক্ত করার অক্ষমতা সে পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

সেসময় জার্মানীতে প্রাথমিক স্কুলগুলি ধর্মের ভিত্তিতে পরিচালিত হত। মা-বাবার যা ধর্মবিশ্বাস সেই ধর্ম অনুসারে পরিচালিত স্কুলেই তাঁদের ছেলেমেয়ে পড়তে যেত। কিন্তু মিউনিক প্রধানত রোমান ক্যাথলিকদের শহর হওয়ায় অ্যালবার্টের মা-বাবা তাকে

একটি ক্যাথলিক স্কুলে পাঠান। স্কুলে তার দৈনন্দিন পাঠের একটি বিষয় ছিল রোমান ক্যাথলিক ধর্মশিক্ষা। বস্তুত, এই ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অ্যালবার্ট তার অন্যান্য সহপাঠীর চেয়ে বেশি জানত।

আইনষ্টাইন-পরিবার ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন ইহুদী। কিন্তু অ্যালবার্টের বাবার মনে ধর্মের কোনো গোঁড়ামি ছিল না, তিনি ছিলেন উদারপন্থী। তাঁর বাড়িতে কোনো ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান হত না। আইনষ্টাইন-দম্পতির উভয়েরই পরিবার বংশপরম্পরায় ব্যাভেরিয়া গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। আইনষ্টাইন-পরিবার তাঁদের প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবের থেকে নিজেদের পৃথক বলে বোধ করতেন না, যে কৃষ্টির মধ্যে তাঁরা বাস করতেন তারই অঙ্গীভূত তাঁরা হয়ে গিয়েছিলেন। স্কুলে না যাওয়া পর্যন্ত অ্যালবার্ট উপলব্ধি করতে পারে নি যে, পাড়া-পড়শাদের থেকে তাদের পরিবারের ধর্মমত পৃথক।

অ্যালবার্টের ক্লাশের একজন শিক্ষক মনে মনে ভাবতেন যে, সমস্ত পৃথিবীর লোকের এক ধর্মাবলম্বী হওয়া উচিত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে একদিন তিনি একটা বড়ো পেরেক ক্লাশে তুলে ধরে সকল ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর বললেন, 'জানো, এই ধরনের পেরেক দিয়েই যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।'

ক্লাশে অ্যালবার্টই ছিল একমাত্র ইহুদী ছাত্র। সে কারণে এই নির্মম কাহিনী শুনে লাজুক ছেলেটি আরও লজ্জিত হয়ে পড়ে। যদিও এ ঘটনা যখন ঘটে তখন তার বয়স ছিল মাত্র ন'বছর, কিন্তু জীবনে কোনদিনই সে এ ঘটনাটি ভোলে নি। অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, কারণ তার না ছিল খেলাধূলার দক্ষতা আর না ছিল বলিষ্ঠ ক্রীড়া-কৌশলে অনুরক্তি। কাজেই নিঃসঙ্গ বালকটি এখন আরও বেশি নিঃসঙ্গতা বোধ করতে লাগলো।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালবার্ট তার চারপাশের সকল অন্যায় সম্বন্ধে সচেতন হলো। সে দেখলো, স্কুলে বড় লোকের ছেলেমেয়েদের বেশ সমীহ করা হয়, কিন্তু দরিদ্র ছাত্রদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়।

সে দেখলো দরিদ্র লোকেরা শহরের অপরিচ্ছন্ন জঘন্য জায়গায় বাস করে এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা দিন যাপন করে পরম আরামে। সে জানত, স্কুলের একঘেয়েমি থেকে সে তার নিজের মধ্যবিত্ত পরিবারের আনন্দদায়ক পরিবেশে ফিরে যেতে পারে, কিন্তু দরিদ্র ছাত্রদের সে সৌভাগ্য হবে না। তাদের বাড়ি থেকে স্কুলে এবং স্কুল থেকে বাড়িতে বিড়ম্বিত পরিবেশে আসাযাওয়া করতে হবে।

মিউনিকের সাধারণ নাগরিকেরা ছিল স্বার্থপর, কিন্তু অ্যালবার্টের মা-বাবা ছিলেন দুর্ভাগাদের প্রতি সহৃদয়। মা-বাবার এই সহৃদয়-তার দরুনই হয়তো অ্যালবার্টের হৃদয়ে ছাত্রদের প্রতি মমত্ববোধ জেগেছিল। আর সে কারণেই পরবর্তীকালে তিনি মানুষের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান মুখপাত্র হয়েছিলেন। মনুষ্যত্বের অবমাননার মধ্যে বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি বলেই জীবনে দু-দুবার তিনি নিজের জন্মভূমির বাইরে অন্যদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যুবা বয়সে তিনি গ্রহণ করেন সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। তিনি চাইতেন শান্তিতে কাজ ও বসবাস করতে আর সেজন্যে তাঁর প্রয়োজন ছিল স্বাধীন আবহাওয়া।

দশ বছর বয়সে অ্যালবার্ট প্রাথমিক স্কুলের পাঠ শেষ করে মিউনিকে লিউটপোল্ড জিমনাসিয়ামে ভর্তি হয়। জার্মানীর জিমনা-সিয়ামের পাঠ্যক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জুনিয়ার হাই স্কুল, হাই স্কুল এবং জুনিয়ার কলেজের পাঠ্যক্রমের প্রায় সমান। জিমনাসিয়ামের পাঠ্যক্রম চলে আট বছর ধরে এবং পাঠ্যক্রমে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লাতিন, গ্রীক ও গণিত অন্তর্ভুক্ত।

এই শান্ত উদাসীন কিশোরটি জিমনাসিয়ামের শিক্ষকদের কাছে এক সমস্যাস্বরূপ মনে হয়েছিল। কারণ যে সব বিষয় শিখতে খুব বেশী মুখস্থ করতে হয়, যেমন ভাষাসমূহ—সে-বিষয়গুলোতে সে ছিল কাঁচা, অথচ গণিতে সে ছিল অদ্ভুত পারদর্শী এবং শিক্ষকদের পর্যন্ত হার মানিয়ে দিত। বাধ্যতামূলক কোনো ব্যাপারে সে সহজে সাড়া

দিত না। যদিও সে স্বভাবতই দয়ালু ও বন্ধু-ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু কর্তৃত্বপূর্ণ সব কিছুর সঙ্গেই ছিল তার অসহযোগ।

জিমনাসিয়ামে অ্যালবার্টের স্কুলজীবনের শেষভাগে একজন তীক্ষ্ণধী ও প্রভাবসম্পন্ন শিক্ষক আসেন। তাঁর নাম রুয়েস। তিনি এই অনন্যসাধারণ ছেলেটিকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষার গুণেই কোনো কোনো বিষয়ে অ্যালবার্টের অনুরাগ জন্মেছিল। রুয়েস এই উদ্‌ভ্রান্ত ছেলেটির হাত ধরে বললেন, 'এসো, তোমাকে মহান্ স্রষ্টাদের এক নতুন রাজ্যে নিয়ে যাই। গ্যেটে, শেকসপীয়ার ও অন্যান্য জার্মান কবিরা (যাঁদের সৃজনী প্রতিভা নির্মম ও বিবেচনাহীন বাধ্য-বাধকতায় আবদ্ধ ছিল না) তাঁরা তোমার বিস্ময়কর কল্পনার যোগ্য মর্যাদা দেবেন।' এই মহামনীষীদের রাজ্যে প্রবেশ করে অ্যালবার্ট তাঁদের ভালবেসে ফেললো এবং এরই ফলে তার নির্জনতা ও বিচ্ছিন্নতা কিছুটা কমে গেল।

মিউনিকে যে কেউ তাদের বাড়ীতে আসত, সে কখনও নিরাশ হয়ে ফিরে যেত না। আইনষ্টাইন পরিবারের একটা রীতি ছিল যে, প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁরা একজন দরিদ্র ছাত্রকে তাঁদের বাড়িতে ভোজে আপ্যায়িত করতেন। সে-সময় দরিদ্র ছাত্ররা প্রকৃতই দরিদ্র ছিল। নিয়ন্ত্রিত স্বল্প অর্থের মধ্যে লেখাপড়া শেখার জন্যে যে-সব ছাত্রকে সংগ্রাম করতে হত, তাদের কাছে এই ধরনের ভোজ ছিল আশীর্বাদস্বরূপ।

কিন্তু এইভাবে যে বদান্যতা প্রদর্শিত হত তা শতগুণ পূর্ণ হয়ে ফিরে এসেছিল আইনষ্টাইন পরিবারের, বিশেষত অ্যালবার্টের কাছে। কারণ এই দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে মাক্স টলেমি নামে একজন ছিল। সে তখন ডাক্তারী পড়ছিল। অ্যালবার্টের চেয়ে সে এগারো বছরের বড়ো। অ্যালবার্টের মধ্যে যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ছিল সেটা তার মা-বাবার চেয়েও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল টলেমি। সে অ্যালবার্টকে লেখাপড়ায় উৎসাহ দিত এবং তাকে অঙ্ক শেখাত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে অ্যালবার্ট তাকে হার মানিয়ে নিজেই অনেক

দূর এগিয়ে যাওয়ায় তার সাহায্যের আর প্রয়োজন হয় নি। মাক্সই অ্যালবার্টকে স্পীকার রচিত একখানা জ্যামিতি বই দিয়েছিল। এই বইখানা অ্যালবার্টকে তার ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় করে রাখত।

পরবর্তীকালে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি যখন প্রচারিত হয় তখন ডাঃ টলেমি ওই বিষয়ে নিজে একটা বই লেখার জন্যে নিউইয়র্কের সাধারণ গ্রন্থাগারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তথ্য সংগ্রহ করতেন। এই সময়ের মধ্যে টলেমি চিকিৎসক হিসাবে যথেষ্ট সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু একদা যে সহৃদয় আইনষ্টাইন পরিবার মিউনিকের এই দরিদ্র ছাত্রটিকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের কথা মাক্স টলেমি ভুলে যান নি।

যখন মাক্স ও অ্যালবার্ট উভয়েই তরুণ ছিল, তখন তাদের দুজনের মধ্যে কত আনন্দপূর্ণ কথাবার্তা হয়ে থাকবে এবং কোনো তর্কের বিষয় উঠলে তা নিয়ে তারা কত উত্তেজিত হয়ে থাকবে! জীবনে এই প্রথম অ্যালবার্ট এমন একজন বন্ধু লাভ করলো যে তার সত্যিই যোগ্য হয়েছিল, যে তার নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে তাকে সত্যকীব সঙ্গদান করেছিল। অ্যালবার্টের বয়স যখন সাড়ে দশ বছব, তখন তাদের দুজনেব মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং আমেবিকায় মাক্সে নতুন কর্মজীবন গঠনের জন্যে যাত্রাব পূর্ব পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর ধরে তাদেব এই বন্ধুত্ব অটুট ছিল। এবং পাঁচ বছরে অ্যালবার্টের জিমনাসিয়ামে শিক্ষাগ্রহণেব অধিকাংশ কালই অতিবাহিত হয়।

অ্যালবার্টের বয়স যখন চোদ্দ বছর, তখন শিক্ষকদের কাছে সে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে বিষয়ে তার বিরাগ ছিল সে বিষয়টা তাকে কোনোমতেই শেখানো যেত না। কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে সে যেন শিক্ষক আর শিক্ষকেরা ছিলেন তার ছাত্র। তাঁরা অ্যালবার্টকে জেদী ও বাচাল ছেলে ভেবে থাকবেন নিশ্চয়। কিন্তু আমরা জানি, সে প্রকৃতপক্ষে সে-ধরনের ছেলে ছিল না। সে আত্মসচেতন ছিল বটে, কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস ছিল খুবই কম।

তার অনুসন্ধিৎসা এত তীব্র ছিল যে, সে ক্লাশে প্রশ্নের পর প্রশ্ন না করে স্থির থাকতে পারত না। একটা বিষয়ে তার আগ্রহ এত গভীর ছিল যে, সেই বিষয়ে তন্ময়তায় সে যে শুধু নিজেকে ভুলে যেত তা নয়, ভুলে যেত সহপাঠী ছাত্রদেরও এবং শিক্ষকদের এমন সব প্রশ্ন বাণে জর্জরিত করে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করত যে প্রশ্নের উত্তর কোনো শিক্ষকের বা বিশ্বের আর কারো জানা ছিল না। এই ধরনের বহু প্রশ্নের উত্তর আইনষ্টাইন নিজেই পরবর্তীকালে খুঁজে পেয়েছিলেন।

শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন অন্যান্যদের চেয়ে বেশি সরল এবং সম্ভবত বেশি বেপরোয়া। তিনি একদিন স্কুল শেষ হবার পর অ্যালবার্টকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'অ্যালবার্ট, আমার একটা কথা তুমি বিশ্বাস করবে?'

—'হ্যাঁ, স্যার।'

—'তুমি আমাকে যে অসংখ্য প্রশ্ন কর তার উত্তর আমি দিতে পারি না এবং আমার মনে হয় অন্য কেউই তার উত্তর দিতে পারবে না। কাজেই তুমি এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলে আমাকে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়।'

—'এজন্যে আমি দুঃখিত, স্যার! কিন্তু আমি তো জানতে চাই……।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সমস্ত জগতই তোমার প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। আমি তোমাকে অনুনয় করছি, এরপর তুমি আর আমাকে অপদস্থ করো না। দয়া করে ক্লাশে আমাকে আর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো না।'

এই অনুরোধে অ্যালবার্ট সম্মত হয়েছিল কিনা তা আমরা জানি না। কিন্তু এই অধ্যাপক আইনষ্টাইনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কিছু আভাস যেন ধরতে পেরেছিলেন, যদিও অধ্যাপক রুয়েসের মতো তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না।

তৃতীয় অধ্যায়

জার্মান সৈন্যদলের ছায়া

বিংশ শতাব্দীতে জার্মানীর একক জাতি হিসাবে সব সময় অস্তিত্ব ছিল না। আইনষ্টাইনের জন্ম যে সময়ে তখন জার্মানী তার জাতীয় উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে। আইনষ্টাইন যখন ছোট বালক, তখন জার্মানীতে বিসমার্ক নামে এক সামরিক স্বৈরাচারী তাঁর ক্ষমতার শীর্ষদেশে।

আইনষ্টাইনের জন্মের তিরিশ বছর আগে অটো ফন বিসমার্কের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। বিসমার্ক ছিলেন রাজবংশোদ্ভূত এবং প্রুশিয়ার অধিবাসী।

সাধারণ পরিষদ বা প্রুশিয়ান কংগ্রেসের সদস্যরূপে তাঁর রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ, তারপর ধাপে ধাপে ও ঘৃণ্য উপায়ে ক্ষমতা দখল করে তিনি দুর্দান্ত স্বৈরাচারীতে পরিণত হন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল বিক্ষিপ্ত স্বাধীন রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি সংযুক্ত জার্মান জাতি গঠন করা এবং সেই সংযুক্ত জার্মানীর কর্তৃত্ব থাকবে তাঁর নিজের প্রুশিয়ার হাতে। আনুমানিক ১৮৬০ সালে এই সুযোগ তাঁর কাছে উপস্থিত হলো, যখন প্রুশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ম প্রুশিয়ান কংগ্রেসের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হলেন। প্রথম উইলিয়ম স্বয়ং সার্বভৌম ক্ষমতার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে সরকারের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি করেন—যে দুর্বলতার সুযোগের জন্যে বিসমার্ক প্রতীক্ষায় ছিলেন। সুযোগ গ্রহণ করে বিসমার্ক একদলকে অপর দলের বিরুদ্ধে

প্ররোচিত করলেন এবং শেষকালে নিজে মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি নামে প্রুশিয়ার শাসন-ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। তারপরই জার্মানীর সংযুক্তিকরণ এবং তার সীমান্তভাগ সম্প্রসারণের আসল কাজে তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন।

বিসমার্ক ছিলেন এক দৃঢ়চেতা, আবেগপ্রবণ ও প্রাণোচ্ছল ব্যক্তি। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে একজন সৈনাধ্যক্ষ এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানুষের জীবন ও তার সুখ নষ্ট করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আইনষ্টাইন ঠিক যে বছরে জন্মগ্রহণ করেন তার কয়েক বছর আগে বিসমার্ক ধাপে ধাপে ক্ষমতা দখল করতে লাগলেন। ডেনমার্কের মতো ক্ষুদ্র রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্ররোচনা তিনি যোগান এবং সেলস্‌উইগ ও হলষ্টিন নামে প্রদেশ দুটি অধিকার করেন। তিনি নিজে এত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং জার্মানীকে এত শক্তিশালী করে তোলেন যে ফ্রান্স ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বিসমার্ক যখন স্পেনের সিংহাসনে একজন জার্মান নৃপতিকে বসাতে চেষ্টা করেন, তখন ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে ১৮৭০ সালে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হয় যাতে শেষ পর্যন্ত জার্মানীই জয়লাভ করে এবং এইভাবে ফ্রান্সকে বিশ্ব-নেতৃত্বের আসন থেকে হটিয়ে দেয়। এই যুদ্ধের আর একটি ফল হয় এই যে, আইনষ্টাইন পরিবারবর্গের জন্মভূমি ব্যাভেরিয়া রাজ্য সংযুক্ত জার্মান সংঘে যোগ দিতে বাধ্য হয়। আইনষ্টাইনের জন্মের ঠিক আট বছর আগে ব্যাভেরিয়া এইভাবে তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল।

অ্যালবার্ট যখন ছোট বালক, তখন জার্মান সামরিক যন্ত্র সমগ্র ব্যাভেরিয়ার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিস্তার করেছে। এর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা স্কুলসমূহেও অনুভূত হত এবং বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া ছিল একান্ত বাস্তব বিষয়।

সমগ্র আবহাওয়াতেই যেন একটা সামরিক প্রবণতা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল—যুবকেরা সৈন্যদলে যোগদান করছিল, তরুণীরা সৈন্যদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকরণের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখত,

ছেলেমেয়েরা সৈনিকের খেলা খেলত। আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, সে সময়কার যে কোনো বালক সেই অবস্থায় উজ্জ্বল সামরিক পোশাক ও সূঁচলো লৌহ শিরস্ত্রাণ-পরিহিত লোকেদের কুচকাওয়াজ করে যেতে দেখে বা সামরিক অশ্বদের কদমচালে চলতে দেখে পুলকিত হয়ে উঠত। কিন্তু সে দৃশ্যে অ্যালবার্ট পুলকিত হত না। কারণ জঙ্গীবাদের অর্থ যে কি তা সে জানত এবং স্কুলে এই জঙ্গীবাদের আস্বাদ সে পেয়েছিল। ফৌজ ছিল স্কুলের মতোই—ফৌজ বলতে বোঝাত রূঢ় ব্যবহার, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং একজনকে ঠিক অপর একজনের মতো করে তোলার জন্যে সবসময়েই কুচকাওয়াজ।

অ্যালবার্টের সহপাঠীরা যখন খেলাচ্ছলে সৈনিকদের মতো কুচকাওয়াজ করে বেড়াত, সে তখন তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেত। কারণ একদিন তাকেও হয়তো সৈনিক হতে হবে—একথা চিন্তা করতেই সে শিউরে উঠত! কিন্তু প্রুশিয়ান সেনাবাহিনী গড়ে ওঠার অন্তর্নিহিত অর্থ তাই ছিল। তার থেকে কেউ পরিত্রাণ পাবে কেমন করে?

অ্যালবার্ট তার মা-বাবাকে অনুনয় করতে লাগলো, 'চলো, আমরা অন্য দেশে চলে যাই।'

তার মা-বাবা স্নেহার্দ্র ও সহানুভূতিশীল ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা অ্যালবার্টের মতো সেই মুহূর্তে অন্যত্র চলে যাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তা ছাড়া তাঁরা জানতেন সামরিক বিভাগে কাজ করার পক্ষে অ্যালবার্টের বয়স তখনও খুবই কম।

কিন্তু অ্যালবার্টের কাছে সামরিক কাজের আশঙ্কা ছিল একেবারে রূঢ় বাস্তব। স্কুল তার ভালো লাগত না। কিন্তু জার্মান সেনাদল ছিল তার কাছে আরও ভয়াবহ। মনে মনে সে স্থিরনিশ্চিত জানত যে, তাকে যদি ফৌজে ভর্তি করে দেওয়া হয় তা হলে সে আর বাঁচবে না। এই ভাবপ্রবণ প্রতিভাদীপ্ত ছেলেটি সৈনিক হবার জন্যে জন্মায় নি। অন্যান্যদের কাছে ফৌজী জীবন প্রিয় হতে

পারে, কিন্তু অ্যালবার্ট ছিল এমন এক জগতের মানুষ, যে জগৎ শুধু বিজ্ঞান, গণিত, বই ও সঙ্গীত নিয়েই গঠিত। তার আশঙ্কা দূর করবার জন্যে মা-বাবা কথা দিলেন যে একেবারে বিলম্ব ঘটবার আগেই তাকে অন্যত্র নিয়ে যাবেন।

অ্যালবার্টের বয়স কম হলেও সে বুঝতে পেরেছিল, তার মা-বাবার উদ্বেগের অন্যান্য কারণও আছে। আইনষ্টাইন পরিবার যাঁরা একদিন মুক্ত হস্তে দরিদ্রদের সাহায্য করেছেন, আজ তাঁদের নিজেদেরই ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছে। অ্যালবার্টের এক বছর বয়সে তার বাবা উলম্ থেকে যে রাসায়নিক কারখানা মিউনিকে স্থানান্তরিত করেছিলেন সেটা তেরো বছরের বেশি কাল ভালোভাবেই চলেছিল এবং আইনষ্টাইনদের অবস্থার যথেষ্টই উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে এবং অল্পকালের মধ্যে স্পষ্টই বোঝা গেল, অ্যালবার্টের বাবার ব্যবসা পড়তে আরম্ভ করেছে।

অ্যালবার্ট লক্ষ্য করত, মা-বাবা ও কাকার মুখে চিন্তার গভীর ছাপ। সমস্যা সমাধানের জন্যে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে যে-সব আলোচনা হত তা-ও তার কানে আসত। এই দুঃখজনক অবস্থান্তরের ফলে পারিবারিক আবহাওয়া বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে কিছুদিন অ্যালবার্ট আর জার্মান ফৌজ থেকে অব্যাহতি লাভের কথা তাঁদের কাছে উত্থাপন করত না।

ইতালির মিলান ডাকঘরের ছাপমারা একটি চিঠি আসার পর একদিন নতুন করে পারিবারিক আলোচনা আবার শুরু হলো। এই আলোচনায় যে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় তা পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল।

দীর্ঘ কথাবার্তার ফলাফল বাবা তাকে বলেছিলেন, 'দেখো অ্যালবার্ট, এখানে আমার ব্যবসা পড়ে যাচ্ছে এবং এই বড় বাড়ীতে থাকা আমাদের আর পোষাচ্ছে না। ঠিক করেছি, মিলানে আমরা উঠে যাব। কারণ সেখানে আমার ব্যবসাগত নানা যোগাযোগ আছে এবং নতুন করে সেখানে সবকিছু আমরা শুরু করতে পারব।'

যে ছেলে প্রুশিয়ান স্কুল ও প্রুশিয়ান ফৌজ থেকে পরিত্রাণ লাভ ছাড়া আর কিছু চাইত না, তার কাছে এই সংবাদ বেদনা সঞ্চার না করে বরং আনন্দ ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল।

তার মা মাথা নেড়ে বললেন, 'অ্যালবার্ট, তোমাকে কিন্তু স্কুলের পড়া অবশ্যই শেষ করতে হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের জন্যে জিমনাসিয়াম থেকে ডিপ্লোমা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। তাই যখন তাকে বলা হলো যতদিন না ডিপ্লোমা লাভ করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাকে মিউনিকে থাকতে হবে, তখন তার আনন্দোচ্ছ্বাস অন্তর্হিত হলেও সে বুঝতে পেরেছিল তার মা-বাবা ঠিক কথাই বলেছেন। ঠিক হলো, অ্যালবার্ট একলা মিউনিকে একটি বোর্ডিং-এ থাকবে আর তার মা-বাবা-কাকা ছোট বোন মাজাকে নিয়ে ইতালিতে চলে যাবেন।

জীবনে এই প্রথম অ্যালবার্ট সম্পূর্ণ একা হয়ে রইল। প্রতিদিন স্কুলে ক্লাশ শেষ হবার পর প্রীতিময় গৃহাশ্রয়ে ফেরার সুযোগ তাব চলে গেল। এখন শুধু প্রুশিয়ান স্কুলের ক্লাশঘর ছাড়া অন্য কোথাও তার যাবার রইল না। ঘরেবাইরে নির্বান্ধব হয়ে সে ভারাক্রান্ত মনে পাঠে মনঃসংযোগ করলো।

আল্পস পর্বতমালা থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে ইসার নদীর ধারে রম্যনগরী মিউনিক। কিন্তু অ্যালবার্টের কাছে এই নগরী আর রম্য বোধ হলো না। সম্ভবত এখানকার পরিবর্তনশীল আবহাওয়া এই কৃশতনু ছেলেটিকে প্রভাবান্বিত করেছিল। শহরটি পর্বতমালার কাছাকাছি এবং সতেরশো ফিট উঁচু মালভূমির ওপর অবস্থিত হওয়ায় এখানকার তাপমাত্রা হঠাৎ পরিবর্তিত হয়। ওভারকোট ছাড়া এখানে থাকা বিপজ্জনক, কারণ মুহূর্তমধ্যে এখানকার বাতাস শীতল হতে পারে। জানুয়ারী মাসে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর নিচে নেমে আসে এবং তার ফলে সর্দিকাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জার সহজ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হত ইতালি থেকে পাওয়া পারিবারিক চিঠির প্রতিক্রিয়া।

অবসর সময়ে অ্যালবার্ট পাহাড়ে পর্বতে পিকনিক করতে যেতে পারত, কিন্তু তা ছিল ব্যয়বহুল ; অথবা রাজ্য লাইব্রেরীর পনের লক্ষের বেশি বই-এর মধ্যে সে কিছু সময় অতিবাহিত করতে পারত। যখন সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুস্থসবল ঘোড়া-টানা ছ্যাকরা-গাড়িকে ছুটে চলে যেতে দেখত, তখন ঘোড়াগুলোকে দেখে জার্মান অশ্বারোহী সৈন্যদের কথাই তার মনে পড়ত।

মিউনিক রোমান ক্যাথালিকদের শহর। এ কারণে সেখানে ধর্মানুষ্ঠানের দিনে রাস্তা দিয়ে দীর্ঘ ধর্মীয় শোভাযাত্রা যেতে দেখা যেত। সে সময় শহরের গবাক্ষে গবাক্ষে শোভা পেত কারুকার্য-মণ্ডিত পর্দা ও পতাকা এবং আর্চবিশপ ও অন্যান্য ধর্মযাজকদের সঙ্গে ধর্মীয় গান গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা করে যেত সংঘ, স্কুল ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা।

মিউনিকের আবহাওয়া, নিঃসঙ্গতা ও সৈন্য সমারোহ অ্যালবার্টের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সে ভাবতে লাগলো, কি করা যায়? শেষকালে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন, যিনি জীবনে কোনোদিন কারোকে প্রতারণা করেন নি, মিউনিক থেকে পালাবার একটা মতলব ঠিক করলো। কাল বিলম্ব না করে সে তাদের পারিবারিক বন্ধু মিউনিকের একজন ডাক্তারের কাছে হাজির হলো।

যখন ডাক্তারের কাছে সে তার বক্তব্য পেশ করলো, তখন মনে মনে লজ্জিত ও সংকুচিত হয়েছিল। বৃদ্ধ লোকটি সকৌতুকে তার বক্তব্য শুনে কোনোরকম মন্তব্য না করে ডেস্কে গিয়ে অ্যালবার্টকে ভগ্নস্বাস্থ্যের একটা সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। সার্টিফিকেটে লেখা হলো—অ্যালবার্ট স্নায়বিক দৌর্বল্যের সম্মুখীন হয়েছে এবং এজন্যে তার স্কুল ছেড়ে ইতালীতে পরিবারের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। ডাক্তার সার্টিফিকেট সই করে অ্যালবার্টের হাতে দিলেন।

—'তুমি যা চাইছিলে তা পেয়েছ।'

—'ধন্যবাদ, স্যার।'

অ্যালবার্ট ডাক্তারকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ভগ্নস্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে রাস্তায় দৌড়বার উপক্রম করলো।

ডাক্তার তাকে ডেকে বললেন, 'অ্যালবার্ট; ফিরে এসো।'

সে কথা শুনে অ্যালবার্ট ফিরে এলো।

ডাক্তার তখন তাকে আর একটি উপদেশ দিলেন—'অ্যালবার্ট, সাবধান হও। স্কুলে একেবারে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মুখ রাঙা করে হাজির হয়ো না। আস্তে আস্তে যাও। মনে রেখো, তুমি অত্যন্ত অসুস্থ, কাজেই একটু শুকনো মুখ দেখাতে চেষ্টা করো।'

এই কথায় অ্যালবার্টের মুখে একটা অপরাধীর ভাব ফুটে উঠলো। সে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ফেললো, তারপর এমন সাবধানে ধীরে ধীরে হেঁটে স্কুলে ভগ্নস্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট দিতে গেল যেন সে সত্যই অসুস্থ।

কয়েকদিনের মধ্যে স্কুলের একজন শিক্ষক অ্যালবার্টকে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তারের সার্টিফিকেটের কথা উল্লেখ না করে তিনি আপনা থেকে বললেন, 'অ্যালবার্ট, আমি সত্যই মনে করি, তুমি যদি এ স্কুল ছেড়ে দাও সেটা তোমার পক্ষে ভাল হবে।'

সচকিত হয়ে অ্যালবার্ট জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি কোনো অন্যায় করেছি, স্যার?'

উত্তর হলো—'ক্লাশে তোমার উপস্থিতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা নষ্ট করে দেয়।'

এই মন্তব্য শুনে অ্যালবার্ট অবাক হয়ে গেল। কারণ ইচ্ছা করে সে কখনও কারো বিরক্তি ঘটায় নি। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতায় তার বিরুদ্ধাচরণ, মুখস্থ বিদ্যায় তার সুস্পষ্ট অনিচ্ছা এবং তার শান্ত উদাসীন প্রকৃতির ফলেই বোধ হয় সে শিক্ষকদের কাছে এমন ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যা সে নিজে উপলব্ধি করতে পারে নি

আপাতদৃষ্টিতে অন্যান্য ছাত্রের মধ্যেও তার মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। ঘটনা যাই হোক না কেন, সে তার জায়

বিশেষ মাথা ঘামায় নি। কারণ যে কোনো উপায়েই হোক, সে স্কুল থেকে অনুপস্থিতির ছুটি পেয়েছিল।

অল্প সময়ের মধ্যে সে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল এবং মিলান অভিমুখে যাত্রার উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠে বসলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে চললো। এই ট্রেনযাত্রা দীর্ঘস্থায়ী ও ক্লান্তিকর হয়েছিল। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে যাবার ক্ষমতা অ্যালবার্টের না থাকলেও সে এই যাত্রায় সুখী হয়েছিল। ট্রেনে আরোহণ করার পর সময় যত অতীত হচ্ছিল, মিউনিক থেকে ততই দূরে ও মিলানের তত কাছাকাছি সে আসছিল।

তাকে দেখে তার মা-বাবা ও বোন যুগপৎ কত যে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন! তাঁরা হয়তো অ্যালবার্টকে একটু বকেছিলেন। কিন্তু সত্যসত্যই ক্ষুব্ধ হন নি। কারণ সমগ্র পরিবার পুনরায় একসঙ্গে মিলিত হওয়া পরম আনন্দদায়ক হয়েছিল।

আল্পস্ পর্বতমালার ঠিক দক্ষিণে উত্তর ইতালীর লোম্বার্ড সমভূমির মধ্যভাগে মিলান শহরটি অবস্থিত। এই সমভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠের খুব উঁচুতে না হওয়ায় গ্রীষ্মকালে তাপাধিক্য দেখা যায়। এই শস্যশ্যামল অঞ্চল পো এবং ওলোনা নদী দ্বারা বিধৌত এবং সেখানে বিখ্যাত লোম্বার্ড পপ্‌লার গাছ জন্মায়।

মিলান একটি প্রাচীন নগর। সেখানকার অধিকাংশ ঘরবাড়ি সুশোভিত এবং প্রাণী, দেবদূত ও বিচিত্র জীবজন্তুর খোদিত মূর্তি দ্বারা অলংকৃত। শহরের রাস্তাগুলি নিস্তব্ধ ও শান্তিপূর্ণ। সেখানকার লোকেরা নিরুদ্বেগে ও শান্তিতে চলাফেরা করে। মিউনিকের সামরিক তৎপরতার সম্পূর্ণ এক বিপরীত আবহাওয়া এখানে বিদ্যমান। এই আবহাওয়া ক্লান্তিবিহীন ও সুখবহ।

সেখানে ছ'মাস ধরে অ্যালবার্ট নিরুদ্বেগে ও শান্তিতে মিলানের মনোরম বিচিত্র রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিল। পূর্বের শীতল আবহাওয়ার পরিবর্তে এখানে সূর্যকরোজ্জ্বল তাপমাত্রা পেয়ে সে পরম আনন্দিত

হয়েছিল। সে আর্ট গ্যালারী দেখতে যেত, ইতালীর মহান শিল্পীদের পর্যবেক্ষণ করত, এমন কি কিছু কিছু ইতালী কথা বলতেও সে শিখে ফেললো।

সে যখন তার এই স্বাধীন পরিবেশের কথা ভাবতে লাগলো, তখন তার মনে এক বিচিত্র ধারণা জেগে উঠে।

একদিন সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উপলব্ধি করলো—'আমি জার্মান নই।'

পৃথিবীতে কোনো শক্তি তাকে কোনদিন প্রুশিয়ান রূপে ভাবাতে ও আচরণ করাতে পারে নি। একটা বিষয় সে এর আগে ভাবে নি, কিন্তু এখন স্মরণ করলো—যে ব্যাভেরিয়ায় সে ভূমিষ্ঠ হয় সেই ব্যাভেরিয়া বহুদিন পর্যন্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল এবং তারপর একজন প্রুশিয়ান স্বেচ্ছাচারী এই দেশটি অধিকার করে তার নাম দেয় 'জার্মানী'।

বাবার সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর অ্যালবার্ট স্থির করলো, সে তার জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগ করবে। এরপর কয়েক বছর সে কোনো দেশের নাগরিক ছিল না, কারণ কোথাও নাগরিকত্ব লাভের মতো পূর্ণ বয়স তখনও পর্যন্ত তার হয় নি।

সে সময় অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ছিল একজন আকর্ষণীয় বালক। তার চুল কালো, বড় বড় চোখ দুটি কটা রঙের। তাকে যথার্থই সুপুরুষ বলা চলত এবং সময় সময় তাকে ইতালীয় বলে চালানো যেতে পারত। কোনো এক বিশেষ দেশের নাগরিক বলে সে নিজেকে মনে করত না। যখনই সে স্বাধীন পরিবেশে বাস করেছে, তখনই সে সুখী হয়েছে। পরবর্তীকালে যখন তাঁর বয়স যথেষ্ট হয়েছিল এবং অপর এক স্বৈরাচারী সমগ্র ইউরোপ অধিকার করার চেষ্টা করেছিল তখন আইনষ্টাইনকে স্বাধীনতার সন্ধানে মাতৃভূমি ছেড়ে আর একটি দেশে পুনরায় চলে যেতে হয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

আমি কি হব ?

প্রত্যেক তরুণের মনে একদিন না একদিন একটি প্রশ্ন জাগে—'আমি কি হব ?'

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন কি হতে পারে ? পনের বছর বয়স্ক এই কিশোরটি যখন মিলানের রাস্তায় পদচারণা করত, তখন তার মধ্যে ভবিষ্যৎ কৃতিত্বের সম্ভাবনা খুব কমই দেখা যেত। তার সমবয়সী ছেলেদের যে সব বিষয়ে আগ্রহ ছিল না সেই জিনিসগুলিই সে করতে ভালবাসত—কঠিন বই পড়তে, তার বয়সের তুলনায় কঠিন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে। এ ছাড়া সে ভালবাসত ললিতকলা ও সঙ্গীত। জীবনের অবশিষ্ট কাল সে যে কোনোরকম তত্ত্বীয় পদার্থ-বিদ্যা ও গণিত বিষয়ে কাজ করতে চায়—এসম্পর্কে তার মনে কোন-দিনই সংশয় জাগে নি। কিন্তু এর দ্বারা জীবিকার্জন কিভাবে সম্ভব হতে পারে ? একদিন সে বিয়ে করতে চাইবে, তখন স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের ভরণপোষণের জন্যে সে কি কাজ করবে ? তার বাবার কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য পাবার আশা সে করতে পারে না। কারণ ইতালীতে তাঁর ব্যবসা ভালো চলছিল না এবং আইনষ্টাইন পরিবার এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে মিউনিকের মত সচ্ছল অবস্থা তাঁদের হয়তো আর কোনদিন আসবে না।

অ্যালবার্ট জানত যে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখতে না পারলে বিজ্ঞানে তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। সে এটাও জানত যে জিমনা-

শিয়ান ডিপ্লোমা না পেলে কোনো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আশাও সে করতে পারে না। এ সব সত্ত্বেও জার্মানীতে ফিরে যাবার কথা সে চিন্তা করতে পারত না। তার কি আরও ধৈর্যশীল হওয়া উচিত ছিল? মিউনিক থেকে সে কি খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছে? —এ ধরনের চিন্তা তার সমস্ত মন জুড়ে বসেছিল। কিন্তু তখন আব আক্ষেপ করবার সময় নেই। গণিত ও পদার্থবিদ্যার প্রতি তার গভীর আগ্রহই হয়তো কারিগরী শিক্ষার বিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে দেবে।

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের কাছে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক স্কুলের দুটি বিশেষ সুবিধা ছিল। প্রথমত স্কুলটি জার্মানীতে অবস্থিত নয়, আর দ্বিতীয়ত এটি ইউবোপেব সর্বোৎকৃষ্ট টেকনিক্যাল স্কুলের পর্যায়ভুক্ত। এখানে ভর্তির জন্যে সে আবেদন করবে ঠিক করলো। কিন্তু তার কোনো ডিপ্লোমা না থাকায় তাকে একটা প্রবেশিকা পরীক্ষা অবশ্যই দিতে হবে। ধারণা হতে পারে যে, যে প্রতিভাধর মস্তিষ্ক থেকে একদিন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রসূত হয়েছিল তাঁর প্রদত্ত পরীক্ষাপত্রের কৃতিত্ব দেখে পরীক্ষকেরা চমৎকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এই পরীক্ষাব ফলাফল আমাদেরই বিস্মিত করে! ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী এবং যিনি মানবেতিহাসের ধারা পরিবর্তনের জন্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেই অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ভাষা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যার পরীক্ষাপত্রে অকৃতকার্য হন।

স্কুল পরিচালক সমিতিব সদস্যরা অ্যালবার্টের ভর্তি সম্পর্কে মাথা নাড়লেন। কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে অ্যালবার্ট ওই বিষয়-গুলি আয়ত্ত না করা পর্যন্ত তাঁবা তাকে ভর্তি করে নিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, যখন তাঁরা দেখলেন অ্যালবার্ট গণিতে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে তখন তাঁরা উপলব্ধি করলেন তাঁদের স্কুলে অ্যালবার্ট থাকলে স্কুলেরই সম্মান বৃদ্ধি পাবে। সেজন্যে তাঁরা তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করলেন। জুরিখেব সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক স্কুলের

অধ্যক্ষ অ্যালবার্টকে পরামর্শ দিলেন, সুইজারল্যাণ্ডের অ্যারাউ শহরে একটি স্কুলের সন্ধান করে ভর্তি হয়ে যাও।

এই পরামর্শ অ্যালবার্ট গ্রহণ করলো, যদিও তার মনে সংশয় জেগেছিল হয়তো বা সেখানে আরও বেশি মুখস্থ করে শিখতে হবে ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হবে। কিন্তু অ্যারাউতে অ্যালবার্টের জীবনে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। ইতালীতে তার ৬ মাস যেমন সুখে ও নির্ভাবনায় কেটেছিল, এখানকার জীবনও ছিল তেমনি সুখ ও শান্তিদায়ক। মিলানে সে পেয়েছিল দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ এবং বহু আকাঙ্ক্ষিত অবসর। কিন্তু অ্যারাউতে মনোমুগ্ধকর পার্বত্য গ্রামাঞ্চলের পরিবেশে সে আরও বেশি আনন্দ অনুভব করেছিল। কারণ এখানে পাঠ্যশিক্ষা তার কাছে বিরক্তিকর বোধ হয় নি, বরং আনন্দদায়ক বলেই মনে হয়েছিল। এখানে সে আবিষ্কার করলো, স্কুল মানেই একটা বিতৃষ্ণার জিনিস নয় এবং সহপাঠীরাও সহানুভূতিশীল সুহৃদ হতে পারে।

অ্যালবার্টের চরিত্রে একটা বৈচিত্র্য ছিল যে, সে তার সমবয়সীদের চেয়ে বয়স্কদের সঙ্গে বেশি মানিয়ে নিতে পারত। অ্যারাউতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। এখানে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন একজন শিক্ষক। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অধ্যাপক উন্টিলার এই অদ্ভুত ও ভিন্নপ্রকৃতির ছেলেটির পরিচয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভালবেসে ফেলেন এবং স্বল্প দিনেই তাদের দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

অধ্যাপক উন্টিলার একদিন অ্যালবার্টকে বললেন, আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে তুমি অবশ্যই এসো, অ্যালবার্ট। আমার সাতটি ছেলেমেয়ে আছে, তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

অধ্যাপকের বাড়িতে গিয়ে অ্যালবার্টের মনে ভেসে উঠলো মিউনিকে তার পারিবারিক সুখস্মৃতি। মনে পড়লো মিউনিকে তার পরিবারের সমৃদ্ধির দিনে তাদের শান্তিপূর্ণ বাড়ির কথা। মনে পড়লো আনন্দ ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশের কথা। মনে পড়লো

আহারের সময় টেবিলের চারধারে বসে তাদের কত হাসিঠাট্টা ও কৌতুককথা হত।

অধ্যাপক উন্টিলারের একটি মেয়ে অ্যালবার্টের ঠিক বিপরীত দিকে বসেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় অ্যালবার্ট (যিনি পরবর্তীকালে তাঁর আবিষ্কারের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত করেছিলেন) প্রথম আবিষ্কার করলো যে, তার মুখোমুখি একটি সুন্দরী তরুণী বসে আছে এবং বাতির কম্পমান আলোকে তার মাথার চুল চিক্‌চিক্ করে উঠেছে। সম্ভবত এই প্রথম তরুণ অ্যালবার্ট মেয়েদের সম্বন্ধে সচেতন হলো। এর আগে তার একমাত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল ছোট বোন মাজার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। কেমন করে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হয় সেটা ছিল তার ধারণার বাইরে।

কিন্তু অধ্যাপক উন্টিলার অ্যালবার্টকে তাঁর বাড়িতে বাস করার আহ্বান জানিয়ে সমগ্র পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হবার পথ সহজ করে দিলেন। অধ্যাপকের একটা রীতিই ছিল, বহিরাগত ছাত্রকে তাঁর বাড়িতে বাসিন্দারূপে গ্রহণ করা। অ্যালবার্ট অধ্যাপকের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিলো। যদিও উন্টিলার-পরিবারের মধ্যে অ্যালবার্ট মাত্র একবছর বাস করেছিল, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল বহুদিন। অধ্যাপক উন্টিলার অ্যালবার্টকে ভাষা শিক্ষায় সাহায্য করেন এবং অ্যালবার্টের সমবয়সী অধ্যাপকের এক পুত্র পরবর্তীকালে তার বোনের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেছিল।

অধ্যাপক উন্টিলার মাঝে মাঝে তাঁর ছেলেমেয়েদের ও অ্যালবার্টকে নিয়ে পাহাড়ে পায়ে হেঁটে লম্বা পাড়ি দিতেন। সুইজারল্যাণ্ডের নয়নবিমোহন দৃশ্যাবলীর মাঝে সদাচঞ্চল পাহাড়ী বাতাসে বেড়ানো অ্যালবার্টের স্বাস্থ্য ও মন উভয় দিক থেকেই পরম বিস্ময়কর হয়েছিল। প্রকৃতির লীলাভূমি এই সুইজারল্যাণ্ডে বড় বড় হ্রদ, পর্বতদেহ-নিঃসৃত জলপ্রপাত, পাইনের বন ও হিমবাহ ঘিরে আছে এই দেশটিকে। উৎসাহী ভ্রমণকারীর দল পদব্রজে হাঁটতে হাঁটতে বোধ হয় উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেত—উঁচু

ও সংকীর্ণ শৈলশিরায় ছাগলের দল বিচরণ করছে অথবা খাড়া পর্বতগাত্রে কৃষকেরা খড় শুকোচ্ছে। কারণ সুইজারল্যাণ্ড হচ্ছে পর্বত ও উপত্যকার দেশ। তুষারমণ্ডিত গিরিচূড়া, সবুজ পর্বতগাত্র এবং স্থলভাগে খাঁজ কেটে প্রবহমাণ নদী এদেশের পরিচিত দৃশ্য।

অ্যারাউতে অ্যালবার্টের বিদ্যাশিক্ষার একটি দিক বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। একবার পাঠাভ্যাস করতে বসলে সে প্রয়োজনাতিরিক্ত আয়ত্ত করতে পারত। পদার্থবিদ্যায় সে অনেকখানি এগিয়ে যায়। গণিতবিদ্যার মতো পদার্থবিদ্যাও তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করত (এবং এই বিষয়ে একদিন সে তার সৃজনী প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর রেখেছিল)। আট দশ মাসের মধ্যে সে অ্যারাউ স্কুলের পাঠ্যক্রম শেষ করে জুরিখে সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে প্রস্তুত হলো। কারণ এখন আর তার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার প্রয়োজন রইল না।

উন্টিলার পরিবারবর্গের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিলানে তার নিজের পরিজনদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার সময় যখন এলো, তখন পুরনো লাজুকতা তাকে পুনরায় আচ্ছন্ন করে ফেলে—কি যে বলতে হবে তা সে ভেবে পেল না। কারণ উন্টিলার পরিবার ছিল তার নিজের পরিজনদেরই যেন দ্বিতীয় সত্তা। উন্টিলার পরিবারবর্গও জানতেন অ্যালবার্টের পক্ষে বিদায়-সম্ভাষণ জানানো কঠিন হবে। তাই ট্রেন ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা স্টেশন প্লাটফরমে তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করেছিলেন।

অ্যারাউতে সে ছিল অত্যন্ত সুখী এবং তার স্কুলজীবন ছিল পরম আনন্দদায়ক। কারণ এ স্কুলে নিয়মানুবর্তিতার বালাই ছিল না এবং ছাত্রেরা বিনানিষেধে এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে যেতে পারত। 'অ্যারাউ' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'অ্যার' নদীর তীরে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর। এবং অ্যারাউতে অ্যালবার্টের জীবন ছিল ঠিক যেন একটা বড় নদীর ধারে শান্তিপূর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন।

প্রায় একবছর অনুপস্থিতির পর অ্যালবার্ট মিলানে ফিরে

আসায় তাকে দেখে সমগ্র পরিবার পরম উল্লসিত হয়েছিলেন।
আগের চেয়ে অ্যালবার্ট এখন আরও বেশি লম্বা ও স্বাস্থ্যবান হয়েছে। পাহাড়পর্বতে ভ্রমণ যা তার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল, অ্যারাউতে সেটা পূর্ণ হয়েছিল এবং তার দিকে তাকিয়ে মা-বাবা মনে মনে গর্ব অনুভব করেছিলেন। তার ধূসর চোখ দুটি এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং কালো চকচকে চুলে ঢেউ খেলেছে। মা-বাবা দেখলেন তাঁদের ছেলেটি এখন একজন সুশ্রী তরুণ হয়ে উঠেছে।

এবার কিন্তু অ্যালবার্ট মিলানে বেশিদিন থাকতে পারে নি। সে জানত পরিবারের কাছ থেকে সে এখন আর বেশি কিছু আশা করতে পারে না। কারণ তাকে সাহায্য করার মতো ক্ষমতা তাঁদের আর এখন নেই। সে এখন ভালো করেই বুঝতে পেরেছিল, তার নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। তাকে এখন মনস্থির করতে হবে—সে তার বাবার ব্যবসায়ে যোগ দিয়ে সাহায্য করবে, না তাঁদের ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু তার ব্যবসা-বুদ্ধি ছিল না বা সে বিষয়ে কোনো আগ্রহও ছিল না। সে উপলব্ধি করেছিল, ইতিমধ্যেই বাবার ব্যবসার এমন অবস্থা হয়েছে যে সেটাকে আর রক্ষা করা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক স্কুলে ফিরে যাবার জন্যেই অ্যালবার্টের মন ব্যগ্র হয়ে উঠলো।

সুইজারল্যাণ্ডের নয়নবিমোহন পাহাড় ও জুরিখ শহর অভিমুখে যাত্রার উদ্দেশ্যে সে যখন ট্রেনে চেপে বসলো তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা আরম্ভ হলো। কারণ এই যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। এই অধ্যায় যুগপৎ সংগ্রাম ও সুখে পরিপূর্ণ।

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের কাছে জুরিখ শহরটি ছিল সহনশীলতার একটি নবপীঠস্থান—একটি বিশ্ব-রাজধানী, যেখানে বিশ্বের সকল জাতির ও সকল ধর্মের মানুষ সমবেত হয়েছে। মিউনিকের সঙ্গে এর কি বিরাট প্রভেদ!

জুরিখ শহরটি লিমাট নদীর উভয় তীরেই গড়ে উঠেছে এবং

শহরের উভয় অংশের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করেছে একাধিক সেতু। শহরের নতুন অংশের রাস্তায় পরিচ্ছন্ন আধুনিক গৃহসমূহ সুশোভিত, কিন্তু পুরনো অঞ্চলের বাড়িগুলি বিচিত্র ধরনের এবং রাস্তাগুলি আঁকাবাঁকা সরু ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। শহরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে জুরিখ হ্রদের জলে পালতোলা নৌকা সদাসর্বদা ভেসে বেড়ায়।

শেষ পর্যন্ত অ্যালবার্ট নিজের পছন্দমতো স্কুলে প্রবেশাধিকার লাভ করলো। এতে তার কত যে আনন্দ! সে সময় জুরিখ শহরটি ছিল বিদ্যাশিক্ষার একটি পীঠস্থান। পলিটেকনিক থেকে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় বেশি দূরে নয়। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু যে আধুনিক ধরনের ভবন আছে তা নয়, এখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা সাধিত হয়েছে এবং পৃথিবীর সর্বপ্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখানে জ্ঞানার্জনের জন্যে আসে।

কীর্তিমান লোকের পক্ষে তার যোগ্য বন্ধু খুঁজে পাওয়া কঠিন, কারণ জগতে কীর্তিমান লোকের সংখ্যা বিরল। কিন্তু অ্যালবার্ট জুরিখে তার যোগ্য বন্ধু খুঁজে পেয়েছিল। এই সময় তার বয়স সতেরো বছর।

জুরিখে অ্যালবার্টের নতুন বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল হাঙ্গেরী-আগত তরুণী, নাম মিলেভা মারিৎস। মিলেভার পূর্ববৃত্তান্ত বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। যদিও সে হাঙ্গেরী থেকে আগত, কিন্তু তার মাতৃভাষা সার্বিয়ান এবং সে গ্রীকদের গোঁড়া ধর্মাচরণে বিশ্বাস করত। অ্যালবার্টের গণিতের ক্লাশে সে একদিন বসেছিল। অ্যালবার্ট ছিল অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির আর মিলেভা নিজের কাজ নিয়েই মেতে থাকত। অ্যালবার্ট ও মিলেভার মধ্যে কে প্রথমে কথা বলেছিল তা আমরা জানি না। আমরা শুধু এটুকু জানি, গণিতের আগ্রহই তাদের দুজনকে পরস্পরের কাছে টেনে এনেছিল। কুমারী মারিৎস গণিত ও পদার্থবিদ্যা উভয় বিষয়েই পারদর্শী ছিল। ক্লাশে সে যেভাবে প্রশ্নের উত্তর দিত অ্যালবার্ট তার প্রশংসা করত। অল্পকালের মধ্যে তাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো এবং তারা একসঙ্গে

পাঠাভ্যাস শুরু করলো। স্নাতক ডিগ্রী লাভ করবার বহু পূর্বেই তারা ঘোষণা করলো, একদিন তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবে।

এই সময় অ্যালবার্টের আর একজন মূল্যবান বন্ধু ছিলেন অষ্ট্রিয়াগত ফ্রেড্রিক অ্যাডলার। অ্যালবার্টের কাছে অ্যাডলার বিশেষ মূল্যবান ছিলেন এই কারণে যে তিনিই সর্বপ্রথম আইনষ্টাইনকে রাজনীতিতে আগ্রহান্বিত করেন। দুঃসাহসী, তেজী ও উদ্দীপনাময় অ্যাডলারের সঙ্গে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত আইনষ্টাইন শুধু বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে চিন্তা করে এসেছিলেন। অ্যাডলারের তীক্ষ্ণ চোখ দুটি ছিল নীল রঙের এবং মুখটি গোল, প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে তিনি সব সময় কপাল কোঁচকাতেন।

আইনষ্টাইনের মতো অ্যাডলারও ছিলেন বিজ্ঞানসাধক। তাঁর ছাত্রজীবনের কৃতিত্ব ও স্বচ্ছ মননশীলতার জন্যে আইনষ্টাইন তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ করে ফেলেন। অ্যাডলার একজন শান্তিবাদীও ছিলেন। যে সময় সমগ্র ইউরোপের লোকেরা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে ও খুঁটিনাটি নিয়ে কলহে প্রবৃত্ত হচ্ছে, যখন প্রতিদিনই লোকেরা রণোন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তিনি তখন শান্তির বাণী প্রচার করছিলেন।

আইনষ্টাইন সারা জীবনব্যাপী শান্তিবাদী ছিলেন। এই শান্তিবাদ সম্পর্কে তাঁর কি মনোভাব ছিল তা বুঝতে হলে শান্তিবাদ বলতে কি বোঝায় তা আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

বস্তুত, শান্তিবাদী আছেন দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর হচ্ছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যুদ্ধমাত্রই অন্যায় এবং যুদ্ধকে অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে। তাঁরা বিশ্বাস করেন, শান্তিরক্ষার জন্যে জাতিসঙ্ঘ বা জাতিপুঞ্জের মতো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা থাকা প্রয়োজন। পরবর্তীকালে ডঃ আইনষ্টাইন এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সরকারের পরিকল্পনা পেশ করেন যার যুদ্ধ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকবে। অপরপক্ষে একশ্রেণীর চরম শান্তিবাদী আছেন যাঁরা মনে করেন যাই ঘটুক না কেন বলপ্রয়োগ করা অন্যায়। তাঁরা মনে করেন হিংসামাত্রই অন্যায়। এমন কি, আত্মরক্ষার

জন্যেও অস্ত্রধারণ বা বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী তাঁরা নন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শান্তিবাদী হচ্ছেন কোয়েকার্স এবং পরলোকগত মহাত্মা গান্ধীর মতো লোকেরা।

আইনষ্টাইন এবং অ্যাডলার শান্তিবাদ সম্বন্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন। আলোচনা-সময় যেসব যুক্তি উঠত তার থেকে তাঁরা প্রেরণা পেতেন এবং পরস্পর পরস্পরের যুক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন। নতুন জার্মান জাতির গড়ে ওঠা তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন এর পরিণামে বিপত্তি ঘটবে। কিন্তু আইনষ্টাইন তখন উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, তার জীবিতকালেই দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে। এবং এ-ও উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, বিশ্বশান্তির জন্যে তাঁকেও একদিন অনেক কিছু করতে হবে। এই ব্যাপারে অ্যাডলার ধন্যবাদার্হ। কারণ তিনিই আইনষ্টাইনকে এই বিষয়ে প্রভাবান্বিত করেছিলেন।

কিন্তু পলিটেকনিকে অ্যালবার্টের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার বিদ্যাশিক্ষা। এখানে সে সম্পূর্ণ নিজস্ব এক নতুন জগতে প্রবেশ করে। ইতিমধ্যেই তার মধ্যে একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, স্বাধীন চিন্তাবিদ, সংশয়বাদী ও সত্যসাধকের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। একদিন তার চিন্তাধারা, সংশয় ও সত্যসাধনা বিজ্ঞানের ধারণার আমূল পরিবর্তন করে দেবে। জুরিখে সে কেবল বিদ্যাশিক্ষায় মন-সংযোগ করেছিল, জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করে বিস্ময় অনুভব করত এবং আরও জ্ঞানার্জনের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠত। এইভাবে সে পলিটেকনিকের সব কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করে ফেলেছিল। এরপর বাকী জীবনকাল সে নিজেই রহস্যানুসন্ধানের গভীরে ডুব দিয়েছিল।

স্বাধীনতাপ্রিয় অ্যালবার্ট সব সময় ক্লাশে যোগ দিত না। কিন্তু জুরিখের স্কুলে নিয়মকানুনের বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না। শিক্ষকেরা তার অনিয়মিত উপস্থিতি নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন অ্যালবার্টের মতো বুদ্ধিমান ছেলের পক্ষে যে কোনো

বাদ-দেওয়া বিষয় অতি শীঘ্রই আয়ত্ত করে নেওয়া সম্ভব। তাই অ্যালবার্টের অমনোযোগিতার জন্যে তাঁরা তাকে তিরস্কার করতেন না।

অ্যালবার্টের মা-বাবার আর্থিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না, তাঁরা দরিদ্রই ছিলেন বলা চলে। তা হলে পলিটেকনিকে অ্যালবার্ট কিভাবে জীবন যাপন করত? স্বচ্ছলভাবে সে জীবন নির্বাহ করতে পারত না। কম ভাড়ায় একটি ঘর, স্বল্প কয়েকটি পরিধেয় এবং অতি সামান্য আহার্য এই নিয়ে সে জীবন নির্বাহ করত। কারণ খাদ্য কেনবার ও বাড়িভাড়া দেবার মত অর্থ তার অতি সামান্যই থাকত। একজন সঙ্গতিপন্ন আত্মীয় প্রতি মাসে তাকে কুড়ি ডলারের মতন পাঠাতেন। সেই সময়েও এই পরিমাণ অর্থ খুব বেশি মনে হত না। এক এক সময় এমন গেছে, যখন অ্যালবার্টকে অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছিল।

পিছিয়ে-পড়া সহপাঠীদের পড়িয়ে অ্যালবার্ট কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করত। কিন্তু যেসব ছাত্র তার কাছে পড়াশোনায় সাহায্যের জন্যে আসত তাদেরও বেশি অর্থ দেবার সামর্থ্য ছিল না। এবং তারা সাধ্যমত যা দিত তা-ই সহৃদয়তার সঙ্গে অ্যালবার্ট গ্রহণ করত।

একজন হয়তো বললে, 'এর বেশি আমি দিতে পারব না।'

অ্যালবার্ট উত্তর দিত, 'ঠিক আছে। তুমি দিতে পার বা নাই পার, আমি তোমাকে যে কোনো উপায়ে সাহায্য করব।'

প্রতি বসন্তকালে পাঠবর্ষ শেষ হলে অ্যালবার্ট ইতালীর মিলানে তার পরিবারবর্গের সঙ্গে ছুটি উপভোগ করবার জন্যে চলে যেত। সমগ্র পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়া প্রত্যেকের কাছেই পরম আনন্দদায়ক ছিল এবং সেই সূর্যকরোজ্জ্বল শান্তিপূর্ণ শহরে তারা ক্ষণকালের জন্যেও তাদের দুঃখদারিদ্র্যের কথা ভুলে যেতে পারত।

কিন্তু দারিদ্র্য সত্ত্বেও এবং কখনও কখনও অনাহারে দিনযাপন করা সত্ত্বেও অ্যালবার্ট সুইস ফেডারেল পলিটেকনিকে যে চার বছর অতিবাহিত করেছিল সেই কালটি তার কাছে পরম সুখকর

হয়েছিল। কারণ সেখানেই সে তার বন্ধু পেয়েছিল, এমন শিক্ষক পেয়েছিল যাঁরা তাকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেখানেই সে পেয়েছিল তার ভবিষ্যতের জীবনসঙ্গিনীকে।

অবশেষে ১৯০০ সালে অ্যালবার্টের স্নাতক হবার দিন ঘনিয়ে এলো। এই দিনটি তার কাছে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের দিন বলে পরিগণিত হয়েছিল। হর্ষের দিন, কারণ সে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করতে পেরেছে। বিষাদের দিন, কারণ এবার তাকে পলিটেকনিক ছেড়ে চলে যেতে হবে। এখন সে এবং মিলেভা মারিৎস পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে এবং সংসারে প্রবেশ করে জীবিকা অর্জন করতে পারে।

—'তুমি এখান থেকে কোথায় যাবে?'—অ্যালবার্টকে একজন শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন।

—'আমার পছন্দ সুইজারল্যাণ্ড,' অ্যালবার্ট বললে, 'আমি জুরিখে বসবাস করে কাজ করতে চাই।'

শিক্ষকমশাই অ্যালবার্টকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি তার গলা জড়িয়ে ধরলেন।

—'তুমি কি হতে চাও?'

এই প্রশ্নের উত্তর অ্যালবার্টের এখন আর অজানা ছিল না। চার বছর আগে সে ভাবত, জীবিকার্জনের জন্যে কোনো কাজ সে করতে পারবে না। কিন্তু এখন সে সঠিকভাবেই জানত, সে কি হতে চায়।

তাই সঙ্গে সঙ্গেই সে উত্তর দিল, 'আমি শিক্ষক হতে চাই।'

পঞ্চম অধ্যায়

জুতা তৈরীর কাজ

কলেজীর শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর প্রতিভাধর ও আকর্ষণীয় যুবা আইনষ্টাইন শিক্ষকতার সন্ধান করতে লাগলো। সে আশা করেছিল, আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ না করে অবিলম্বে নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারবে।

হঠাৎ জুরিখ শহরে সে সম্পূর্ণ নির্বান্ধব হয়ে পড়লো এবং চেষ্টা করেও কোনো চাকরি জোগাড় করতে পারলো না। এখানে সেখানে পলিটেকনিকের ছাত্রদের পড়িয়ে তার যৎসামান্য অর্থ উপার্জন হত বটে, কিন্তু জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে তা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সে দেখলো—অন্যান্যরা কাজ খুঁজে পাচ্ছে, অথচ সে পাচ্ছে না। সে ভেবে পেল না—কি তার ত্রুটি হচ্ছে?

অ্যালবার্ট পলিটেকনিকে ফিরে গেল। উদ্দেশ্য—পূর্বতন শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাদের কারো সহকারীরূপে কাজের সন্ধান। কারণ সেসময় শিক্ষকেরা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের সহকারীরূপেই শিক্ষকতার প্রথম পাঠ গ্রহণ করতেন। অ্যালবার্টকে দেখে তার কোনো কোনো শিক্ষক আনন্দিত হয়েছিলেন, কারণ ছাত্ররূপে তার প্রতিভার পরিচয় তাঁরা পেয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষক তাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন, পাছে এই প্রতিভাধর ছাত্রটি তাদের হটিয়ে দেয়। তাকে নিবৃত্ত করবার জন্যে তারা কি করতে পারেন? সাধারণ মেধাবী ছেলের চেয়ে সে ছেল

অনেক বেশি প্রতিভাসম্পন্ন, তার চেহারাও ছিল সুন্দর এবং আচরণ ছিল অমায়িক ও ভদ্র। তার পোশাক-পরিচ্ছদে দারিদ্র্যের ছাপ ছিল বটে, কিন্তু শুধুমাত্র সে কারণে তো কোনো মানুষকে নিযুক্ত করা যায় না। কেননা কাজ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হলে সে ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ কিনতে পারবে।

কিন্তু অজুহাত খুঁজে পাওয়া তো কঠিন নয়। তাঁরাও তাঁদের প্রয়োজনীয় অজুহাত পেয়ে গেলেন। আইনষ্টাইন হচ্ছে ইহুদী. শুধু এই অজুহাতই তাকে চাকরি না দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এবং সত্যসত্যই তাঁরা আইনষ্টাইনকে চাকরি দিতে দেন নি। দীর্ঘ ছ মাস তাকে কপর্দকহীন হয়ে অনাহারে কাটাতে হয়েছিল। চাকরির সন্ধানে সে জুরিখের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিল। যে কোন রকম কাজ করতে সে রাজী ছিল, তবু কোথাও সে চাকরি পায় নি। শেষে যখন সে উপলব্ধি করলো কি কারণে সে কোথাও চাকরি পাচ্ছে না, তখন তার সমস্ত হৃদয়মন বিতৃষ্ণায় ও বিষণ্ণতায় ভরে উঠলো।

—'আমি ইহুদী বলেই কি আমাকে অনাহারে থাকতে হবে' -- এ প্রশ্ন তার মনে নাড়া দিয়েছিল।

ইহুদী হওয়ার অজুহাতে তাকে চাকুরি দেওয়া হয় নি। কিন্তু সে যদি ইহুদী না হয়ে অন্য কিছু হত, তা হলেও কি তাকে ঘৃণা করা হত এবং চাকুরি না দেবার জন্যে অন্য কোনো অজুহাত খুঁজে বার করা হত? কিন্তু কেন—কেন এই অবিচার? আইনষ্টাইন তা উপলব্ধি করতে পারে নি। কারণ সে এত সরল ছিল যে নিজের প্রতিভা সে ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারত না।

একদিন অ্যালবার্ট শুনলো. নিকটবর্তী উইন্টারথার শহরে একটি বৃত্তিমূলক কারিগরী বিদ্যালয়ে একজন বিকল্প শিক্ষক প্রয়োজন। সে এই কাজের জন্যে আবেদন করলো এবং কাজটা পেয়েও গেল।

প্রথম দিন ক্লাসে সে যখন শিক্ষকতা শুরু করতে গেল, তখন

[illegible] তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। শিক্ষকতা করার উৎসাহ নিয়ে ক্লাসে ঢোকবার জন্যে সে যখন দরজা খুলতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একদল ছেলে হৈ হৈ করে উঠলো। তাদের কেউ কেউ তার চেয়ে চেহারার দিক থেকে বড়, কেউ বা বয়সে বড়। স্কুলটি একটি কারখানা-কেন্দ্রিক শহরে অবস্থিত। ছাত্ররা তার প্রতি বীতরাগের দৃষ্টি হেনে স্থির করলো, নিয়মিত শিক্ষকমশাই না আসা পর্যন্ত এই ছোটখাটো লোকটিকে নিয়ে তারা মজা করবে, তাতে যদি তারা কিছু শিখতেও না পারে ক্ষতি নেই।

উদ্দীপনার পরিবর্তে আইনষ্টাইনের মনে তীব্র সংশয় জাগলো। ঘরের সামনে সে এগিয়ে গেল।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে সে বললো, ‘সুপ্রভাত।’ ক্লাশের ছেলেরা অস্পষ্ট-স্বরে প্রত্যুত্তর করল।

এক টুকরো খড়ি নিয়ে আইনষ্টাইন ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে এগিয়ে গেল। একবার সমস্ত ক্লাশের দিকে তাকিয়ে নিয়ে সে পড়াতে শুরু করে দিল। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্রূপ ও বিরূপ মন্তব্য নিশ্চুপ হয়ে গেল, পায়ের ঘষঘষানির আওয়াজও থেমে গেল।

আইনষ্টাইন তার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলো। ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি আঁকলো। বিশেষ যত্নসহকারে সে হাতে-কলমে বিষয়বস্তু বোঝাতে লাগলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লাশের ছাত্রদের হৃদয় জয় করে নিল। ছাত্ররা অনুরাগী হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। কারণ সে যেসব কথা বলছিল তার একটি শব্দ পর্যন্ত তারা হারাতে চায় নি। এরপর আইনষ্টাইন যতদিন এই স্কুলে ছিল ততদিন তার এই সাফল্য অব্যাহত ছিল। ছাত্ররা তার বক্তৃতার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকত এবং ছ মাসের শেষে যখন স্কুল থেকে সে বিদায় গ্রহণ করে তখন তারা বিমর্ষ হয়েছিল।

জুরিখে ফিরে এসে আইনষ্টাইনকে আবার কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হলো। সে সময় তাকে প্রকৃতপক্ষে অনাহারেই দিন কাটাতে হত। জুরিখে যুবা বয়সের এই দিনগুলি ছিল তার সমগ্র

জীবনের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি সংগ্রামের। বস্তুত, সে তখন ভিক্ষুকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।

মার্শেল গ্রসম্যান নামে পলিটেকনিকের একজন সহপাঠী অন্য সব বন্ধুর চেয়ে তার প্রতি বেশি সহৃদয় ও অন্তরঙ্গ ছিল। আইনস্টাইনের দুরবস্থা দেখে অন্য বন্ধুরা মৌখিক সমবেদনা জানিয়ে বলত, 'খুবই দুঃখের বিষয় এটা।' কিন্তু গ্রসম্যান যখন তার দুরবস্থার কথা শুনল তখন শুধু মৌখিক সমবেদনা জানাল না, তার দুঃখ লাঘবের সত্যসত্যই চেষ্টা করল। সুইজারল্যান্ডের বার্নে সরকারী পেটেন্ট অফিসের অধিকর্তার সঙ্গে সে আইনস্টাইনের পরিচয় করিয়ে দিল এবং আইনস্টাইনকে একটা চাকরি দেবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করল।

একটা স্থায়ী চাকরি পাবার আশায় আইনস্টাইনকে দীর্ঘক্ষণব্যাপী ক্লান্তিকর ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল। তাকে যেসব প্রশ্ন করা হয় সে সতর্ক হয়ে তার যথাযথ উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার মনে সংশয় জেগেছিল—তাঁরা কি তাকে চাকরি দেবেন? ইহুদী হওয়ার অজুহাতে তাঁরাও কি তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জাহির করবেন? তার আশঙ্কা ছিল, তার জীর্ণ সাজপোশাকের দরুন একটা খারাপ ধারণা না হয়ে যায়।

অবশ্য, পেটেন্ট অফিসের অধিকর্তা তখন উপলব্ধি করতে পারেন নি যে তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানীর কর্মনিয়োগের পরীক্ষা গ্রহণ করছেন। তিনি আইনস্টাইনের দিকে তাকিয়ে প্রার্থিত পদের কাজটা বোঝাতে লাগলেন।

'কোন লোক যখন কোনো যন্ত্র উদ্ভাবন করে, তখন সে পেটেন্ট অফিসে তার উদ্ভাবিত জিনিসের নকসা পাঠিয়ে দেয়। আপনার কাজ হবে এই নকসাগুলি পরীক্ষা করা এবং নির্ণয় করা যে নতুন উদ্ভাবনটি কার্যকরী হবে কিনা এবং নিশ্চিতভাবে যাচাই করতে হবে সেটা অনুকরণ বা চুরি করা হয়েছে কিনা। কখনও কখনও আপনাকে পেটেন্টের আবেদন নতুনভাবে লিখতে ও সম্পাদনা

করতে হবে, যাতে এর অর্থ সম্বন্ধে কারো মনে কোন সংশয় না জাগে।'

অ্যালবার্টের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক মনের কাছে এই কাজটি একেবারেই কঠিন বলে মনে হয় নি।

সে সাবনয়ে উত্তর দিল, 'আমার মনে হয়, কাজটা আমি করতে পারব।'

এরপর আরও এক ঘণ্টাকাল আইনষ্টাইনকে প্রশ্ন করা হয়। পেটেণ্ট অফিসের অধিকর্তা একজন উদারহৃদয় লোক ছিলেন। তিনি সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যদিও এই কাজে আইনষ্টাইনের কোন অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু তার গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক মেধা এবং প্রতিভাসম্পন্ন মন তাঁর কাছে এক বিশেষ সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে। তার মতো লোকের পক্ষে কাজটা শিখে নিতে বেশি সময় লাগবে না।

—'আইনষ্টাইন, আর একটা জিনিস শুধু আছে—সরকারী পর্যায়ে কাজ করতে হলে তোমাকে সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক হতে হবে।'

—'আমি তো সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক, স্যার।'

কলেজে ছাত্রাবস্থায় আইনষ্টাইন এখানে সেখানে অল্প পরিমাণ অর্থ ধীরে ধীরে ও সযত্নে সঞ্চয় করে নাগরিকত্ব আবেদনের দেয় ফি জমা দিয়েছিল। বহুদিন সে পৃথিবীর কোনো দেশেরই নাগরিক ছিল না, কারণ সে নিজেকে জার্মান বলে মনে করত না। স্বাধীন ও রমণীয় ক্ষুদ্র দেশ সুইজারল্যাণ্ডকে তার এত ভালো লেগেছিল যে সে সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অধিকর্তা বললেন, 'খুব ভালো কথা। আমরা তোমাকে কাজটা দিয়ে পরীক্ষা করব।'

আইনষ্টাইনের সুখের দিন শুরু হলো। মাইনে খুব বেশি নয়, তবে তার ভরণপোষণের পক্ষে পর্যাপ্ত। সে একটা স্থায়ী কাজ পেয়েছে। এবার সে ও মিলেভা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে।

১৯০২ সালের বসন্তকালে অ্যালবার্ট সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন শহরে চলে এলো এবং পেটেন্ট অফিসে তার নতুন কাজ শুরু করলো। কাজ শিখতে তার বেশি দিন লাগে নি। বস্তুত, এই সহজ কাজটি তার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ বোধ হয়েছিল। অফিসে যে কাজ অন্যান্যেরা ৬।৭ ঘণ্টায় শেষ করত সে কাজ করতে আইনস্টাইনের লাগতো মাত্র তিন ঘণ্টা। আইনস্টাইন তার পেটেন্ট অফিসের কাজ অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে বাকী সময়টুকু ব্যবহার করত তার প্রিয় গণিতচর্চায়। ঊর্ধ্বতন অফিসার আসছেন শুনলে গণিত-সংক্রান্ত কাগজপত্র ড্রয়ারে লুকিয়ে ফেলতো এবং পেটেন্ট বিষয়ক কাগজপত্র দেখার ভান করতো। পেটেন্ট অফিসে থাকার সময়েই আইনস্টাইন তার প্রাথমিক পর্বের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। এই তত্ত্ব সমগ্র বিশ্বকে চমকিত করেছিল। সাধারণত যেমন ভাবা হয় অ্যালবার্ট কিন্তু তার পেটেন্ট অফিসের কাজকে সেভাবে অবজ্ঞা না করে বরং ভালোই বাসত, কারণ কাজটি তাকে অভীপ্সিত কাজ করার প্রচুর অবসর দিত। সে এই কাজটিকে 'জুতো সেলাই'এর কাজ বলে অভিহিত করত। কারণ তার কাছে এই কাজটি ছিল অতি সহজ। অথচ এই কাজে সে একটা মোটা অঙ্কের বেতন পেত। তাই, এরকম একটা কাজ পেয়ে সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করত। তাছাড়া স্থায়ী এই পদে বহাল থাকা তার পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় হয়েছিল। এই পদে বহাল থেকে সে তার গণিতচর্চা করার অবসর পেয়েছিল। বস্তুত, এই 'জুতো সেলাই'এর কাজকে সে একরকম অবসর বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করত এবং তার আসল কাজ ছিল গণিতচর্চা। চিত্তবিনোদনের জন্যে কেউ যেমন তাস খেলে, কেউ বা রেডিও শোনে, আইনস্টাইন তেমনি কয়েক ঘণ্টা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার পর গণিতচর্চার মাধ্যমে তার ক্লান্তি দূর করার পথ খুঁজে পেত।

কয়েক মাসের মধ্যে মিলেভা মারিৎস বার্ন শহরে এসে অ্যালবার্টের সাথে মিলিত হলো। সুখ যে কি বস্তু আইনস্টাইন

এবার তার আস্বাদ পেল। সে এখন এমন একটি কাজ পেয়েছে যে কাজে তাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয় না, অথচ গণিতচর্চা করার অবসরও পাওয়া যায়। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবও সে পেয়েছে।

দারিদ্র্যে অনাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর দিন অতীত হয়েছে। এখন একটার পর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হতে লাগলো। ১৯০২ সালে সে চাকরি পেল, ১৯০৩ সালে মারিৎসের সঙ্গে তার বিবাহ হলো এবং ১৯০৪ সালে তাদের প্রথম সন্তান অ্যালবার্টের জন্ম হলো।

কিন্তু বিশ্বের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো ১৯০৫ সালে অ্যালবার্ট যখন মাত্র ছাব্বিশ বছরের যুবক, তখন আপেক্ষিকতা সংক্রান্ত তার প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলো। পেটেন্ট অফিসে কাজ করা কালে তিন বছরব্যাপী গণিতবিষয়ে গবেষণার পর আইনষ্টাইন এই অতি মূল্যবান তত্ত্ব রচনা করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুমহান তত্ত্ব

পাঠক যদি বড়ো বড়ো কথা বা নতুন চিন্তাধারা সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে থাকেন, তা হলে এই অধ্যায়টি, তিনি বাদ দিলেই ভালো করবেন। কারণ এই অধ্যায়ে ডক্টর আইনষ্টাইনের প্রাথমিক তত্ত্বের সহজবোধ্য দিকটি বিবৃত হয়েছে। কিন্তু পাঠক যদি এই অধ্যায়টি পড়বার সংকল্প করে থাকেন, তা হলে তিনি দেখবেন ডঃ আইনষ্টাইনের চিন্তাধারা সাধারণভাবে যে কেউ বুঝতে পারে। এই তত্ত্বের গণিতের দিকটা অত্যন্ত কঠিন এবং আমাদের অধিকাংশেরই ধারণার বাইরে। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে কিছুই আলোচনা করব না।

প্রথমত, যে শব্দগুলি আমাদের এখানে ব্যবহার করতে হবে সেগুলি দেখা যাক—আলোক, বিশ্বজগৎ, কাল, চতুর্থ মাত্রা। এই শব্দগুলি একটি একটি করে আলোচনা করলে কঠিন বোধ হবে না।

আলোক কি? দিবাভাগে আলো থাকে বলেই আমরা দেখতে পাই। রাত্রিতে আমরা দেখতে পাই না, যেহেতু তখন আলো থাকে না। তা হলে আলো জিনিসটা কি? দিবাভাগে যে আলোর সঙ্গে আমরা পরিচিত সেটা আসে সূর্য থেকে। শুধু আলো নয়, তাপও আমরা পাই সূর্য থেকে। কখনও কি দেখেছেন একখণ্ড লোহা, যেমন স্টোভের চাকতি, পর্যাপ্ত উত্তপ্ত হলে আলো বিকিরণ করে? উত্তপ্ত হতে হতে এটি লালবর্ণ ধারণ করে। অন্ধকার ঘরে এই লালবর্ণের স্টোভ-চাকতি আলো বিকিরণ করবে।

আলোক ও তাপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সূর্য হচ্ছে একটি জ্বলন্ত পিণ্ড। সূর্য যুগপৎ তাপ ও আলো বিকিরণ করে। সূর্য বহনে রাত্রি হয় দিনের চেয়ে ঠাণ্ডা। আলোক ও তাপ উভয়ই শক্তির দুটি রূপ। শক্তি বলতে আমরা বুঝি কাজ করার ক্ষমতা। কোন গতিশীল অনুষঙ্গের দ্বারা চালিত না হয়ে মানুষ নিজে নিজেই চলাফেরা করতে পারে। এ কারণে আমরা বলি, মানুষের শক্তি অর্থাৎ কর্মক্ষমতা আছে। ডায়নামো বা অন্য কোন বাইরের উৎসের সাহায্য ছাড়াই সূর্য তাপ ও আলোক বিকিরণ করে। সূর্যের এমন শক্তি আছে যা সবসময়েই বিকীর্ণ হয়। আলোক-শক্তির এমন অনেক রূপ আছে যা মানুষ চোখে দেখতে পায় না, যেমন বেতার-তরঙ্গ, এক্স রশ্মি। কিন্তু আলোকেব কোন কোন রূপ আবার দৃষ্টিগ্রাহ্য। আলোকের এই রূপকেই আমরা বলি দৃশ্যমান আলো।

বিশ্বজগৎ কি? রাত্রিকালে আকাশের দিকে অর্থাৎ মেঘমুক্ত তারকাখচিত আকাশের দিকে তাকালে আমরা বিশ্বজগৎকেই দেখতে পাই। এই বিশ্বের সীমানা যে কতদূর বিস্তৃত তা কেউ জানে না; কারণ আকাশের গায়ে যে তারা আমরা দেখতে পাই সেগুলি লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এদের সীমানার বাইরে আছে অনেক তারা, যাদের কেবল শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যেই দেখা যায়। কিন্তু এদের ছাড়িয়ে আছে আরও অনেক তারা, যা আমরা কখনই দেখতে পাই না। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্র নিয়েই এই বিশ্বজগৎ গঠিত।

মহাকাশে প্রত্যেকটি নক্ষত্র হচ্ছে আমাদের সূর্যের মত এক একটি জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক। এই নক্ষত্রগুলি বহুদূরে অবস্থিত বলে ছোট দেখায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি অতি প্রকাণ্ড।

আমাদের পৃথিবী, সূর্য, তারা, বা গ্রহাদি যা আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেখতে পাই বা পাই না তাদের সম্বন্ধে একটি প্রধান কথা হচ্ছে এই যে, এদের প্রত্যেকের পরিক্রমার পথ নির্দিষ্ট। বিজ্ঞানী কাগজ

পেনসিল নিয়ে বসে এঁকে দেখাতে পারেন, কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নক্ষত্র বা গ্রহের মহাকাশে অবস্থিতি কোথায়।

'কাল' বলতে কি বোঝায়? ঘড়ির সাহায্যে আমরা কালের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বলতে পারি বটে তবু কালের সংজ্ঞা নির্ণীত হয় কি? কাল জিনিসটা স্থান দূরত্বের মতো। দুটি শহরের মধ্যে স্থানের যে ব্যবধান তাকে আমরা বলি দূরত্ব। অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি, দুটি ঘটনার ব্যবধান হচ্ছে কাল। উদাহরণস্বরূপ কলকাতা ও দিল্লীর মধ্যে স্থানের ব্যবধান হচ্ছে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার। সেইরকম আমাদের দেশে মধ্যাহ্ন আহার ও নৈশ-আহারের মধ্যে ব্যবধান হয় সাধারণত বারো ঘণ্টা। কিলোমিটার বা ওজনের মতো কালও হচ্ছে মাপের একটি পরিমাপ।

পাঠক সম্ভবত 'চতুর্থ মাত্রা' কথাটি শুনে থাকবেন এবং ভেবে থাকবেন এটা আবার কি। সাধারণ লোকের চেয়ে গণিতবিশেষজ্ঞের কাছে এই কথাটি অনেক বেশি অর্থব্যঞ্জক, কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে চতুর্থ মাত্রার অর্থ হচ্ছে কাল বা সময়। একবার এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে একজন রিপোর্টার যখন আইনস্টাইনকে একটিমাত্র কথায় চতুর্থ মাত্রার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে বলেন, তখন আইনস্টাইন রিপোর্টারের কথাটি ঠাট্টা ভেবে শুধু হেসেছিলেন। কিন্তু রিপোর্টারটি তার অনুরোধ বারবার উত্থাপন করেছিলেন এবং শেষে আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন চতুর্থ মাত্রাকে কাল বলে ব্যাখ্যা করলে কি ঠিক হবে না। আইনস্টাইন তখন মাথা নেড়ে জানিয়েছিলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে কালরূপে ব্যাখ্যা চতুর্থ মাত্রার একটি ভালো সংজ্ঞা বলে তিনি মনে করেন।

কিন্তু আইনস্টাইন নিজে যখন চতুর্থ মাত্রার কথা বললেন, তখন তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন। তিনি বললেন, বিশ্বে কোন গ্রহের অবস্থিতি নির্দেশ করতে হলে তিনটি মাত্রা পর্যাপ্ত নয়, কারণ গ্রহটি গতিশীল। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের মাথার উপর উড়ে যাওয়া কোনো বিমানের অবস্থিতি নির্দেশ করা যাক। প্রথমে আমরা

উত্তর-দক্ষিণে তার দূরত্ব পরিমাপ করব। তারপর আমরা পূর্ব-পশ্চিমে, দূরত্ব দেখব। এবং এরপর আমাদের উচ্চতা জানতে হবে; কিন্তু তা হলেই কি সব হলো? না, আমাদের সময় বা কালও জানতে হবে। নির্দিষ্ট সেকেণ্ডটি আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, কারণ বিমানটি চলমান এবং পরের সেকেণ্ডেই তার অবস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বিশ্বজগতে প্রত্যেকটি বস্তু সর্বসময়ে গতিশীল অবস্থায় রয়েছে এবং একারণেই আমাদের কালের কথা বিবেচনা করতে হবে।

এবার আপেক্ষিকতা প্রসঙ্গে আসা যাক। আপেক্ষিকতা কথাটির অর্থ কি? আপেক্ষিকতা বলতে বোঝায় অপর কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ বা অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা। ডঃ আইনষ্টাইন শুধু একথাই বলেন, আমরা যখন কোনো সময় বা স্থান পরিমাপ করি, তখন আমাদের অন্য কিছুর সঙ্গে তার তুলনা করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আমরা বলি ট্রেন ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে চলেছে তা হলে ঠিক বলা হবে না। আমাদের একথা বলতে হবে যে, ভূমির সম্পর্কে ট্রেনটি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার-বেগে চলেছে।

মনে করো, ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে ধাবমান ট্রেনের মধ্যে তুমি রয়েছ। জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে একপাশে তাকালে মনে হবে নিচের মাটি সাঁ সাঁ সরে যাচ্ছে। অপর পাশের জানালা দিয়ে তাকালে মনে হবে, তোমাদের ট্রেনটি অন্য এক ট্রেনের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছে। এবার ট্রেনে তোমার পায়ের তলার দিকে তাকাও। এখন মনে হবে, ট্রেনটা যেন চলছেই না!

ট্রেনের সঠিক গতি তা হলে কোন্‌টা? ডঃ আইনষ্টাইন বলেন, তিনটি গতিই ঠিক। কারণ, একটি বস্তুর গতির কথা বলতে গেলে অপর একটি বস্তুর গতির সঙ্গে তুলনা করতে হবে। যে ট্রেনে চেপে তুমি চলেছ সেটা নিম্নস্থ ভূমির তুলনায় ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেশি বেগে চলেছে; তার পার্শ্ববর্তী ট্রেনের তুলনায় ৮ কিলোমিটার বেশি বেগে চলেছে এবং তোমার সম্পর্কে তার গতি একেবারেই নেই।

মহাবিশ্বে আমরা যখন পরিমাপ করতে যাই তখন গণিতের ব্যাপার আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু ধারণাটা একই রকমের থাকে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এবং সূর্যের সম্পর্কে আমরা পৃথিবীর গতি পরিমাপ করতে পারি। কিন্তু সূর্য তার গ্রহমণ্ডলীকে নিয়ে মহাশূন্যে কি গতিতে আবর্তন করছে, সেটা আমরা পরিমাপ করতে পারি না। কারণ এই পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যে অবস্থান করে আমাদের সৌরজগতের আবর্তন লক্ষ্য করা সম্ভব নয়।

ডঃ আইনষ্টাইন তাই বলেছেন দূরত্ব হচ্ছে আপেক্ষিক। অর্থাৎ কেউ যখন আমাদের কোনো ট্রেন, নৌকা, বিমান অথবা মহাশূন্যে কোনো গ্রহের গতি পরিমাপ করতে বলে, তখন আমাদের বলতে হবে—হ্যাঁ, যখন আমরা পরিমাপ করব তখন কোথায় আমরা অবস্থান করছি তার ওপরেই এই সমস্ত নির্ভর করবে। যদি আমরা মাটিতে বসে ট্রেন যেতে দেখি, সেটা হবে একটা গতি। আবার আমরা যদি কোনো ট্রেনে বসে থাকি তখন আমাদের পার্শ্ববর্তী ট্রেনের গতি অত্যন্ত মন্থর মনে হবে। অথবা, যে ট্রেনটা আমরা পরিমাপ করতে যাচ্ছি সেটাকে উল্টোদিকে চলছে বলেও মনে হবে। যদি আমরা পাহাড়ের চূড়ায় বসে বহুদূরে কোনো ট্রেন যেতে দেখি তখন মনে হবে ট্রেনটা অতি ধীরে চলেছে। অথচ এই ট্রেনটাকে লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে যেতে দেখলে মনে হত, সেটা বেশ সাঁ সাঁ করে চলে গেল।

ডঃ আইনষ্টাইন আরও অনেক কিছু বলেছেন, স্থান ও কাল উভয়ই আপেক্ষিক এবং গতির ওপর নির্ভরশীল।

স্থান আপেক্ষিক হতে পারে বুঝি। কিন্তু কাল আপেক্ষিক হয় কেমন করে? যেভাবে স্থান আপেক্ষিক, ঠিক তেমনিভাবে কালও আপেক্ষিক। মনে করো, হাতে একটা ঘড়ি বেঁধে কোন বড় নদীর তীরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। নদীতে একটা নৌকো বয়ে চলেছে। নৌকোতে কেউ যেন এক মিনিট কালের ব্যবধানে দুটি

আলোর ঝলক পাঠালো। তোমাকে এই দুটি ঝলকের মধ্যবর্তী কাল পরিমাপ করতে হবে।

নৌকাটা যখন তোমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন একবার ঝলক হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তুমি ঘড়ি দেখলে। এর এক মিনিট পরে আর একবার ঝলক হলো। কিন্তু তোমার ঘড়িতে দেখবে, এই দুটি ঝলকের মধ্যবর্তী কাল হচ্ছে এক মিনিটের কিছু বেশি। এই বেশির কারণ কি? কারণ হচ্ছে, নৌকোটি স্থির নয়—চলমান। নৌকোটা যদি জলে স্থির থাকত, তা হলে যখন দুটি ঝলক সংঘটিত হলো তখন নৌকোতে বা তীরে ঠিক এক মিনিট ব্যবধানেই সেটা হত। কিন্তু যেহেতু নৌকোটা চলমান, সে কারণে দুটি ঝলকের মধ্যবর্তী কাল নৌকার লোকের চেয়ে তোমার কাছে বেশি মনে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাল হচ্ছে গতির ওপর নির্ভরশীল।

আমরা তা হলে দেখলুম, গতি হচ্ছে আপেক্ষিক অর্থাৎ অপর কোনো কিছুর সম্পর্কে গতি পরিমাপ করতে হবে। এখন, ডঃ আইনস্টাইন আমাদের বলছেন—মহাবিশ্বে একটিমাত্র গতি আছে যা আপেক্ষিক নয়। একটিমাত্র গতি আছে যা সর্বসময়ে এক—যা অপর কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করে না এবং অপর কোনো বস্তুর গতির সঙ্গে তুলনা করতে হয় না। এই গতি হচ্ছে আলোকের গতি। আলোকের গতি কখনই পরিবর্তিত হয় না। আলো সর্বত্রগামী—সূর্য থেকে পৃথিবীতে আমাদের কাছে, বৈদ্যুতিক বাতি থেকে যে বই আমরা পড়ছি তাতে কিংবা সুদূর নক্ষত্ররাজি থেকে পৃথিবীতে আলো গমন করতে পারে। আলোর গতি সর্বসময় অপরিবর্তনশীল। প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটার বেগে আলো ধাবিত হয়, কোনো যান বা রকেট এত দ্রুতবেগে কখনই ধাবিত হতে পারে না।

যে জটিল গণিতের ওপর ভিত্তি করে ডঃ আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন, সেই গণিতের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে আলোর গতির কখনই পরিবর্তন হয় না এবং পরিমাপকালে অন্য কোনো বস্তুর গতির সঙ্গে তার তুলনা করারও প্রয়োজন হয় না।

সপ্তম অধ্যায়

পেটেন্ট অফিস থেকে বক্তৃতাকক্ষে

বিজ্ঞানী আছেন দু'শ্রেণীর। একশ্রেণীর হচ্ছেন যাঁরা বীক্ষণাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং অপর শ্রেণীর হচ্ছেন যাঁরা শুধু কাগজ-কলম নিয়ে কাজ করেন। ডঃ আইনষ্টাইন ছিলেন শেষোক্ত শ্রেণীর। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে, তিনি নিজের হাতে কোনোদিন কোনো পরীক্ষা করেন নি। অপরাপর বিজ্ঞানীরা যে সব তথ্য পরীক্ষা করে আয়ত্ত করেছিলেন তা থেকেই আইনষ্টাইন তাঁর নতুন চিন্তাধারা গড়ে তোলেন। অথচ আইনষ্টাইন যখন পেটেন্ট অফিসে তাঁর ডেস্কে বসে নতুন চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সেসব বইপত্র নাগালের মধ্যে পেয়েও কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারেন নি। কেন পারেন নি? এ প্রশ্নের উত্তর —আইনষ্টাইনের ছিল সৃজনীপ্রতিভা, কিন্তু তাঁদের তা ছিল না। তোমার কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করতে শঙ্কিত হয়ো না এবং জানা তথ্য থেকে নতুন চিন্তাধারা গড়ে তুলতে ভয় পেয়ো না—এই মনোভাব নিয়েই আইনষ্টাইন গবেষণা কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন।

বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক উভয় বিষয়েই প্রচুর উপকরণ তিনি পাঠ করতেন। সে সময় আইনষ্টাইনকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। কিন্তু গবেষণা কাজে তাঁর আগ্রহ এত গভীর ছিল যে, সেটা তাঁর কাছে কোনো সময় বিরক্তিকর বোধ না হয়ে বরং উদ্দীপনাময় বলেই মনে হত।

আইনষ্টাইনের 'বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর বর্তুলাকার আকৃতি আবিষ্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এটি। আইনষ্টাইন এই তত্ত্বের গণিত নিয়ে যখন কাজ করেছিলেন, তখন তিনি বিপুল উত্তেজনা ও শিহরণ অনুভব করতেন। তাঁর চোখের সামনে কি এক নতুন চিন্তাধারা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে! তাঁর উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল এবং তিনি আরও বেশি পরিশ্রম করতে লাগলেন।

আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে তাঁর প্রথম গবেষণা নিবন্ধ যখন রচিত হয়, আইনষ্টাইন সেটি প্রকাশের জন্যে এক বৈজ্ঞানিক পত্রিকার (অ্যানালেন দের ফিজিক) সম্পাদকের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তার মূল্য যাচাইয়ের জন্যে সেটা তাঁর কাছে রেখে এলেন। সম্পাদকের অফিস থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করতে লাগলেন। এই গবেষণা নিবন্ধ রচনার জন্যে তাঁকে যে গভীর মনোনিবেশ ও কঠিন পরিশ্রম করতে হয় সেটা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যধিক হয়েছিল। আবাসস্থলে পৌঁছতে না পৌঁছতে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে প্রবেশ করতে না করতেই তিনি বিছানায় নির্জীব হয়ে পড়ে গেলেন।

তাঁর স্ত্রী ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার ডেকে পাঠাব কি?'

—'না না, কোনো দরকার নেই। এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

—'কিন্তু তুমি যে অসুস্থ।'

'—আমি শুধু শ্রান্ত'—এ কথা জোরের সঙ্গে বলেই তিনি চোখ বুঝলেন।

আইনষ্টাইন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পেটেন্ট অফিসে তাঁর ডেস্কে ফিরে যেতে দুটি সপ্তাহ কেটে গেল। এই অবসরে তিনি আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সম্পর্কিত কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বস্তুত, তিনি আরও দশ বছর ধরে আপেক্ষিকতাবাদ গড়ে তোলেন ও তার সম্প্রসারণ সাধন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, তাঁর গণিতের কোনো কোনো সূত্র প্রত্যক্ষভাবে পরমাণু বোমা উদ্ভাবনের পথ রচনা করেছে।

১৯০৫ সালে 'অ্যানালেন দের ফিজিক' পত্রিকায় তাঁর বিশেষ 'আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' প্রকাশিত হয়। বিশ্বের, বিশেষত জুরিখের, বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, আইনষ্টাইন একটা অসাধারণ কিছু করেছেন। কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে তিনি পরিচিত হতে হতে বহু বছর কেটে গেল। কারণ বিজ্ঞানীরা সচরাচর সাধারণ লোকের কাছে পরিচিত হন না এবং হলেও শীঘ্র বিখ্যাত হয়ে ওঠেন না। আইনষ্টাইনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তবে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরাজ্যে তাঁর তত্ত্বকথা দ্রুতই প্রচারিত হলো।

তাঁর প্রথম নিবন্ধ পড়ে বিজ্ঞানীরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে থাকবেন—'কে এই আইনষ্টাইন ?' কিংবা তাঁরা হয়তো আইন-ষ্টাইনের নিবন্ধ পড়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলে থাকবেন—'কে এই পাগলটা ?' আইনষ্টাইনের তত্ত্ব ভুল প্রমাণ করবার জন্যে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রবন্ধ রচনার চেষ্টাও করে থাকবেন।

কিন্তু সাধারণত প্রশ্ন উঠেছিল—কোথায় তিনি বাস করেন ? কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান কিনা ?—এই সব প্রশ্ন।

অল্পকালের মধ্যেই তাঁর অবস্থিতি প্রকাশ পেল যে, তিনি একটি পেটেণ্ট অফিসে একজন করণিকের কাজ করেন। সুইজারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীমহল, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা, এই ব্যাপারে একটু অপ্রস্তুত হলেন। তাঁরা কেউ কি ভেবেছিলেন—আইনষ্টাইন কেন পেটেণ্ট অফিসে কাজ নিয়েছিলেন ? আইনষ্টাইন তাঁদের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারেন ভেবে তাঁরা কতদূর শঙ্কিত হয়েছেন সেটা কি তাঁরা কেউ স্মরণ করেছিলেন ? হয়তো তাঁরা করেছিলেন, হয়তো বা করেন নি। সে যাই হোক না কেন, এটুকু বলা যায়—অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন তাঁর যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেতে শুরু করলেন।

এখন শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন উঠেছিল—সুইজারল্যাণ্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে একটি অধ্যাপক-পদ প্রদান করা যায় কিনা। এবং অল্পদিনের মধ্যেই জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপকপদ গ্রহণের জন্যে আইনষ্টাইনের কাছে আমন্ত্রণ এসেছিল।

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা যখন তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে এলেন, আইনষ্টাইন সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উত্তর দিলেন, 'না, ধন্যবাদ আপনাদের। আমার জুতা তৈরির কাজ আমি এখন ত্যাগ করতে পারি না।' এ কথা শুনে তাঁরা হতবাক হয়ে গেলেন!

তিনি তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, 'জুতা তৈরি'র কাজ তাঁর কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। কারণ এই কাজটি অতি সহজ এবং এই কাজ করতে করতে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে গবেষণা করবার প্রচুর সময় পাওয়া যায়। যদি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন তবে বক্তৃতা প্রস্তুত করার জন্যে তাঁকে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করতে হবে। তখন আপেক্ষিকতাবাদের কাজ করার সময় বিশেষ পাবেন না। যদি তাঁরা কিছু মনে না করেন, তবে তিনি পেটেণ্ট অফিসে থেকে যাওয়াই পছন্দ করেন।

—'কিন্তু আপনি পেটেণ্ট অফিসে থাকতে পারেন না। বিজ্ঞানী মহলেই আপনাকে আসন গ্রহণ করতে হবে।'

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের কাছে খ্যাতি কোনোদিনই বড়ো হয়ে দেখা দেয় নি। খ্যাতি অর্জনের কোনো আকাঙ্ক্ষাই ছিল না তাঁর। তিনি শুধু চাইতেন শান্তিতে থাকতে, যাতে নিজের পছন্দমতো কাজ করতে পারেন।

কিন্তু জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের পরামর্শে ও অনুরোধে আইনষ্টাইন শেষ পর্যন্ত বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ে অধ্যাপকের কাজ করতে স্বীকৃত হলেন। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে হলে এই অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন ছিল। কারণ সে সময় সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী এবং আরও কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের রীতি অনুযায়ী আইনষ্টাইন একেবারে সরাসরি অধ্যাপকের পদ পেতে পারতেন না। তাঁকে প্রথমে আংশিক সময়ে অধ্যাপক-রূপে কাজ করতে হবে এবং ছাত্রেরা তাঁর বক্তৃতার জন্যে যে অর্থ দেবে সেটাই হবে তাঁর একমাত্র বেতন। সেসময় শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে এই রীতিই প্রচলিত ছিল। কোনো ছাত্র কলেজ

থেকে স্নাতক হবার পর আংশিক সময়ে অধ্যাপকের কাজ পাবার জন্যে আবেদন করতে পারত। সে-কাজে সাফল্য অর্জন করলে একটা নির্দিষ্ট বেতনে তার অধ্যাপকপদ লাভের সম্ভাবনা হত।

কিন্তু আইনষ্টাইনের দিক থেকে বলতে গেলে তিনি পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপকের চেয়ে লেকচারারের পদই পছন্দ করতেন বেশি। কারণ তাতে তাঁর মূল্যবান সময় বেশি ব্যয়িত হত না।

তিনি পলিটেকনিক থেকে স্নাতক হয়ে যখন প্রথম বেরোন তখন তিনি শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। এবং যেহেতু শিক্ষকতা তাঁর অভিপ্রেত ছিল, উইণ্টারথার স্কুলে তিনি স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতায় একজন যোগ্য শিক্ষকরূপেই পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে অনেক কিছু ঘটে গেছে। এখন শিক্ষকতার চেয়ে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে তাব নিজের গবেষণায় তিনি রত থাকতে চাইতেন। অধ্যাপনায় তখন তাঁর মন না থাকার ফলে বার্নে তিনি যখন প্রথম অধ্যাপনা শুরু করলেন, তখন বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। যে স্বল্প কয়েকজন ছাত্র তাঁর অধ্যাপনা শুনতে আসত তাদের বিষয় চিন্তা না করে তাঁর সমস্ত হৃদয়মন তখন আপেক্ষিকতাবাদের উদ্দীপনাময় নতুন চিন্তাধারায় নিমগ্ন থাকত।

অবশ্য, জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা লেকচারার হিসাবে আইনষ্টাইনের কার্যধারা গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। কারণ তাঁরা পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপকরূপে আইনষ্টাইনকে নিয়োগের কথা চিন্তা করছিলেন। একদিন জুরিখ থেকে একজন অধ্যাপক বার্নে আইনষ্টাইনের অধ্যাপনা শুনতে এলেন।

তিনি এসে দেখলেন, আইনষ্টাইনের ক্লাশে শ্রোতা হচ্ছেন তাঁরই দু-তিন জন বন্ধু মাত্র এবং যে বিষয়টি তিনি পড়াচ্ছেন সেটা এত উচ্চস্তরের যে প্রাক্-স্নাতক ছাত্রদের মনে তা আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে নি। আইনষ্টাইন যখন একটানা ক্লান্তিকর বক্তৃতা করে যেতে লাগলেন, পরিদর্শক অধ্যাপকটি তা শুনে বিরক্তি ও হতাশা বোধ করলেন। বক্তৃতাশেষে আইনষ্টাইন যখন প্লাটফর্ম থেকে নেমে

এলেন, অধ্যাপকটি তখন তাঁর কাছে এসে বলেন, 'মিঃ আইনষ্টাইন. এক মুহূর্ত আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

—'বলুন, কি বলবেন।'

—'আপনার বক্তৃতার কথা বলছি। আপনার বক্তৃতা তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে নি। আমার মনে হয় সম্ভবত...'

আইনষ্টাইন সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট জবাব দিলেন, 'আমি তো জুরিখে অধ্যাপক পদ পাবার দাবি করি না।' এই কথা শোনার পর বহিরাগত অধ্যাপকটির আর কিছু বলবার রইল না।

এই সময় জুরিখে শিক্ষাবোর্ডের সদস্যদের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে একটি শূন্যপদ সম্পর্কে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলছিল সদস্যদের একটি বড় দল চাইছিলেন, এই পদে ফ্রেডরিক অ্যাডলারকে নিয়োগ করতে, অন্যান্যেরা ছিলেন আইনষ্টাইনের পক্ষে। মনে হলো অ্যাডলারই এই পদটি পাবেন। কিন্তু বিতর্কের কথা যখন অ্যাডলারের কানে এলো, তিনি নিজে বোর্ডের কাছে একটি পত্র লিখে পাঠালেন।

—'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে আইনষ্টাইনের মতো লোক পাওয়া যদি সম্ভব হয়, তা হলে আমাকে নিযুক্ত করা ভুল হবে। আমি অসংকোচে বলতে চাই—গবেষক পদার্থবিদ হিসাবে আমার যে যোগ্যতা, আইনষ্টাইনের প্রতিভার সঙ্গে তার ক্ষীণতম তুলনা করা চলে না।'

এর ফলে ১৯০৯ সালে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। তিনি যখন শুনলেন, তাঁর বন্ধু স্কুলের সহপাঠী অ্যাডলার তাঁর জন্যে পদ ছেড়ে দিয়েছেন, তখন তিনি বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছিলেন। এইরকম অন্তরঙ্গ বন্ধু পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়!

আইনষ্টাইন ও তাঁর স্ত্রী উভয়েই জুরিখ শহরে ফিরে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ জুরিখ ছিল তাঁদের কাছে স্বদেশভূমির মতো। এই শহরের পথে পথে ক্ষুধার্ত ক্লান্ত হয়ে

চাকরির সন্ধানে আইনষ্টাইন যে একদিন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, সে-সব দিনের কথা তাঁর কি তখন মনে পড়েছিল? না, তিনি তা করেন নি। দুঃখময় অতীতের কথা রোমন্থন করার মতো লোক তিনি ছিলেন না—যা অতীত তা অতীতই।

ইতিমধ্যে আইনষ্টাইনের দুটি পুত্র হয়েছে, তিনি কাজ পেয়েছেন এবং সঙ্গীতচর্চার সুযোগও এসেছে। ছাত্রাবস্থায় এই শহরে তাঁর যে-সব বন্ধু ছিলেন তাঁরা আবার বন্ধুত্ব স্থাপন করতে এলেন এবং বন্ধুদের আগমনে তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্য-আসর আবার শুরু হলো। প্রিয় বেহালাটিকে নিয়ে বাক্ ও বেটোফেনের সুরসাধনা আবার আরম্ভ হলো এবং বাজাতে বাজাতে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন।

এখন একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। কলেজের অধ্যাপক হিসাবে তিনি এখন সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছেন। এই ধরনের মর্যাদার অভিলাষী আইনষ্টাইন কোনদিনই ছিলেন না। সামাজিক মর্যাদা লাভ করা মানে বার্নে তিনি যেভাবে থাকতেন তার চেয়ে আরও বেশি খরচ-খরচা তাঁকে এখন করতে হবে। কিন্তু অধ্যাপক হিসাবে তিনি এখন যে বেতন পাচ্ছেন সেটা পেটেণ্ট অফিসে করণিকের চেয়ে বেশি নয়। সমস্যা তো সেজন্যেই।

আইনষ্টাইনের নিভৃতে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর শান্তি-প্রিয় উদাসীন প্রকৃতি সত্ত্বেও তাঁর খ্যাতি এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়লো। শীঘ্রই ইউরোপের অন্যতম সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ হল্যাণ্ডের লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর কাছে একটি আমন্ত্রণ এলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারেরা জানালেন, আইনষ্টাইন যদি হল্যাণ্ডে এসে বক্তৃতা দেন তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করবে।

এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আইনষ্টাইন হল্যাণ্ডে যাত্রা করলেন। সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে তিনি এক নতুন বন্ধুর সন্ধান পেলেন। এই বন্ধুটি খ্যাতনামা প্রবীণ বিজ্ঞানী হেণ্ড্রিক এ লরেনৎস। আনুমানিক ১৯০৮ সালে একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে লরেনৎসের

সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। লরেনৎস্ সে-সময়কার একজন বিশিষ্টতম বিজ্ঞানী।

আইনষ্টাইনের মতো তিনিও ছিলেন পদার্থবিদ্যার গণিততত্ত্ব-সন্ধানী। মহাকর্ষ ও অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশিত তাঁর বহু গবেষণাপত্র আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা সংক্রান্ত গবেষণার পথ রচনা করে।

লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দুই মহামনীষী তাঁদের চিন্তাধারা বিনিময়ের জন্যে পুনর্মিলিত হলেন। লরেনৎসের সঙ্গে ত্রিশ বছর বয়স্ক আইনষ্টাইনের এই সম্মিলন তাঁর জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করেছিল।

লরেনৎস্ জানতেন আইনষ্টাইনের তত্ত্বের গুরুত্ব কতখানি। তিনি একথাও স্থির নিশ্চিত জানতেন, আইনষ্টাইন বিজ্ঞানজগতে আরও অনেক কিছু দান করবেন। এজন্যে তিনি আইনষ্টাইনকে যথাসাধ্য সাহায্য ও উৎসাহ দান করতেন। তাঁদের পুনর্মিলনের কয়েক বছর পরে লরেনৎস্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে সমর্থন জানান। কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব তখনও পর্যন্ত প্রায় দুর্বোধ্য ছিল বলা চলে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বলা হয়—'আজব দেশে অ্যালিসের কৌতুকোদ্দীপক ভ্রমণের মতোই এক বিচিত্র তত্ত্বকে ডক্টর লরেনৎস্ সমর্থন জানিয়েছেন।'

সমগ্র ইউরোপ থেকে আইনষ্টাইনের প্রতি সম্মান বর্ষিত হতে লাগলো। একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বক্তৃতাদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন এবং কখনও কখনও এই আমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে তাঁকে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করতে হয়। লিডেন সমেত কয়েকটি বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে স্থায়ী পদ দিতে চাইলেন। কিন্তু আইনষ্টাইন পদগ্রহণে দ্বিধা বোধ করেন। তবে শেষকালে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করলেন।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা কিছুকাল যাবৎ আইনষ্টাইনের বিষয় চিন্তা করছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত পোলিশ বিজ্ঞানী মাদাম

মেরী কুরী (যিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে একযোগে রেডিয়াম আবিষ্কার করেন) পত্রযোগে তাঁদের কাছে অনুরোধ জানান—আইনষ্টাইনকে তাঁরা যেন একটি পদে নিয়োগ করেন। এই বিষয়ে যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো তাঁরা তখন আইনষ্টাইনকে উচ্চ বেতনে পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপকপদ দেবার প্রস্তাব করে পাঠালেন। এই পদনিয়োগ সম্বন্ধে একটিমাত্র বিষয়গত প্রশ্ন উঠেছিল—আইনষ্টাইন ইহুদী এবং ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি উদাসীন।

আইনষ্টাইনের বন্ধুরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন—'আবেদনপত্র পূরণ করবার সময় ধর্ম-সংক্রান্ত স্থানটি ফাঁকা না রেখে যে-কোন একটা ধর্মের নাম বসিয়ে দিও।'

পোল্যাণ্ডের সম্রাট ফ্রাঙ্ক জোশেফের অভিমত অনুযায়ী তখন এটাই অভিপ্রেত ছিল—যে কেউ প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করবেন তাঁকে কোনো ধর্মমতে বিশ্বাসী হতে হবে এবং সেকালে সম্রাটের অভিমত মানেই ছিল আইনের সামিল। তাই আইনষ্টাইন তাঁর আবেদনপত্র পূরণ করবার সময় 'ধর্ম' কথাটির ঘরে লিখে দিলেন 'মোসায়িক' এবং তারপর অন্যান্য প্রশ্ন পূরণ করলেন। বাহ্যত এতেই সমস্যার সমাধান হয়েছিল, কারণ সে সময় প্রাগে ইহুদীদের ধর্ম-বিশ্বাস 'মোসায়িক' বলেই উল্লেখিত হত। আইনষ্টাইনের নিয়োগে আর কোনো বাধা রইলো না।

ডঃ লরেনৎস্ কিন্তু আইনষ্টাইনের প্রাগে যাবার কথা শুনে নিরাশ হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, আইনষ্টাইন হল্যাণ্ডের লিডেনে এসে তাঁর সঙ্গে কাজ করুন। আইনষ্টাইন তাঁর বন্ধু লরেনৎসের সঙ্গে কাজ করতে খুবই উৎসুক ছিলেন। কিন্তু স্ত্রী ও দুটি ছেলের ভরণপোষণের কথা চিন্তা করে তিনি দেখেছিলেন —প্রাগে অধিকতর বেতনে তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে এতকালের অনাস্বাদিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার সন্ধান দিতে পারবেন।

এইভাবে জুরিখে তিনটি পাঠবর্ষে শিক্ষকতা করার পর আইনষ্টাইন তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে প্রাগে বাস করার জন্যে চলে এলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে রাজধানী প্রাগ-সমেত 'চেকোস্লোভাকিয়া' নামে কোনো স্বতন্ত্র দেশ ছিল না। সে সময় প্রাগ ইউরোপের যে অংশে অবস্থিত ছিল সেটা অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী নামে একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জার্মানীর সীমান্ত থেকে অল্প দূরে উত্তরাঞ্চলে প্রাগ অবস্থিত।

ইউরোপের সর্বাপেক্ষা সুন্দর শহরগুলির মধ্যে প্রাগ অন্যতম। এই শহরে গথিক স্থাপত্য-শোভিত মিনার ও প্রাসাদের চূড়া গগন স্পর্শ করেছে এবং শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে সুবিস্তীর্ণ শান্ত নদী 'ভলটাভা'। রাজা ওয়েনসেসলাসের একটি মূর্তি প্রাগের একটি উদ্যানে বিরাজমান আছে। আনুমানিক ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাচীন চেক জাতির নেতৃত্ব করেছিলেন। ইউরোপের অন্যান্য অনেক শহরের মত প্রাগে প্রাচীন ও নবীন দুটি অঞ্চল আছে। প্রাচীন অঞ্চল সত্যসত্যই প্রাচীন এবং এই অঞ্চলের সরু আঁকাবাঁকা রাস্তায় বিদেশী পথিকরা সহজেই হারিয়ে যাবেন।

আইনষ্টাইন যখন প্রাগের রাস্তায় ভ্রমণ করতেন, তখন জার্মান-চেক মন কষাকষির আভাস পেতেন। চেক ও জার্মানদের মধ্যে একটা পারস্পরিক ঘৃণার ভাব তখন পরিলক্ষিত হত। এজন্যে আপেক্ষিকতাবাদের একটা নতুন বিষয়ে চিন্তা করার সময়েও তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত। তিনি ও তাঁর পরিবার এখন সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছিলেন, কারণ এই প্রথম তাঁর আয়ের সচ্ছলতা হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র ইউরোপের আকাশে তখন যুদ্ধের কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করেছে। যদিও আইনষ্টাইন রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না, কিন্তু প্রাগে বেশ কিছুদিন বাস করতে না করতে রাজনীতি তাঁর সঙ্কট সৃষ্টি করতে শুরু করলো।

অষ্টম অধ্যায়

ইতিহাস এগিয়ে চলে

১৯১১ সালে আইনষ্টাইন যখন প্রাগে শিক্ষকতা ও গবেষণা করতে যান, তখন বিশ্বে কি ঘটছিল?

স্বৈরাচারী বিসমার্কের মৃত্যুর পর ১৮৯০ সাল থেকে দ্বিতীয় উইলিয়ম জার্মানীর শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় উইলিয়ম কাইজার প্রায় বিসমার্কের সমপর্যায়ের লোক ছিলেন। জার্মানী ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং সীমান্ত সম্প্রসারণ ও সৈন্য সমাবেশ করে চলছিল। জার্মানীর দক্ষিণ সীমানায় অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী (যেখানে আইনষ্টাইন কাজ করছিলেন) তখন জার্মানীর সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল।

আইনষ্টাইন যখন তাঁর শান্ত কক্ষে নিভৃতে একাকী নিজের কাজে মনোনিবেশ করতেন তখনও তাঁর মনে একটি বেদনা জেগে উঠত। তিনি জেনেছিলেন, সারা বিশ্বে মানবাত্মা নিগৃহীত হচ্ছে এবং যুদ্ধ ও রক্তপাত চলছে।

গ্রীসের ঠিক উত্তরে ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্বে বল্কান অঞ্চলে তখন একটি যুদ্ধ চলছিল। ১৯১১ সালে যখন বুলগেরিয়ার ক্ষুদ্র বল্কান দেশটি তুরস্কের অধীনতা পাশ থেকে মুক্তি ঘোষণা করে, তখনই এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এর আগে তুরস্ক ইউরোপের অনেক অংশ দখল করে নিয়েছিল। তুরস্ক এবং বল্কান অঞ্চলগুলির মধ্যে এই যুদ্ধ বেশিদিন তাদের নিজস্ব ব্যাপার হয়ে থাকে নি। কারণ

অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী একপক্ষে এবং রাশিয়া অপর পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধের ফল হলো এই যে, তুরস্ক পরাজিত হয়ে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হলো।

বল্কান যুদ্ধ চলতে দেখে সারা বিশ্বের মানুষ শঙ্কিত হয়ে উঠলো। যাঁরা শান্তি স্থাপনার চেষ্টা করলেন তাঁরা ব্যর্থ হলেন। পৃথিবীর সর্বত্র চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আশঙ্কা করলেন এই ধরনের ছোট ছোট যুদ্ধ থেকে একদিন বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। এবং তিন বছর পরে ঠিক তা-ই ঘটলো।

আইনষ্টাইন প্রাগে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে স্থানীয় একটি রীতির কথা জানিয়ে দিলেন। তাঁকে বলা হলো, 'তুমি এখানে নবাগত বলে ফ্যাকাল্টির প্রত্যেক সদস্যের বাড়িতে তোমাকে একবার সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে হবে। এখানকার রীতি এই।'

আইনষ্টাইন এ প্রস্তাবে রাজী হলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে এভাবে পরিচিত হওয়া তাঁর ভালো বলেই মনে হলো। তিনি ভাবলেন—এর দ্বারা এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। প্রাগের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎকার ঠিক করে নিতে পারবেন এবং তার ফলে একই সময়ে সমস্ত শহরটা তাঁর দেখা হয়ে যাবে। শহরের আকর্ষণীয় অংশে যাঁরা বাস করতেন, তাঁরাই প্রথমে আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের গৌরব অর্জন করলেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের তালিকা ছিল দীর্ঘ এবং ফ্যাকাল্টির প্রত্যেক সদস্য ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সৌজন্য প্রকাশে বহু সময় অতিবাহিত হত। যে মূল্যবান সময়টা তিনি তাঁর গণিতের কাজে সদ্ব্যবহার করতে পারতেন সেটা অনর্থক ব্যায়ত হত সৌজন্যমূলক-আলাপ-আলোচনায়।

তাই সাক্ষাৎকারের তালিকা সম্পূর্ণ হবার আগেই আইনষ্টাইন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, তাঁর পক্ষে আর সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করা সম্ভব হবে না। যাঁদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন নি, তাঁরা

ক্ষুণ্ণ হলেন এতে। কিন্তু যখন তাঁদের বলা হলো আইনষ্টাইন তথাকথিত সামাজিকতায় অভ্যস্ত নন এবং প্রভূত কাজের চাপেই তিনি সাক্ষাৎকারের তালিকা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি, তখন তাঁরা ক্ষোভ সংবরণ করলেন। আইনষ্টাইন যে ইচ্ছা করে তাঁদের উপেক্ষা করেন নি সেটা তাঁরা এখন উপলব্ধি করতে পারলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনষ্টাইনের সহকর্মীরা অবিলম্বে তাঁকে ভালবেসে ফেললেন। তাঁরা তাঁকে পছন্দ করতেন এই কারণে যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল, সদালাপী ও বন্ধুত্বপ্রিয়। কোনো কিছু রসিকতার কথা শুনলে তিনি যেভাবে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন সেটা তাঁদের খুব ভালো লাগতো। সর্বোপরি আইনষ্টাইন একেবারে খাটি মানুষ ছিলেন বলেই তাঁরা তাঁকে এত ভালবাসতেন।

আইনষ্টাইন কালের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তিনি লক্ষ্য করলেন, চারিদিকে সৈন্যসমাবেশ চলেছে, চেক-জার্মানদের মধ্যে বিদ্বেষ বেড়ে চলেছে এবং জার্মানী থেকে গুজব প্রচারিত হচ্ছে যে সেদেশের একদল লোক শ্রেষ্ঠ জাতির একটা জিগীর তুলছে। তিনি তাঁর বন্ধু অ্যাডলারের উপদেশ স্মরণ করলেন।

আইনষ্টাইন বললেন, 'যুদ্ধমাত্রই অন্যায়। সৈন্যসমাবেশের মধ্য দিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না।'

সৌম্য বিজ্ঞানী ও তাঁর কয়েকজন শান্তিবাদী বন্ধু যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারের চেষ্টা করলেন। তাঁরা যুদ্ধবিরোধী পত্র লিখলেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু স্বল্প কয়েকজন লোক কেবল স্বল্প কয়েকটি পত্র লিখতে পারেন। শান্তিবাদীদের বক্তৃতার প্রতি কর্ণপাত করবার মত সময় যুদ্ধলিপ্সু রাষ্ট্রগুলির তখন ছিল না।

যাঁরা কর্ণপাত করলেন তাঁদের কাছেই আইনষ্টাইন প্রচার করতে লাগলেন, যুদ্ধ অন্যায়, যুদ্ধের দ্বারা কোনো পক্ষের মঙ্গল হয় না এবং যে দেশ যুদ্ধ বাঁধায় সে নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আইনষ্টাইনের কথায় কর্ণপাত করলেন কেবল তাঁর বন্ধুরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক লোক। ১৯১১ সালে আইনষ্টাইন

কেবল বিজ্ঞানীমহলে পরিচিত ছিলেন এবং তখনও পর্যন্ত সাধারণ লোকের মধ্যে তাঁর খ্যাতি প্রচারিত হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই সাধারণ্যে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার আগে বিশ্বের কল-কোলাহলের মধ্যে তাঁর শান্তিবাদী কণ্ঠস্বর ডুবে যায়।

কিন্তু যুদ্ধ প্রতিরোধের চেষ্টায় এত সময় ব্যয়িত হলেও আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক কাজ অব্যাহত ছিল। তাঁর হৃদয় যখন মানুষের সুখশান্তির জন্যে কাজ করত, একই সময়ে তাঁর মন কাজ করত বিজ্ঞানের জন্যে। আপেক্ষিকতাবাদের গণিত নিয়ে তিনি তখনও পরিশ্রম করছিলেন। এক একটি ধারণা সম্পর্কে তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমন কি মাসব্যাপী চিন্তা কবতেন। তারপর হয়তো দেখা যেত কোথায় একটু ভুল রয়ে গেছে। তার ফলে গোড়া থেকে আবার সব কিছু সতর্কতা ও যত্ন সহকারে করতে হত। প্রাগে কাজ করার সময় তিনি মহাকর্ষ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সম্পূর্ণ করেন। এই তত্ত্ব আট বছর পরে অর্থাৎ ১৯১৯ সালের ১৯ মে তারিখে বৈজ্ঞানিক জগতের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পূর্ণসূর্যগ্রহণ সম্পর্কে একটি ভবিষ্যৎবাণী করেছিল।

প্রাগে থাকাকালেই আইনষ্টাইন ইউরোপের ইহুদী সমস্যার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন দুইভাবে। প্রথমত, তাঁর সহকারী ছিল জার্মানীর বোহেমিয়া অঞ্চল থেকে আগত একজন ইহুদী যুবক। যে ব্যাভেরিয়া থেকে আইনষ্টাইন এসেছিলেন সেই রাজ্যের ঠিক পূর্বদিকে বোহেমিয়া অবস্থিত। আইনষ্টাইন এবং সেই যুবকটি মধ্য ইউরোপে ইহুদীদের সংঘর্ষ ও সঙ্কট সম্বন্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন। দ্বিতীয়ত, প্রাগে তিনি জায়োনিষ্ট আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। জাযোনিষ্টরা আইনষ্টাইনকে তাদের দলে টানার সবিশেষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেসময় আইনষ্টাইন তাদের যুক্তিতে বিশেষ প্রভাবান্বিত হন নি। ইহুদীরা একটি পৃথক জাতি—তাদের এ যুক্তি তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তখনকার দিনে জায়োনিজম্ আজকের মতো রাজনীতিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি।

তখন জায়োনিষ্টরা ইহুদীদের জন্যে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেয়ে ইহুদীয় কৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করত বেশি।

যুবা বয়সে আইনষ্টাইনের মাথায় যখন আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত অভিনব চিন্তাধারা ঘুরছিল, তখন বার্নে শিক্ষকতার কাজে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। কারণ তখন শিক্ষকতা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল খুবই কম এবং শিক্ষকতার জন্য আধাআধিও চেষ্টা তিনি করতেন না। কিন্তু প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদ তিনি যখন গ্রহণ করলেন, তখন অভিজ্ঞতা ও কাজের প্রতি ভালবাসা দুইই তিনি অর্জন করেছেন এবং সে-কারণে অল্পকালের মধ্যেই একজন যোগ্য শিক্ষকরূপে পরিগণিত হলেন। যারা শিখতে চাইত তাদের সানন্দে তিনি সাহায্য করতেন এবং ছাত্রদের কাছে বিষয়-বস্তুটা পরিষ্কারভাবে যুক্তি দিয়ে তুলে ধরতেন। সর্বোপরি, তাঁর ছিল অপূর্ব রসিকতাবোধ। তিনি মনে করতেন, কোনো বিষয়ই এত গুরুগম্ভীর নয় যে একটু-আধটু রসিকতা বা ঠাট্টা করা যায় না। নিজের কাজ সম্বন্ধে ছাত্রদের আস্থা অর্জনের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। যে কোনো সময়ে তিনি নির্ধারিত পাঠ্যসূচী সরিয়ে রেখে ছাত্রদের তাঁর নিজের সমস্যা বিষয়ক গবেষণা সম্বন্ধে জানাতে পারতেন। এইভাবে তিনি ছাত্রদের তাঁর কাজের অংশীদার ও সহকর্মী করে নিয়েছিলেন।

প্রাগে তিনি যখন প্রথম শিক্ষকতা শুরু করেন তখন ছাত্রদের বলতেন, 'যদি তোমাদের কোনো সমস্যা উপস্থিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে চলে এসো। এতে আমার কাজের কোনো অসুবিধা হবে না। কারণ যে কোনো মুহূর্তে আমি নিজের কাজ বন্ধ রেখে অন্য কাজ করতে পারি এবং সে কাজটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজের কাজ আরম্ভ করতে পারি।'

আইনষ্টাইন যখন আপেক্ষিকতা সংক্রান্ত কাজ করছিলেন তখন বিশ্রামের অবসর খুব কমই পেতেন। সে সময়টি ছিল তাঁর সৃজনীপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে উর্বর কাল। প্রাগে থাকা-

কালে দৈনন্দিন অধ্যাপনা, ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা ও নিজের গবেষণার কাজ শেষ করার পর দিনের বেশি সময় আর অবশিষ্ট থাকত না।

মাঝে মাঝে তিনি শহরের রাস্তায় একটা লম্বা পাড়ি দিতেন। শহরের একদিকে গেলে দেখতে পেতেন ইহুদীপাড়া ও প্রাগের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ইহুদী সমাধিক্ষেত্র। তিনি যখন হিব্রু ভাষায় লিখিত হাজার হাজার স্মৃতিপ্রস্তরের দিকে (তাদের মধ্যে কোনো কোনোটা হয়তো সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো) তাকাতেন, তখন তাঁর মনে পড়ত তিনিও একজন ইহুদী এবং বিসমার্কের শাসন-কালের মতো এখন আবার ইউরোপে ইহুদীবিদ্বেষ প্রকট হয়ে উঠছে।

শহরের অন্যদিকে গেলে তিনি দেখতেন চেকদের প্রতি অষ্ট্রিয়ানদের ঘৃণা এবং স্বাধীনতা অর্জনকল্পে বিপ্লবের পরিকল্পনার জন্যে চেকদের চোখে বিদ্বেষের আগুন। প্রাগের প্রাচীন শহরাঞ্চলের দিকে গেলে দেখতেন চেকরা বর্ণাঢ্য জাতীয় পোশাক পরে নৃত্য করছে এবং সেই সঙ্গে শুনতে পেতেন তাদের প্রাচীন লোকসঙ্গীত।

বিষণ্ণ ও শান্তি-অভিলাষী হয়ে তিনি বাড়িতে ফিরে এসে তাঁর প্রিয় বেহালাটি তুলে নিতেন। সুরসাধনার মধ্যেই তিনি পেতেন শান্তির পরম আশ্রয়।

কিন্তু আইনষ্টাইনের পক্ষে শান্তি ও শান্ত পরিবেশ খুঁজে পাওয়া ক্রমশই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। যতই তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হতে লাগলো, ততই তিনি বিজ্ঞানীমহলে অধিকতর খ্যাতি অর্জন করতে লাগলেন এবং অধিকসংখ্যক বিজ্ঞানী তাঁর তত্ত্বকে সঠিক বলে স্বীকার করতে লাগলেন। এই শান্ত ছোট-খাটো ব্যক্তিটি তাঁর কাগজকলম নিয়ে ইতিহাসের ধারা এমন গভীরভাবে পরিবর্তন করে দিচ্ছিলেন যা বিসমার্ক ও কাইজার যুক্তভাবেও করতে পারেন নি।

যতই তাঁর খ্যাতি ও প্রভাব বিস্তৃত হতে লাগলো, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তাদের মধ্যে পাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলো।

সর্বশেষে জুরিখের সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক—যেখান থেকে তিনি স্নাতক হয়েছিলেন, তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপকপদ গ্রহণের জন্যে তাঁরা প্রস্তাব পাঠালেন এবং আইনষ্টাইন এই প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী জুরিখে ফিরে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ জুরিখ ছিল তাঁদের কাছে স্বদেশভূমির মতো—ছাত্রাবস্থায় সেখানে তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁদের বহু বন্ধু-বান্ধবও ছিল।

অনেক সময় লোকেরা না ভেবে-চিন্তে কথা বলে। সেইভাবেই একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আইনষ্টাইন পরিবার অসুখী হয়েই প্রাগ থেকে চলে যাচ্ছেন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্তৃপক্ষের ইহুদীবিরোধী আচরণের জন্যেই অধ্যাপক আইনষ্টাইন পদত্যাগ করেছেন। শুধুমাত্র ইহুদী হওয়ার অজুহাতে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় কি এমন একজন মূল্যবান ব্যক্তিকে হারাবেন?

এ গুজবের কথা শুনে স্বয়ং আইনষ্টাইনের চেয়ে বেশি আশ্চর্যান্বিত আর কেউ হন নি।

'এ সমস্তই বাজে কথা'—আইনষ্টাইন ঘোষণা করলেন। সংশ্লিষ্ট অষ্ট্রিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি একটি পত্র লিখে পাঠালেন। তিনি তাঁদের আশ্বাস দিয়ে জানালেন, 'মাত্র এক বছরের জন্যে হলেও প্রাগে তাঁর স্থিতি পরম সুখকর হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জুরিখে ফিরে যেতে চান।'

তাঁরা যখন জিনিসপত্র বেঁধে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন আর একটি সমস্যা দেখা দিল। সে সমস্যাটি হচ্ছে একটি পোশাকঘটিত। অষ্ট্রিয়ান অধ্যাপকদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে পরিধানের জন্যে একরকম বিচিত্র পোশাক তৈরি করাতে হয়—পালক-লাগানো তিন শৃঙ্গযুক্ত টুপি, সোনালী বেণী ও একটি তরবারি। বেশ ব্যয়বহুল এই পোশাক। এখন এই বিচিত্র পোশাকটি নিয়ে আইনষ্টাইন কি করবেন? তিনি শুধু একবার

মাত্র এই পোশাকটি পরেছিলেন। এখন তবে অন্য কেউ হয়তো এটা ব্যবহার করবে।

তাঁর আট বছরের ছেলে বললে : 'বাবা, এই পোশাকটা কাউকে দেবার আগে তুমি একবার এটা পরে আমাকে সঙ্গে করে জুরিখের রাস্তায় ঘুরিয়ে এনো।'

ছেলের কথায় আইনষ্টাইন হেসে রাজী হলেন। বললেন : 'এটা পরতে আমার কিছু মনে হবে না। বড় জোর লোকেরা ভাববে. আমি একজন ব্রেজিলিয়ান অ্যাডমিরল।'

নবম অধ্যায়

নতুন সুখ

যদিও প্রাগের মতো একটি সুন্দর শহর ছেড়ে যেতে আইনষ্টাইন মনে মনে বেদনা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু জুরিখ শহরটিকে তিনি ভালবাসতেন এবং সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকত্বও গ্রহণ করেছিলেন। যে জুরিখে তিনি ফিরে এলেন, সেখানে এবার আগের চেয়ে আরও কিছু সুখদায়ক পেলেন—হৃদয়ের পরিবর্তন এবং শ্রদ্ধার ডালি। এখন কি তাঁকে দুটি মাত্র ছাত্র ও বহুসংখ্যক খালি চেয়ারের সামনে বক্তব্য পেশ করতে হবে? না, তা আর একেবারেই নয়। এবার অগণিত ছাত্র প্রাজ্ঞ আইনষ্টাইনের বক্তৃতা শোনার জন্যে হলঘরে ভিড় করলো।

আইনষ্টাইন রসজ্ঞ লোক। তাই পলিটেকনিকে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অর্পিত হতে দেখে তিনি কৌতুক বোধ করেছিলেন। আত্মগর্বিত ও উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন শুভ্রকেশ ব্যক্তিরা কোমর ভেঙে এই যুবকটিকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। কারণ তিনি এখন নিজের কৃতিত্বে তাঁদের সকলকে অতিক্রম করে গেছেন।

তাঁরা কি তখন স্মরণ করেছিলেন—এই আইনষ্টাইনই একদিন এই স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার জন্যে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেই যুবকই আজ স্কুলের সর্বোচ্চ সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত? আইন-ষ্টাইনের কাছে এসবের কোন গুরুত্ব ছিল না। তাঁর কাছে সম্মানের

যেমন কোনো বিশেষ মূল্য ছিল না, অতীতেরও তেমনি কোনো গুরুত্ব ছিল না। একমাত্র জিনিস যার ওপর তিনি গুরুত্ব দিতেন সেটা হচ্ছে তাঁর গণিতচর্চা। কারণ তখনও তিনি আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন এবং অনুভব করতেন প্রতিদিনের কিছুটা সময় অন্তত সে কাজে তাকে অবশ্যই ব্যয় করতে হবে।

পলিটেকনিকে শিক্ষকগোষ্ঠীর সদস্য থাকাকালীন দু-বছর নিজের ইচ্ছামাফিক কাজ করার জন্যে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন অধ্যাপক— তার মানে তাঁকে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হত। তিনি যখন বক্তৃতা প্রস্তুতের জন্যে মূল্যবান সময় ব্যয় করতেন, তখন তাঁর মনে একটা অভিলাষ জাগতো—এমন পদ যদি পান যাতে নিজের কাজে বেশি সময় দিতে পারবেন। আচম্বিতে এক জাদুকর কোথা থেকে আবির্ভূত হয়ে জাদুদণ্ড তুলে যেন বললে, 'এই নাও, যে অবসর তুমি চাইছিলে'—ঠিক তেমনিভাবে আইনস্টাইনের কাছে এক অভাবনীয় সুযোগ এসে উপস্থিত হলো।

এই সুযোগ হচ্ছে বার্লিনের প্রুশিয়ান আকাডেমি অফ সায়েন্স-এর কাছ থেকে এক আমন্ত্রণ। আমন্ত্রণ এলো—'বার্লিনে এসে শুধু গবেষণা কর, কোনো শিক্ষকতা করতে হবে না, বক্তৃতা প্রস্তুতের জন্যে মূল্যবান সময়ও ব্যয় করতে হবে না।'

কিভাবে এই সুযোগ এলো? বস্তুত, ১৯১১ সালের কিছু আগে আইনস্টাইন যখন প্রাগে শিক্ষকতা করছিলেন তখন বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্-এ সলভে কংগ্রেস নামে একটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। সল্‌ভে নামে একজন ধনাঢ্য বেলজিয়ান এই সম্মেলনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করায় তাঁর নামেই এই নামকরণ হয়েছিল। এই সম্মেলনে আইনস্টাইন অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। এই সল্‌ভে কংগ্রেসেই তিনি পোল্যাণ্ডের মাদাম কুরী, ফ্রান্সের হেনরী পোঁয়াকার ও পল লাঁজভ্যাঁ, ইংল্যাণ্ডের স্যার আর্নেস্ট রাদারফোর্ড এবং জার্মানীর মাক্স প্লাঙ্ক ও ওয়াল্টার নের্নস্টের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার

প্রথম সুযোগ পান। এঁরাই ছিলেন তৎকালীন বিজ্ঞান-জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

আইনষ্টাইন সম্পর্কে তাঁদের কি ধারণা হয়েছিল? আইনষ্টাইনের সঙ্গে যিনি একবার মিলিত হয়েছেন, তিনি কখনই তাঁকে ভুলতে পারেন নি। সম্মেলনের পূর্বাহ্নেই মাক্স প্লাঙ্ক বলেছিলেন: 'আইনষ্টাইনের তত্ত্ব যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, (যা হবে বলেই আমি মনে করি) তা হলে তিনি বিংশ শতাব্দীর কোপারনিকাস-রূপে বিবেচিত হবেন (ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী কোপারনিকাস এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র পৃথিবী নয়, পরন্তু পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয়)।

দীর্ঘদেহী প্রুশিয়ান বিজ্ঞানী ডঃ প্লাঙ্ক বিশেষ করে আইনষ্টাইনকে ভোলেন নি। জার্মানীর কর্ণধার কাইজার যখন স্থির করলেন যে, জার্মানীরও নিজস্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার থাকবে, তখন ডঃ প্লাঙ্ক ও তাঁর সহযোগী ডঃ নের্নষ্ট আইনষ্টাইনের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে জুরিখে গেলেন।

তাঁরা আইনষ্টাইনকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন—'আপনি বার্লিনে এসে আমাদের সঙ্গে কাজ করুন। কাইজার ভিলহেম ইনষ্টিট্যুট নামে অভিহিত এই নতুন গবেষণাগারের আপনিই হবেন অধিকর্তা এবং রয়েল প্রুশিয়ান আকাডেমি অফ সায়েন্স-এর সদস্যরূপেও আপনাকে গ্রহণ করা হবে। আপনি ইচ্ছা না করলে কোন অধ্যাপনার কাজ আপনাকে করতে হবে না—আপনি শুধু গবেষণা করবেন।'

এই প্রস্তাবের কথা চিন্তা করে আইনষ্টাইন পরম উদ্দীপনা বোধ করেছিলেন। কিন্তু যে মহূর্তে জার্মানীর কথা মনে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা কমে এলো। তাঁর মনে পড়লো ছেলেবেলার কথা, নির্মম স্কুলের কথা, জার্মান সৈন্যদল কর্তৃক তার জন্মভূমি ক্ষুদ্র দেশ ব্যাভেরিয়া দখলের কথা। জার্মান সেনাদলে যোগ দিতে হবে ভেবে তাঁর মনে একদিন যে ভীতি

জেগেছিল সে-কথাও মনে পড়লো। এখনও ৩৩ বছর বয়সে জার্মান সেনাদলে যোগদানের পক্ষে তাঁর বয়স কমই ছিল। যুদ্ধ বাঁধবার সময় তিনি যদি জার্মানীতে থাকেন, তা হলে কি হবে? একজন সুইস ইহুদী হয়েও তিনি জার্মানী যেতে সাহসী হতে পারেন কি? এসব ভেবে তাঁর জার্মানী যাবার উৎসাহ আরও কমে এলো এবং তিনি বিষণ্ণ বোধ করতে লাগলেন।

—'ভদ্রমহোদয়গণ, যদি আমি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক থাকতে পারি তা হলে আপনাদের সঙ্গে কাজ করার জন্যে জার্মানিতে যেতে পারলে সুখী হব।'

আশ্চর্যের বিষয়, দাম্ভিক একরোখা জার্মানরা এই ব্যবস্থায় সম্মত হলেন। সমস্ত ব্যাপারটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় আইনষ্টাইন সুখী হলেন। আপেক্ষিকতাবাদের কাজে তিনি এখন অনেক সময় ব্যয় করতে পারবেন ভেবে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না।

১৯১৪ সালে বসন্তকালের প্রারম্ভে আইনষ্টাইন বার্লিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

শ্রীমতী আইনষ্টাইন এবার তাঁর স্বামীর সঙ্গে যান নি। তাঁদের মধ্যে কি মনোমালিন্য হয়েছিল তা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁদের পারস্পরিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করে তাঁরা বিবাহবিচ্ছেদে সম্মত হয়েছিলেন। অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন তাঁর স্ত্রী ও দুটি সন্তানকে ছেড়ে একাই বার্লিনে চলে গেলেন। পরে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়।

ট্রেন থেকে বার্লিনে নেমে, শহরের চেহারা দেখে আইনষ্টাইন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ইউরোপের অন্য যেসব শহরে তিনি বাস করে এসেছেন তাদের সঙ্গে বার্লিনের চেহারার কোনো মিল নেই। এ বার্লিন সম্পূর্ণ নতুন—তার রাস্তাঘাট একটানা সোজা ও পরিকল্পনামাফিক তৈরি। প্রাগ বা মিলানের মতো বার্লিনে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় না। বার্লিনের প্রায় কেন্দ্রভাগে 'প্রাচীন' অঞ্চল আছে বটে এবং সে-অঞ্চলের রাস্তাঘাট

মধ্যযুগের মতো সংকীর্ণ, তবে সামগ্রিক বিচারে বার্লিনের ঘরবাড়ি আধুনিক ও আরামদায়ক।

শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে একটি সুন্দর প্রশস্ত রাজপথ চলে গেছে এবং তার দুধারে সারি সারি লিণ্ডেন গাছ। জার্মান ভাষায় এই রাজপথটি 'উন্টার ডেন লিণ্ডেন' (অর্থাৎ লিণ্ডেন গাছের তলায়) নামে পরিচিত। এই রাস্তাটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত—পশ্চিমে ব্র্যাণ্ডেন-বার্গ তোরণ থেকে শহরের শেষ পূর্ব সীমানায় রাজপ্রাসাদের সোপান পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসীরা এই পথের শেষ গাছটি পর্যন্ত কেটে ফেলে এই উদ্যানবীথির সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়।

এই রাজপ্রাসাদে একদা প্রথম উইলিয়ম বাস করেছিলেন এবং তিনিই বিসমার্ককে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। বর্তমানে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়ম এই প্রাসাদে বাস করছেন। আইনষ্টাইন ভ্রমণের সময় রাজপ্রাসাদের দিকে তাকাতেন না। 'উন্টার ডেন লিণ্ডেন' রাজপথ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে তিনি দোকানঘর, অট্টালিকা ও রেস্টুরেন্টের দিকে তাকাতেন, কিংবা কখনও বা হয়তো, ব্র্যাণ্ডেন-বার্গ তোরণের ভেতর দিয়ে সুপ্রশস্ত রাজোদ্যান পর্যন্ত চলে যেতেন। এ সবই তাঁর ভালো লাগত। কিন্তু জার্মান সেনারা যখন সূর্যের আলোয় চোখ-ধাঁধানো ধাতব শিরস্ত্রাণ পরে রাস্তা দিয়ে কুচকাওয়াজ করে যেত, তা দেখে ছোটবেলার মতো এখনও তাঁর ভাল লাগত না। সেনাদল ও কামান-বন্দুকের দৃশ্য তাঁর মনে সব সময়ই ভীতির সঞ্চার করত। যুদ্ধ ও দুঃখদুর্দশা ছাড়া আর কিই বা এই জিনিসগুলি সৃষ্টি করতে পারে?

বার্লিনে আইনষ্টাইন সম্পূর্ণ একাকী বা নির্বান্ধব হয়ে ছিলেন না। সেখানে তাঁর আত্মীয়স্বজন বাস করতেন এবং তাঁদের সাহায্যে একটি বাসা খুঁজে পেতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। সেখানে তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সহজ সরল। প্রুশিয়ান আকাডেমিতে কাজ করতেন, নিজের বাসায় থাকতেন আর প্রতিদিন কাকার বাসায়

গিয়ে আহার করে আসতেন। ১৯১৪ সালে জার্মানীতে যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয় এবং খাদ্যের অনটন একটু একটু অনুভূত হতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে বার্লিন শহরে আইনষ্টাইনের অনেক অবস্থাপন্ন আত্মীয়স্বজন ছিলেন। সেজন্যে তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হয় নি। আইনষ্টাইনের কাছে সাংসারিক সমস্যায় মাথা ঘামাবার মতো বিরক্তিকর ব্যাপার আর কিছুই ছিল না।

বার্লিনে তাঁর আত্মীয়স্বজনের একটি ব্যাপারে আইনষ্টাইন পরম কৌতুক বোধ করেছিলেন। এক সময় আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে পরিবারের কলঙ্কস্বরূপ মনে করতেন—যে বালক স্কুলের পড়াশোনার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না, যে যুবক শুধু স্বপ্নবিলাসী, যে বিয়ে করে নিজের পরিবারের ঠিকমতো ভরণপোষণের মত উপার্জন করতে পারে না। কিন্তু এখন সে খ্যাতি অর্জন করতে থাকায় এবং উপযুক্ত বয়সের আগেই প্রুশিয়ান আকাদেমির সম্মানিত পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁরা গর্ব অনুভব করতে থাকেন। তাঁরা তাঁকে নিজেদের বাড়িতে ডেকে অন্যান্য অতিথির কাছে গর্বের সঙ্গে দেখাতেন এবং তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় নিজেদের গর্বিত মনে করতেন। কিন্তু আইনষ্টাইন তাঁর স্বাভাবিক মৃদু হাসির সঙ্গে এ সমস্ত এড়িয়ে যেতেন।

আইনষ্টাইনের কাকার এলসা নামে একটি মেয়ে ছিল। আইনষ্টাইন তাঁকে বহুদিন যাবৎ চিনতেন ও পছন্দ করতেন। বার্লিনে তাঁকে যখন নিজের পরিবার ছেড়ে একা থাকতে হয়েছিল, তখন সেখানে এলসা ও তাঁর দুটি কন্যা আইনষ্টাইনের জীবনের সব শূন্যতা ভরিয়ে দিতেন। মা-বাবা উভয়ের দিক থেকে আইনষ্টাইন ও এলসা আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মায়েরা ছিলেন সহোদরা এবং সেদিক থেকে তাঁরা দুজনে ছিলেন নিজের মাসতুতো ভাইবোন। অপর পক্ষে তাঁদের বাবারা ছিলেন জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাই এবং সেদিক থেকে তাঁরাও ছিলেন দ্বিতীয় ধাপের জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোন। এলসা ও আইনষ্টাইন উভয়েরই পরিবারের মধ্যে নিবিড়

আত্মীয়তা ছিল। তাই এবার বার্লিনে এসে আইনষ্টাইন ৫ নম্বর হ্যাবারল্যাণ্ড সড়কে কাকার বাড়িতে আহার করতে যেতেন এবং তাঁর খুড়তুতো বোনের সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন।

এলসা ছিলেন বিধবা। আইনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হবার পরের বছরগুলি ভালভাবেই কেটে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন মর্যাদাসম্পন্ন যুবতী। তাঁর বড় চোখ দুটি নীল রঙের এবং উচু কপালের ওপর থেকে পেছনে চুল আচড়ানো থাকত। যখন তিনি হাসতেন, তাঁর সারা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আইনষ্টাইন আনন্দ পেতেন। কারণ সেসব কথার মধ্য দিয়ে মিউনিকে তাঁদের একসঙ্গে থাকবার দিনের ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ত। আইনষ্টাইন আগের মতো এখনও কি বেহালা বাজান? হাঁ, বাজান। তবে যতটা অনুশীলন করা উচিত ঠিক ততটা এখন আর করেন না। কিন্তু মোটামুটি ভালোই বাজাতে পারেন। এ কথাই আইনষ্টাইন এলসাকে বলেছিলেন। তাঁর কাছে বেহালার গুরুত্ব ছিল অনেকখানি। কারণ যখনই তিনি ক্লান্ত বা নিরুৎসাহ বোধ করতেন, তখনই পরম আনন্দে বেহালাখানি তুলে নিতেন। বাখ ও মোৎসার্টের সুর ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়।

১৯১৭ সালে প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন হবার পর আইনষ্টাইন ও এলসা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন এবং এলসা পরিবারের ৫ নম্বর হ্যাবারল্যাণ্ড সড়কের বাড়িতে একটি অংশ তাঁরা ভাড়া নিলেন। এলসার দুটি কন্যা এই নতুন বাড়িতে তাঁর সঙ্গে বাস করবার জন্যে এলো। যদিও আইনষ্টাইন এ মেয়ে দুটিকে আইনত পোষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন নি, তারা দুজনে কিন্তু তাঁরই পদবী গ্রহণ করলো এবং তাঁকে নিজের সন্তানের মতো তাঁদের মনে হত।

নতুন বাসায় আইনষ্টাইন যে সুখের আস্বাদ পেলেন সেরকম আর ইতিপূর্বে তাঁর কখনও ঘটেনি। যদিও আইনষ্টাইনের দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁর সাথে উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞানের বই পড়াতে পারতেন না, কিন্তু তিনি এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে তাঁর স্বামীর কাজের

জন্যে শান্তি ও শান্ত পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। একারণে তিনি তাঁর স্বামীকে ঘরসংসারের ব্যাপারে কখনও বিরক্ত করতেন না। আইনষ্টাইনের খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন যে অগণিত লোক নিজেদের হোমরা-চোমরা ভেবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, তাদের হাত থেকে এলসা তাঁর স্বামীকে রক্ষা করতেন।

শ্রীমতী আইনষ্টাইন তাঁদের বাসকক্ষকে পৈতৃক সূত্র পাওয়া আসবাবপত্র দিয়ে সুন্দর করে সাজালেন। তিনি শাদা পর্দা ও ফিকে রং পছন্দ করতেন। অধ্যাপক আইনষ্টাইনের পড়ার ঘরের দেওয়াল মোড়া হলো পাতলা সবুজ রঙের কাগজ দিয়ে আর শোবার ঘর ফিকে হলদে রঙের কাগজ দিয়ে। বসবার ঘরে রাখা হলো একটি অনেক দিনের পুরোনো সুন্দর পিয়ানো (কারণ আইনষ্টাইন পিয়ানো ও বেহালা দুইই বাজাতেন এবং তাঁরা দুজনেই সঙ্গীত ভালবাসতেন)। ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর কুরুশ কাঠি বোনা একটি টেবিল ক্লথ এবং মাথার ওপর উঁচুতে টাঙানো হলো ঝক্‌মকে টুংটাং শব্দ করা স্ফটিকের ঝাড়লণ্ঠন।

কিন্তু আইনষ্টাইন নিজে বৈষয়িক জিনিসপত্রের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে মোটা গদি-আঁটা সোফা বা পালিশ করা সাইনবোর্ড দুই ই পিপার কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি হতে পারে। তাঁর নিজের পড়ার ঘরটি ছিল যতদূর সম্ভব সাদা-সিধা—একটি ছোট ঘরে একটি টেবিল, যার উপর তিনি কাজ করতেন, একটি দুটি সোফা চেয়ার, একটি কোচ এবং দেওয়ালের চতুর্দিকে বই, শুধু বই-এর সারি। কোনো আগন্তুক এই ঘরে এসে এ সমস্ত বই-এর নামের দিকে তাকালে বিস্মিত হবেন। কারণ তার মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লোকের পক্ষে অতীব কঠিন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই সমস্ত কঠিন বই-এর মধ্যে একটি বই ছিল যার নাম 'রন্ধনের অ-আ-ক-খ'।

এলসা আইনষ্টাইনের শুধুমাত্র স্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে তাঁর মা, পাচিকা, সচিব ও রক্ষাকর্ত্রী। তাঁর স্বামী যখন

পাঠকক্ষে গিয়ে গণিতচর্চার জন্যে দরজা ভেজিয়ে দিতেন, তিনি তখন কাউকে বা কোনো কিছুতে তাঁর কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে দিতেন না। তিনি নিজের হাতে তাঁর সমস্ত আহার্য পাক করতেন। কারণ সে সময় তাঁর হজমশক্তি খুব ভালো ছিল না (ছাত্রাবস্থায় অনাহারের দরুনই বোধ হয় তাঁর হজমশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল)। তাঁর টেবিলের ওপর যে-সব কাগজপত্র থাকত তাতে কখনই হাত দেওয়া হত না। আগন্তুকরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তাদের বেছে নেওয়া হত এবং যারা শুধু নিজের কার্যোদ্ধারের জন্যে তাঁর কাছে আসত, তাদের দেখা করতে দেওয়া হত না।

শ্রীমতী আইনষ্টাইন অল্পকালের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারলেন, তাঁর প্রতিভাধর স্বামী সামান্য সামান্য ব্যাপারে ঘাবড়ে যান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, টাকাপয়সার ব্যাপারটা তাঁর কাছে এতই জটিল যে তিনি কোনোদিনই তার সমাধান করে উঠতে পারতেন না। তিনি যখন বাইরে যেতেন, তখন শ্রীমতী আইনষ্টাইন তাঁর পকেটে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা দিয়ে দিতেন এবং তাঁকে মনে করিয়ে দিতেন যে টাকাটা পকেটেই আছে।

—'অ্যালবার্ট, আমি তোমার জামার ভেতরের পকেটে তিন ডলার রেখে দিয়েছি, তার কথা ভুলে যেও না যেন।'

তিনি স্ত্রীর প্রতি অসহায়ভাবে তাকিয়ে যেন বলতেন: 'টাকার মতো কঠিন বিষয় সম্পর্কে আমি কেমন করে ভাবব?'

ব্রাশ দিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ সাফ করার সময় শ্রীমতী আইন-ষ্টাইন দেখতে পেতেন, টাকাটা তখনও তাঁর পকেটেই রয়েছে।

সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক জটিল বিষয় ছিল সাবান। শ্রীমতী আইনষ্টাইনকে মনে রাখতে হত, শুধুমাত্র একরকমের সাবান স্নানা-গারে তিনি ব্যবহার করেন—তা সে স্নানের জন্যে হোক, অথবা গোঁফদাড়ি কামানোর জন্যে হোক। কোন্ সাবান কোন্ কাজের জন্যে তা মনে রাখা অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের মতো প্রতিভাধর গণিত-বেত্তার পক্ষে ছিল সুকঠিন!

চারধারে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে, সে সময়ের মধ্যে তিনি আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ তত্ত্ব সম্পূর্ণ করে ফেললেন। তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হবার দশ বছর পরে ১৯১৫ সালে দ্বিতীয় গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলো।

যুদ্ধ সর্বগ্রাসী। এমন কি আইনষ্টাইনও তাঁর জীবন থেকে যুদ্ধ পরিহার করতে পারেন নি। জার্মানীতে বাসকালে তিনি ছিলেন একজন সুইস ইহুদী। সে-সময় জার্মানী এবং সমগ্র ইউরোপে ইহুদী-বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠছিল।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে একদল খ্যাতনামা জার্মান সম্মিলিতভাবে এক পত্র প্রকাশ করলেন। এই পত্রটি বিরানব্বুই জন জার্মান প্রাজ্ঞের ঘোষণাপত্র' বলে আখ্যাত। এই ঘোষণাপত্রের মূল বক্তব্য।—জার্মানীর মনীষী, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা এই সামরিক অভিযান সমর্থন করেন এবং বিশ্বাস করেন আক্রমণ সম্পর্কে জার্মানী নিরপরাধ। জার্মানীর বিরানব্বুই জন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ও শিল্পী-সাহিত্যিক এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং আইনষ্টাইনের কাছে স্বাক্ষরের জন্যে সেটি নিয়ে এলেন। তিনি যদি স্বাক্ষর করেন, তা হলে এক বিখ্যাত নাম সংযোজিত হবে। তাঁরা তখন বলতে পারবেন, 'দেখো, শান্তিবাদী আইনষ্টাইন, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনও বিশ্বাস করেন যে জার্মানী নিরপরাধ।

কিন্তু শান্ত, বিনম্র ও শান্তিপ্রিয় অধ্যাপক আইনষ্টাইন সোজাসুজিই জানালেন তিনি এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে পারবেন না।

তিনি তাঁদের বললেন, 'বড় দেরি হয়ে গেছে। এখন যুদ্ধ শুরু হবার পর কে অপরাধী, কে বা নিরপরাধ তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে? এখন সবচেয়ে প্রধান কাজ হচ্ছে বিশ্বের জাতিগুলির সম্মিলিত হয়ে শান্তি স্থাপন করা।'

এই ঘোষণার দ্বারা আইনষ্টাইন তাঁর নিজের ওপর এক চরম বিপদের ঝুঁকি নিলেন। তাঁর সুইস নাগরিকত্বের জন্যেই শুধু পরিত্রাণ পেয়ে গেলেন, নইলে বিশ্বাসঘাতক অপবাদে তাঁকে আখ্যাত

হতে হত। কিন্তু তাঁর প্রতি নানা বিদ্রূপ ও কটূবাক্য বর্ষিত হতে লাগল।

এই সমস্তই আইনষ্টাইন উপেক্ষা করলেন। চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েও তিনি যুদ্ধের সময় এবং তারপর আরও অনেক বছর স্বাভাবিক সাহসিকতার সঙ্গে ৫ নম্বর হ্যাবারল্যাণ্ড সরণির বাড়িতেই বাস করলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্লিনে জীবনযাত্রা স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল না। জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেল। জার্মান মুদ্রাস্ফীতি প্রচুর বৃদ্ধি পেল এবং ক্রয়ক্ষমতায় তার মূল্য ক্রমশ কমে এলো। জার্মান সেনাদলের জন্যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র বাধ্যতামূলকভাবে সরবরাহ করতে হবে, তারপর যা বাকী থাকবে তা বেসামরিক লোকেরা পাবে—এই হলো নির্দেশ। এলসা যখন তাঁদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য কেনার জন্যে বাজারে যেতেন, তাঁকে দোকান থেকে দোকানে ঘুরে বেড়াতে হত। এমন কি, অনেক সময় শূন্যহাতেই ফিরে আসতে হত।

আইনষ্টাইনের সুইজারল্যাণ্ডের বন্ধুরা কিন্তু তাঁকে ভুলে যান নি। যখনই তাঁরা পারতেন, তখন আইনষ্টাইনের জন্যে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি পার্শেল করে পাঠাতেন। তাঁদের সাহায্যের জন্যেই আইনষ্টাইন পরিবার যুদ্ধের মধ্যেও নির্বিঘ্নে জীবন নির্বাহ করতে পেরেছিলেন।

১৯১৬ সালে আইনষ্টাইনের কাছে একটি হৃদয়বিদারক অতি মর্মান্তিক সংবাদ এলো। তাঁর বন্ধু ফ্রেডরিক অ্যাডলারের প্রতি গুলী করে হত্যার শাস্তি প্রদত্ত হয়েছে।

শান্তিবাদী ডঃ অ্যাডলারই আইনষ্টাইনকে সর্বপ্রথম রাজনীতিতে আগ্রহান্বিত করে তোলেন। এই অ্যাডলারই নিঃস্বার্থভাবে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকরির আবেদনপত্র প্রত্যাহার করেছিলেন, যখন তিনি শোনেন যে আইনষ্টাইনও ওই একই পদের জন্যে আবেদন পেশ করেছেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও উগ্রপন্থী

ছিলেন। অষ্ট্রিয়ান প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট স্টারথ্‌কে তিনি গুলী করে হত্যা করেন।

ডঃ অ্যাডলার যখন হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হন এবং তাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হলে', তিনি কোর্টে দাঁড়িয়ে বললেন: 'আমি কি করতে যাচ্ছি তা আমি অবশ্যই জানতুম। কাউণ্ট স্টারথ্‌ হত্যারই যোগ্য, কারণ তিনি যুদ্ধ বাঁধাতে সাহায্য করেছেন।'

হত্যাপরাধে অ্যাডলারের শাস্তি পরবর্তীকালে ১৮ বছরের কারাদণ্ডে কমানো হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালে যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর অ্যাডলারকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সংবাদটি শুনে আইনষ্টাইন গভীর শান্তি লাভ করেছিলেন।

যদিও যুদ্ধের ফলে জার্মানীতে বসবাসকারী সকলকে দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, ডঃ আইনষ্টাইন কয়েকটি কারণে সুখী হয়েছিলেন। জাগতিক ব্যাপারে তিনি মাথা ঘামাতেন না। শ্রীমতী আইনষ্টাইন যে কত কষ্ট করে খাদ্য সংগ্রহ করতেন তা ঠিকভাবে তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন না। একমাত্র যে অসুবিধার কথা তাঁর মনে উদয় হত সেটা হচ্ছে সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ প্রেরণের সমস্যা, যাতে তিনি ও তাঁর দুটি পুত্র স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারেন। তখন জার্মানীর বাইরে অর্থ প্রেরণের কঠিন বিধিনিষেধ ছিল এবং বিনিময় হারের জন্যে বড় রকম বাট্টা দিতে হত।

জার্মান সরকার আইনষ্টাইনকে একটি জার্মান ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। এর ফলে তিনি মধ্যে মধ্যে হল্যাণ্ডে লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বন্ধু লরেনৎসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতে পারতেন। লরেনৎস্‌ চাইতেন, আইনষ্টাইন লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কাজ করুন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও তিনি জানতেন, আইনষ্টাইনের পক্ষে বার্লিনে গবেষণা ছেড়ে আসা সম্ভব নয়। লরেনৎসের মৃত্যু পর্যন্ত এই দুই মনীষীর মধ্যে দীর্ঘকাল অন্তরঙ্গতা বজায় ছিল। আইন-

ষ্টাইন যখন বার্লিনে তাঁর চারধারের ব্যাপার দেখে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়তেন, তখন তিনি লিডেনে গিয়ে ডঃ লরেনৎসের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে আসতেন।

আইনষ্টাইন যখনই কোথাও যেতেন, শ্রীমতী আইনষ্টাইন তাঁর জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়তেন। তিনি জানতেন তাঁর হজমশক্তি ভালো নয়। এবং সেজন্যে যে সময়ে যে খাদ্য তার প্রয়োজন সে-সমস্তই তিনি ঠিক করে রাখতেন। তিনি এ-ও জানতেন যে, আইনষ্টাইন এত উদাসীন প্রকৃতির যে বাড়ির বাইরে গেলে খাদ্যের প্রতি আর নজর দিতেন না। ফলে প্রতিবারই হজমের গোলমাল নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতেন।

এ পরিস্থিতিতে শ্রীমতী আইনষ্টাইন তাঁকে ভর্ৎসনা করতেন : 'অ্যালবার্ট, তুমি কি খেয়েছিলে ?'

খাবারের কথা মনে রাখা আইনষ্টাইনের পক্ষে সম্ভব নয়। আদৌ খেয়েছেন কিনা তা-ই মনে রাখতে পারতেন না।

শ্রীমতী আইনষ্টাইন জানতেন, হল্যাণ্ডে যুদ্ধকালীন খাদ্য জার্মানীর মতো অত খারাপ নয়। তবে সে-খাদ্য যে একেবারে ভালো তা-ও বলা যায় না।

ডঃ আইনষ্টাইন এবং ডঃ লরেনৎস্ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এত নিমগ্ন হয়ে থাকতেন যে তাঁদের হাতের কাছে যে খাবার আসত তাই নির্বিচারে গ্রহণ করতেন।

শ্রীমতী আইনষ্টাইন তাঁর সামনে একবাটি গরম স্যুপ তুলে ধরতেন এবং তিনি বিনা দ্বিধায় চামচে তুলে নিয়ে তা খেতে আরম্ভ করতেন।

শ্রীমতী আইনষ্টাইনের কন্যারাও ডঃ আইনষ্টাইনের সবিশেষ যত্ন নিতেন। তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তাদের মা যখন ডঃ আইনষ্টাইনকে বিয়ে করেন, তখন জ্যেষ্ঠা কন্যা ইলসে একজন তরুণী এবং ১৯২৬ সালে তার মায়ের বিয়ের ৯ বছর পরে সে নিজেও বিয়ে করে স্বামীর ঘরে চলে যায়। কনিষ্ঠা মারগট ছিল দেড় বছরের

ছোট। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ডঃ আইনষ্টাইনকে সে তার নিজের বাবা বলেই মনে করত।

ডঃ আইনষ্টাইনের প্রতি যত্ন নিয়েও এবং শত অনুরোধ-উপরোধ করেও তাঁকে পোশাকপরিচ্ছদে কেতাদুরস্ত করা যেত না। ঢলঢলে প্যান্ট, ছেঁড়া সোয়েটার-জ্যাকেট ও তামাকভর্তি পাইপ—এই কটা জিনিস হলেই তাঁর চলে যেত। এবং এভাবেই তিনি অনেক সময় বেশ আরামে তাঁর গণিতচর্চার কাজকর্ম করতেন।

শ্রীমতী আইনষ্টাইন ও তাঁর মেয়েরা জানতেন, ডঃ আইনষ্টাইন তাঁদের ভালবাসেন। কিন্তু অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি অপরের সম্পর্কে উচ্ছ্বাস কদাচিৎ প্রকাশ করতেন। তাঁর মাথা নাড়া বা সামান্য সৌজন্য প্রকাশ থেকেই তাঁরা অনুমান করতে পারতেন, তিনি তাঁদের কত ভালবাসেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর ইউরোপে লোকদের আগমন আবার শুরু হলো। ডঃ আইনষ্টাইনের জ্যেষ্ঠপুত্র এডওয়ার্ড, তখন তার বয়স পনেরো বছর, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো। কিন্তু আইনষ্টাইন তাকে আলিঙ্গন করলেন না বা সচরাচর লোকে ছেলের প্রতি যে স্নেহ প্রদর্শন করে থাকেন তা-ও করলেন না।

তাঁর গণিতের মতোই অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ছিলেন নিরুত্তাপ ও উচ্ছ্বাসহীন—তাঁর প্রকৃতিতে উত্তেজনা-প্রবণতা বা অস্থিরতা কখনই দেখা যেত না। দীর্ঘ ক্লান্তিকর অগ্নিপরীক্ষার পরই শুধু তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো। তাঁর প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাণখোলা হাসি। তিনি নিজে যত হাসতেন অপরকেও তেমনি হাসাতেন। জীবনের লঘু দিকটা তিনি কখনও এড়িয়ে চলতেন না, এবং রসিকতার সুযোগ এলে তা পুরোপুরিই উপভোগ করতেন।

তবু তিনি ছিলেন গভীর অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপরের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্যে বেশি করে সময় ব্যয় করতে ও অপরের নিগ্রহের সমভাগী হতে লাগলেন।

১৯১৮ সালে জার্মানী আত্মসমর্পণ করার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ

হয়। তার তিন বছর আগে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কাজ শেষ করেন। কিন্তু সারা বিশ্ব যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন নিমগ্ন ও বিভ্রান্ত হয়েছিল যে, তাঁর তত্ত্বের কথা বিশেষ কারো কানে পৌঁছয় নি। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হয়।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর যখন অবসর এলো, তখন অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের কথা প্রচারিত হতে লাগলো। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক লোক, এমন কি বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত, ১৯০৫ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র ঠিক ঠিক বুঝতে পারতেন না এবং তাঁর চেয়ে আরও কম লোক বুঝতে পারত ১০ বছর পরে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্র। আইনষ্টাইনের তত্ত্বগুলি বোঝবার পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে এই যে, উচ্চতর গণিতের জ্ঞান ছাড়া এই তত্ত্বগুলি বোঝা যায় না। গণিতের জ্ঞান ছাড়া তাঁর মহাকর্ষ সম্পর্কিত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সত্যিই অসম্ভব, যদিও এর অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।

কিন্তু মহাকর্ষ এমন একটি বিষয় যা সহজে ধারণা করা যায় না। আইনষ্টাইনের দ্বিতীয় তত্ত্ব প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, মহাবিশ্বে নক্ষত্র ও গ্রহাদির মধ্যে একটা আকর্ষণ শক্তি আছে। যেমন, সূর্যের আকর্ষণের জন্যে পৃথিবী সূর্যের নিকটে বিরাজ করে। আইনষ্টাইন বললেন, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। গ্রহগুলি হচ্ছে একেবারে অলস এবং সবাপেক্ষা কম বাধার পথ তারা অনুসরণ করে। মহাবিশ্বে অদৃশ্য পাহাড়-পর্বত ও খাত আছে। যখন কোন মহাজাগতিক বস্তু পরিক্রমাপথে পাহাড়ের নিকটে আসে তখন তার চারদিকে আবর্তন করতে থাকে, কারণ সেটাই হচ্ছে সহজ। কিন্তু যখন কোনো খাতের নিকটে আসে তখন তার মধ্যে পড়ে যায় এবং তার পথ অনুসরণ করে।

ডঃ আইনষ্টাইন এখানেই নিবৃত্ত হলেন না। তিনি এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যা সাধারণ লোকেরাও বুঝতে পারে।

বিজ্ঞান-জগৎকে তিনি বললেন : 'পরবর্তী পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করুন। গ্রহণের সময় চন্দ্র যখন সামনে এসে সূর্যকে সম্পূর্ণ আড়াল করে দাঁড়াবে তখন সূর্যের সন্নিকটস্থ নক্ষত্রগুলিকে দেখা যাবে। আমার মহাকর্ষ তত্ত্ব যদি নির্ভুল হয়, তা হলে নক্ষত্রগুলিকে স্থানান্তরিত বলে মনে হবে।'

মহাকাশে নক্ষত্রদের অবস্থিতির সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন? তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে এই নক্ষত্রগুলি আমাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরে, সূর্যের চেয়েও বহু দূরে অবস্থিত। পৃথিবী যখন তার কক্ষপথে ঘোরে, তখন নক্ষত্রগুলি উদিত ও অস্তগামী বলে মনে হয়। পৃথিবী যখন সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হয়, তখন বছরের বিভিন্ন সময়ে আমরা ভিন্ন প্রকৃতির মহাকাশ দেখি।

কিন্তু এখানে একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে, মনে করা যাক ১৯ ডিসেম্বর রাত্রি ৮টায়, ভূপৃষ্ঠের একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা প্রতি বছর একই রকমের নক্ষত্র-বিন্যাস দেখব। যদি আমরা উত্তর গোলার্ধে থাকি তা হলে দেখতে পাব সপ্তর্ষিমণ্ডল, শিশুমার ও কালপুরুষকে। এই বিন্যাসের যে-কোনো একটিতে নক্ষত্রগুলির পারস্পরিক দূরত্ব সর্বদাই সমান থাকে।

আইনষ্টাইন বললেন, নক্ষত্রাদি থেকে আগত আলো যখন সূর্যের নিকট দিয়ে পৃথিবীতে আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়, তখন আলোর পথ বেঁকে যায় ও সম্পূর্ণ সরলরেখায় আসে না। এর ফলেই নক্ষত্র-সমূহ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে অবস্থিতি পরিবর্তন করেছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ দুটি নক্ষত্র যারা সর্বসময়ে পরস্পর থেকে একই দূরত্বে আছে মনে হয় না, তারা একটু কাছে এসেছে বা একটু দূরে সরে গেছে বলে মনে হবে।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, এই ঘটনা কেবল তখনই ঘটে যখন সূর্য আমাদের ও নক্ষত্রসমূহের মাঝে অবস্থান করে অর্থাৎ দিনের বেলায়।

কিন্তু তখন সূর্যের অত্যুজ্জ্বল আলোতে আমরা নক্ষত্রগুলিকে দেখতে পাই না। আইনষ্টাইন ইঙ্গিত দিলেন, পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করলে এই ব্যাপারটা যাচাই করা যাবে। কারণ চন্দ্র তখন সূর্যের আলো থেকে নক্ষত্রগুলিকে আড়াল করে রাখে এবং তার ফলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় নক্ষত্রগুলিকে দেখা যায়।

রাত্রিকালে নক্ষত্রসমূহ থেকে যে আলো আমাদের কাছে আসে সেটা বিনা বাধায় সরলরেখায় আসতে পারে। কিন্তু দিনের বেলায় ওই একই নক্ষত্রগুলি থেকে যে আলো আমাদের কাছে আসে সেটাকে পৃথিবীতে পৌঁছবার আগে সূর্যের কাছ দিয়ে আসতে হয়। সূর্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে সে আলোকরশ্মি আসবার সময় সরল রেখা থেকে বিচ্যুত হয়ে বেঁকে যায়।

পৃথিবী থেকে আমরা নক্ষত্রগুলির দিকে তাকালে আলোর এই বক্রতার দরুন মনে হবে, নক্ষত্রগুলি যেন তাদের অবস্থিতি পরিবর্তন করেছে। প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রগুলি কিন্তু তাদের অবস্থিতি পরিবর্তন করে না। তবে কেন এমন মনে হয়? মনে হয় এজন্যে যে, নক্ষত্র-গুলি থেকে আগত আলোর গতিপথ সূর্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আইনষ্টাইন যখন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, তখন সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তাঁর গণিততত্ত্বকে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হলেন। পরবর্তী পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় তাঁরা এই বিষয়টি যাচাই করে দেখবেন এবং জানতে পারবেন—এই তত্ত্বের উদ্ভাবক আইনষ্টাইন একজন প্রতারক, না এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী?

আলবার্ট আইনষ্টাইন ছাড়া অন্যান্য সকলেই এই ব্যাপারে উত্তেজিত হয়েছিলেন। আইনষ্টাইন জানতেন, যা তিনি বলেছেন তা নির্ভুল। তাই এ সমস্ত উত্তেজনায় ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি ৫ নম্বর হ্যাবারল্যাণ্ড সড়কের বাসভবনে শান্ত চিত্তে গণিতচর্চায় নিমগ্ন রইলেন। নক্ষত্রসমূহের অবস্থিতির পরিবর্তন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার চেয়ে বেশি কিছু তিনি করলেন। ঠিক কতটুকু ব্যবধানে নক্ষত্রগুলির

অবস্থিতি পরিবর্তিত বলে বোধ হবে তাঁর নির্ভুল হিসাবও তিনি গণিতের সাহায্যে জানিয়ে দিলেন।

চন্দ্রের দ্বারা সূর্যের পরবর্তী পূর্ণগ্রহণ সংঘটিত হবে ১৯১৯ সালের মে মাসে। পৃথিবীর ওপর অন্ধকার রাত্রির ছায়া নেমে আসবে উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগর এবং দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল অঞ্চলে। বিশ্বের অন্যতম প্রধান ও নির্ভরশীল বৈজ্ঞানিক সংস্থা ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটি এই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্যে একদল বিজ্ঞানী-অভিযাত্রী পাঠাবার সিদ্ধান্ত করলেন। বস্তুত. রয়েল সোসাইটি দুটি অভিযাত্রী দল প্রেরণ করলেন—একটি আফ্রিকায় এবং অপরটি ব্রেজিলে। যখন ইংলণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ চলছিল সেই সময়েই দুটি অভিযানের পরিকল্পনা আরম্ভ হয় এবং যুদ্ধবিরতির চারমাস পরে এই পরিকল্পনা ঘোষিত হয়।

১৯১৯ সালের ২৯ মে তারিখটি বিজ্ঞানজগতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন: ওই দিন দুদল বিজ্ঞানী পূর্ণ সূর্যগ্রহণ সংঘটনের জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। একদল প্রতীক্ষা করছিলেন ব্রেজিলের পূর্বাংশে সোব্রাল-এ। অপর দলটি ছিলেন বিষুবরেখার অনতিদূরে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল সন্নিকটস্থ উষ্ণ, আর্দ্র, ঘর্মাক্ত আবহাওয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রিন্সেপ দ্বীপে। উভয় দলই সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও শক্তিশালী ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন, যে মুহূর্তে চন্দ্র সূর্যের সামনে এসে তীব্র আলোক থেকে নক্ষত্রগুলিকে আড়াল করে ফেলবে, সেই মুহূর্তেই তাঁরা নক্ষত্রগুলির ফটো গ্রহণ করতে পারবেন।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণ কয়েক মিনিট মাত্র স্থায়ী হবে। অতি দ্রুত কাজ করবার জন্যে তাঁদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। সূর্যের সন্নিকটে চন্দ্র এগিয়ে এলো, ক্রমশ এগিয়ে আসতে আসতে সূর্যের একাংশ ঢেকে ফেললো এবং তারপর একটু একটু করে আচ্ছাদিত অংশের আয়তন বেড়ে চললো। দিনের আলোক লুপ্ত হয়ে রাত্রিতে পরিণত হতে চললো। অল্পক্ষণের মধ্যেই চন্দ্র একেবারে সূর্যের সামনে এসে

তাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেললো। অভিযাত্রীরা যত দ্রুত সম্ভব ফটো তুলতে লাগলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

যত্নসহকারে তাঁরা মূল্যবান ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলিকে প্যাক করে গবেষণাগারে সেগুলিকে পরিস্ফুট করবার জন্যে ফিরে এলেন। ফটোগুলি পরিস্ফুট হবার পর সেগুলিকে সামনে রেখে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিমাপ করতে লাগলেন।

আইনষ্টাইনের কথা ঠিক—সম্পূর্ণই ঠিক। দেখা গেল, নক্ষত্রগুলির অবস্থিতি সত্যই পরিবর্তিত হয়েছে। দূর নক্ষত্র থেকে আগত আলোকরশ্মি সূর্যের কাছ দিয়ে যাবার সময় সূর্যের মহাকর্ষ ক্ষেত্রের দ্বারা যথার্থই প্রভাবিত হয়েছে এবং তার ফলে তাদের গতিপথ বেঁকে গেছে।

এই সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমির সহকর্মীরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন: 'অধ্যাপক আইনষ্টাইন, আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'

তাঁদের মধ্যে একজন বললেন: 'আপনার তত্ত্ব নির্ভুল প্রমাণিত হওয়ায় আপনি এখন নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়েছেন।'

ডঃ আইনষ্টাইন তাঁর ব্রায়ার পাইপটি মুখ থেকে বার করে একটু বিস্মিতভাবে তাকালেন। তারপর শান্তভাবে তাঁদের বললেন: 'আমার নিজের তো কোনো প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না। অন্যান্য যাঁদের প্রয়োজন ছিল তাঁরা প্রমাণ পেয়েছেন।'

দাবাগ্নির মতো সংবাদটি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। আইনষ্টাইন রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলেন। প্রত্যেক ভাষার পুস্তকে, সাময়িক পত্র-পত্রিকায়, প্রবন্ধে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁর বিষয়ে লেখা প্রকাশিত হলো। আইনষ্টাইন যে কি করছেন তা অতি অল্পসংখ্যক লোকই বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু সর্বস্তরের লোকের কাছে তিনি খ্যাতি অর্জন করলেন।

একাদশ অধ্যায়

জায়োনিজ্‌ম বা ইহুদীবাদ

শান্ত প্রাজ্ঞ আইনষ্টাইন চাইতেন শান্ত পরিবেশে একাকী চিন্তা করতে। কিন্তু তাঁর তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের সাংবাদিক দল, হস্তাক্ষর-সংগ্রহী, ক্যামেরাভক্ত ও অন্যান্যেরা তাঁকে বিব্রত করে তুললো যদিও তাঁকে কোনো রকমে বিব্রত করার অধিকার তাঁদের কারো ছিল না। অনুরাগী ও সমমতাবলম্বী ব্যক্তিদের কাছ থেকে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি ভাষায় লিখিত অগণিত চিঠিপত্র তাঁর বাসায় আসতে লাগলো। হুলিউড তাঁর একটি চলচ্চিত্র গ্রহণ করতে চাইল এবং সেজন্যে অবিশ্বাস্য রকমের অর্থপ্রদানের প্রস্তাব করলো।

এর উত্তরে ডঃ আইনষ্টাইন শুধুমাত্র একটা কথা বললেন: 'পৃথিবীর লোকেরা দেখছি উন্মাদ হয়ে উঠেছে।'

জনতার হাত থেকে আইনষ্টাইনকে রক্ষা করা শ্রীমতী আইনষ্টাইনের পক্ষে প্রায় দুষ্কর হয়ে দাঁড়ালো। লোকেরা যখন তাঁর স্বামীর কাছে যেতে পারত না, তারা তখন শ্রীমতী আইনষ্টাইনকে কথা শোনাত। অনেক সময় এমন হত—শ্রীমতী আইনষ্টাইন দোকান থেকে কেনাকাটা করে বাড়িতে এসে লিফ্‌টে উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় দেখলেন লিফ্‌টে তাঁর সঙ্গে অপর কেউ রয়েছে। লিফ্‌টে দুজন লোক তাঁকে একের পর এক নির্বোধ প্রশ্ন করতে লাগলো—

'একজন মহাপুরুষের স্ত্রীরূপে আপনার কিরকম মনে হয়?'

'প্রাতঃরাশে অধ্যাপক আইনষ্টাইন কি কি জিনিস খান?'

'তিনি ক'ঘণ্টা কাজ করেন?'

'রাত্রে তিনি কি ভালোভাবে নিদ্রা যান?'

এই সমস্ত ব্যক্তিগত খবরাখবরে শ্রীমতী আইনষ্টাইন তাঁর স্বামীর চেয়েও বেশি বিস্মিত হতেন। এই ধরনের সম্মান অর্জনের যোগ্য কাজ কি তিনি করেছেন?'

সমগ্র বিশ্ব তাঁকে সম্মান উজাড় করে দিয়েও যথেষ্ট মনে করে নি। তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন অজস্র, তাঁর প্রায় সারা দেহ পদকে মুড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর প্রশস্তি গগন স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন এসবের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং কোনোরকম ভ্রূক্ষেপ না করেই নিজের কাজ নিয়েই মেতে রইলেন।

সারা বিশ্বে মানুষের যে দুঃখকষ্ট চলছিল তার প্রতিই ছিল ডঃ আইনষ্টাইনের সবিশেষ সহানুভূতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে এবং সমগ্র ইউরোপ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যে সব ঘরবাড়ি বোমার আঘাতে নষ্ট হয়েছে সেগুলিকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। যে সমস্ত রেলপথ ও সেতু বিধ্বস্ত হয়েছে সেগুলিকে সংস্কার করতে হবে। অনাথ শিশুদের একত্র করে আশ্রয় দিতে হবে। শস্যাদি ভস্মীভূত হওয়ায় গবাদি পশু মারা যাওয়ায় অনেক লোককে তখন অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছিল।

এখন আইনষ্টাইন বিশ্বখ্যাতি অর্জন করায় বক্তৃতা দিতে এলে বিপুল সংখ্যক শ্রোতা সমবেত হবে। তিনি এখন রাজনীতি এবং বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন এবং লোকে তাঁর বক্তব্য ধৈর্যসহকারে শুনবে।

যদিও তিনি এই জনপ্রিয়তাকে হাস্যকর মনে করতেন, তবু শান্তিবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা করার সুযোগ পেলেন। তাঁর বক্তৃতা শোনার উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকক্ষে প্রবেশাধিকার লাভের জন্যে লোকেদের মধ্যে মারামারি লেগে গেল। তিনি জার্মান হওয়া সত্ত্বেও এবং তখনও পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব জার্মানীর প্রতি যুদ্ধজনিত বিদ্বেষভাব

পোষণ করা সত্ত্বেও ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনের জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হলেন। তাঁরা তাঁকে একজন সুইস ইহুদী বলে বিবেচনা করত, কিন্তু জার্মানী তখন তাঁর জন্যে গর্বিত বোধ করে তাঁকে জার্মান বিজ্ঞানী বলে অভিহিত করলো।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একথা বিস্মৃত হয় নি যে, আইনষ্টাইন একদা যুদ্ধে জার্মানীর নির্দোষিতা সম্পর্কে বিরানব্বুই জন খ্যাতনামা জার্মানদের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে স্বীকৃত হন নি। বিশ্বের সর্বপ্রান্ত থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ-পত্র আসতে লাগলো।

প্যারিস মানমন্দির থেকে যে আমন্ত্রণ-পত্র এলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করলেন এবং ফ্রান্স পরিদর্শনের জন্যে যাত্রা করলেন। অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে মনে করা হয় সেটা তিনি নিজে কখনও বোধ করতে পারতেন না। রেলপথে যাত্রার সময় তিনি তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে আরোহণ করতেন এবং ট্যাকসি ভাড়া না করে পায়ে হেঁটে যেতেন। এবার ফ্রান্সে যাত্রার সময় তিনি ট্রেনের এক অন্ধকার কোণে অ-দৃষ্ট হয়ে বসে রইলেন এবং প্যারিসে এসে একলাই নামলেন। তিনি তখন উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, এভাবে একলা এসে তিনি ফ্রান্সের একদল উদ্‌ভ্রান্ত লোকের উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করলেন। তিনি সরাসরি প্যারিস মানমন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এদিকে ফ্রান্সের সীমান্তে অভ্যর্থনা সমিতির কর্তৃপক্ষেরা তাঁকে দেখতে না পেয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। দুজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, প্যারিস মানমন্দিরের সদস্যকে ফ্রান্স ও জার্মানীর সীমান্তে অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁরা কিন্তু ডঃ আইনষ্টাইনের সাক্ষাৎ পেলেন না। কোথায় তিনি যেতে পারেন? তাঁর কোনো বিপদ ঘটে নি তো?— এই ধরনের নানা প্রশ্ন জেগেছিল তাঁদের মনে। অবশ্য তাঁদের উদ্বিগ্ন হবার কারণ ছিল যথেষ্ট। যে ভয়াবহ যুদ্ধে জার্মানী ফ্রান্সের

সামরিক সমাধিক্ষেত্রটি, যেখানে পরের পর শাদা ক্রশ গ্রথিত রয়েছে। যে ডরম্যান্‌স্‌ শহরে সেনাধ্যক্ষ ফখ্‌ ১৯১৮ সালে প্রধান শিবির স্থাপন করেছিলেন সেটিও তিনি পরিদর্শন করলেন। প্রতি মুহূর্তে গাড়িটি একটা বোমাবিধ্বস্ত বাড়ি, বোমা-সৃষ্ট বিবর অথবা একটি গ্যাসবিনষ্ট ও মৃত কৃষ্ণসার বৃক্ষ অতিক্রম করে যেতে লাগলো।

এই দৃশ্যে বিষণ্ণ হয়ে নিরহঙ্কার মানুষটি মাথা নেড়ে বললেন: 'আমাদের উচিত জার্মানীর প্রত্যেক ছাত্রকে এই জায়গাটি দেখতে আসবার ব্যবস্থা করা।'

চলতে চলতে তাঁরা রিমস শহরে এসে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধের অধিকাংশ সময়ে এই রিমস শহরের ওপর গোলা-বারুদ বর্ষিত হয়েছিল। জার্মান সেনাদল এই শহরটি অবরোধ করে নির্মমভাবে বোমাবর্ষণ করেছিল। ১৯১৮ সালে মিত্রপক্ষের সেনাদল এই শহরটিকে পুনরুদ্ধার করে। এখন শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

ডঃ আইনষ্টাইন সারির পর সারি বোমাবিধ্বস্ত বাড়িগুলি দেখলেন। মনে মনে ভাবলেন, মানুষ কি করে এমন পাশবিক কাজ করতে পারে!

যখন দলটি মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য যাত্রাবিরতি ঘটালো, তখন একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটলো। তখন অভাবনীয় ভাবে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হলো। সারা বিশ্বের লোক অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনকে যে কি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে এই ঘটনা তারই পরিচায়ক। ছাপার অক্ষরে এই শ্রদ্ধার সঠিক পরিচয় দেওয়া কখনই সম্ভব নয়।

একটি সরাইখানায় আইনষ্টাইন এবং তাঁর ফরাসী পথপ্রদর্শকেরা একটি টেবিলের চারধারে বসেছিলেন। কাছেই আর একটি টেবিলে বসেছিলেন সামরিক পোশাক-পরিহিত দুজন ফরাসী অফিসার এবং তাঁদের সঙ্গে ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার সুন্দরী তরুণী। তাঁরা ডঃ আইনষ্টাইনকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন। আহারের সময়

যাতে দৃষ্টি বিনিময় না হয় সেজন্যে তাঁরা সতর্ক হয়েছিলেন। আইনষ্টাইন ও তাঁর বন্ধুরা আহার শেষ করে চলে যাবার জন্যে উদ্যত হলেন, তখন অফিসার দু'জন ও মহিলাটি দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং আইনষ্টাইন তাঁদের টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় নত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন। তাঁরা আইনষ্টাইনকে যে একজন মহান ও সহৃদয় ব্যক্তি বলে মনে করেন—এটাই তাঁরা জানাতে চেয়েছিলেন।

ফ্রান্সে যুদ্ধকালীন ধ্বংসলীলার চিহ্ন দেখে আসবার পর জার্মানীতে ফিরে এসে আইনষ্টাইনের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেসময় জার্মানীতে যে নতুন বিপদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, তাতে তাঁর অন্তর আরও বেশি পীড়িত হয়েছিল।

আইনষ্টাইনের জন্মের আগে বিসমার্কের সময় থেকে জার্মানীতে ইহুদীবিরোধী মনোভাব ছিল এবং তারপর থেকে এত বছর ধরে তা ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর এই মনোভাব আরও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। রাজনীতিজ্ঞরা এই ধারণা প্রচার করতে থাকেন, পৃথিবীতে যত কিছু অন্যায় সংঘটিত হয়েছে তার জন্যে ইহুদীরা দায়ী।

অপরাপর অনেক ইহুদীর মতো আইনষ্টাইন নিজেকে কখনও ইহুদী বলে মনে করতেন না, যদি না তাঁকে সে-কথা বলতে বাধ্য করা হত। একটিমাত্র বিষয় যার প্রতি তিনি সত্যসত্যই গুরুত্ব আরোপ করতেন সেটি হচ্ছে বিজ্ঞান। তিনি নিজেকে ইহুদী বলে ভাবতে সম্পূর্ণই ভুলে যেতেন, যদি পৃথিবীর লোক তাঁকে সে-কথা ভুলে যেতে দিত।

এই ইহুদী-বিদ্বেষ সম্পর্কে তাঁর প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়, যখন তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পর ছ'মাস অনাহারে প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি ইহুদী শুধু এই অজুহাতে তাঁর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সেসময় কোথাও তাঁকে কাজ দেওয়া হয় নি। এরপর থেকে তিনি কদাচিৎ বিস্মৃত হতে পেরেছিলেন যে তিনি ইহুদী।

অন্যান্য যেসব জায়গায় তিনি ছিলেন তার তুলনায় বার্লিনে এই বিদ্বেষ আরও বেশি উগ্র এবং ক্রমশ তা বেড়েই চলে।

লোকেদের বলতে তিনি শুনতেন, 'আমাদের সব দুর্ভাগ্যের জন্যে ইহুদীরাই দায়ী। ইহুদীদের জন্যেই আমরা জার্মানীতে অনাহারে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছি।' কিন্তু জার্মানী যে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে এবং যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার যে কিছুটা সম্বন্ধ থাকতে পাবে সে ব্যাপারটা তারা উপলব্ধি কবতে পারত না।

এই পরিস্থিতিতে একটিমাত্র কাজ ছিল, যা আইনষ্টাইনের মতো মহৎহৃদয় ব্যক্তি করতে পারতেন। যারা ইহুদীদের সাহায্য কবার কাজ কবছিল তাদের সঙ্গে তিনি যোগ দিলেন। তাঁর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও গুরুত্ব ইহুদী আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হলো। আইনষ্টাইন প্রত্যক্ষভাবে ইহুদী আন্দোলনে কখনও যোগ দেন নি, কারণ তিনি রাজনৈতিক ইহুদীবাদী ছিলেন না। কিন্তু মহাপ্রাণ মানবদরদী হিসাবে তিনি তাদের সাহায্যের জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করতেন।

'জায়োনিজম্' বলতে বর্তমানে কি বোঝায়? 'জায়োনিজম্' হলো এই মতবাদ যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের মাতৃভূমি পুনঃস্থাপিত হোক, যাতে তাদের একটি নিজস্ব দেশ হয় এবং অন্যান্য জাতির মতো তাদেরও একটি নিজস্ব ভাষা হয়।

একটা কথা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সকল ইহুদীরাই জায়োনিষ্ট নয়। বহু ইহুদী মনে করেন প্যালেস্টাইনে প্রত্যাবর্তনের ধারণাটা একটা প্রতীকী মাত্র এবং যেখানেই তাঁরা ইহুদীদের জন্যে নির্দিষ্ট অপরিচ্ছন্ন অঞ্চল ছেড়ে নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে বাস করতে পারেন সেই জায়গাটাই হচ্ছে তাঁদের কাছে প্যালেস্টাইন। তাঁদের মতে ইহুদীরা কোনো পৃথক জাতি নয়, তবে তাঁদের ধর্মমত 'জুডাইজম্' হচ্ছে পৃথক। তাঁরা মনে করেন, ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যাণ্ট, হিন্দুধর্মের মতো 'জুডাইজম্' কথাটি ব্যবহৃত হওয়া উচিত এক

ধর্মাবলম্বীদের বোঝাতে। এই শেষোক্ত মতাবলম্বীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'আমেরিকান কাউন্সিল ফর জুডাইজম্' সংস্থার অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে—যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক এক বছর পরে—হিটলার যখন বিয়ার হল-এ তাঁর মুষ্টিমেয় অনুগামীদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছিলেন, তখন ডঃ আইনষ্টাইন, ডঃ চেইস ভিজম্যান ও অন্যান্য খ্যাতনামা ইহুদীরা মিলিত হয়ে ইহুদী জাতির সংকটের বিষয় আলোচনা কবছিলেন।

ইহুদী সমস্যার সত্যকার সমাধান সম্ভব হতে পঁচিশ বছরেরও বেশি কেটে গিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালের মে মাসে ডঃ চেইস ভিজম্যান স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইস্রায়েল প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের জায়োনিজম সম্পর্কে মতবাদ ছিল এইরকম—প্যালেস্টাইন বিশ্বের সকল ইহুদীদের একটি কৃষ্টিকেন্দ্র হওয়া উচিত, তেমনি একটি বিদ্যা ও কলাকেন্দ্র হওয়া উচিত, যার জন্যে সকল ইহুদীরা গর্ব অনুভব করবেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন : 'আমি বিশ্বাস করি ইহুদী কৃষ্টিকেন্দ্রের অস্তিত্ব বিশ্বব্যাপী ইহুদীদের নৈতিক ও দার্শনিক অবস্থা দৃঢ় করবে। সমগ্র ইহুদী জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের একপ্রকার বাস্তব রূপায়ণের সম্ভাবনা দ্বারা এই অবস্থা সুদৃঢ় হবে।'

এই ইহুদী সমস্যা সমাধানের জন্যে ডঃ আইনষ্টাইন তাঁর জীবনের অবশিষ্টকাল কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন। একটা ব্যাপাব তিনি কখনই বুঝতে পারতেন না—তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের জন্যে কেন লোকে তাঁর প্রতি সম্মানের ডালি অর্পণ করে এবং একই সময়ে ইহুদী হওয়ার দরুন তাঁর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে।

তিনি প্রুশিয়ান আকাডেমিতে কাজ করে যেতে লাগলেন। কিন্তু জার্মানীতে অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ালো। ইহুদী-

বিরোধী মনোভাব ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করতে লাগলো। আকাডেমিতে তাঁর বক্তৃতাকালে ছাত্রেরা বাধা দিয়ে চিৎকার করত—'ইহুদীরা নিপাত যাক, ইহুদীদের মেরে হটাও।'

এই ধরনের মন্তব্য যখন অধ্যাপক আইনষ্টাইনের প্রতি বর্ষিত হচ্ছিল তখন তিনি কি করে সম্মান ও যশের কথা ভাবতে পারেন। এমন কি, ১৯২১ সালে যখন তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হলো, তিনি তাতে সুখী হতে পারেন নি। যখন প্রায় ৫০ হাজার ডলার পুরস্কার পেলেন, তখন নিজের জন্যে কিছুমাত্র না রেখেই সমস্ত অর্থটা পাঠিয়ে দিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রীর কাছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বাধীনতার মুখপাত্রের বিপদ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর অগণিত লোক কেন যে আইনষ্টাইনের বিষয় ভাবত তা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। একদল তাঁকে ঘৃণা করত, যেহেতু তিনি ইহুদী। অন্যান্যেরা ঘৃণা করত, যেহেতু তিনি শান্তিবাদী। তাদের ঘৃণার যুক্তি ছিল এই যে, ইহুদী ও শান্তিবাদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে জার্মানীকে যুদ্ধে পরাজিত করেছে। এমন কি, একদল বিজ্ঞানী এমন গোঁড়া ছিলেন যে, আইনষ্টাইনের তত্ত্বকে স্বীকার করার জন্যে তাঁদের নিজেদের মতবাদের পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। যে বিজ্ঞানী নতুন মতবাদকে স্বীকার করতে পারেন না তিনি যথার্থই সংকীর্ণমনা। আইনষ্টাইনের বিরুদ্ধে সত্যসত্যই আন্দোলন শুরু হলো। তাঁর বিরুদ্ধে সভায়, বক্তৃতায় প্রচার করা হতে লাগলো, পোষ্টারও লেখা হলো। তাঁকে স্বীকৃতি না দেবার জন্য হীন পন্থা অবলম্বন করতেও তাঁরা পেছপা হলেন না। একজন খ্যাতনামা জার্মান বিজ্ঞানী এবং তাঁর অনুগামী দলের সকলেই আইনষ্টাইনকে অপদস্থ করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন এবং আইনষ্টাইনের একটি তত্ত্বকে অপর এক বিজ্ঞানীর কাজ বলে প্রচারও করলেন। বস্তুভর ও শক্তি সম্পর্কিত আইনষ্টাইনের গণিতসূত্র বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা লিখতে গিয়ে তাঁরা সে তত্ত্বকে অপর একজন 'বিশুদ্ধ আর্যরক্ত'-সম্ভূত জার্মান বিজ্ঞানীর নামে 'হ্যাসেন ওহরল পদ্ধতি' বলে

উল্লেখ করলেন। হ্যাসেন ওহরল যথার্থই একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ছিলেন বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা ছিল তিনি একজন বিশুদ্ধ জার্মান! প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি অষ্ট্রিয়ান সেনাদলে কাজ করবার সময় ৪১ বছর বয়সে নিহত হন। তরুণ জার্মান বিজ্ঞানছাত্রদের কাছে ইহুদী আইনষ্টাইন অপেক্ষা তিনি যে অনেক বেশি শ্রদ্ধা অর্জন করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

জার্মানীতে আইনষ্টাইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেটা কিন্তু বুমাবাং-এর মতো তাদেরই কাছেঃ ফিরে এসেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার অন্যান্য দেশে আইনষ্টাইনের খ্যাতি বাড়িয়ে দিল।

বিজ্ঞানে অনাগ্রহী লোকেদের মধ্যেও তাঁর সম্বন্ধে একটা কৌতূহল জাগলো—কে এই আইনষ্টাইন? তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বিষয়টি কি? তাঁকে আমাদের দেশে আমন্ত্রণ করা হোক, যাতে আমরা তাঁকে দেখতে পাব। কিংবা যদি তিনি রাজী হন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদানের জন্যে তাঁকে আহ্বান করা হোক।'

এদিকে জার্মান সরকার একটা ব্যাপার উপলব্ধি করে শঙ্কিত হলেন—এই সব ছোটখাটো অভিযোগ অনুযোগের ফলে আইনষ্টাইন হয়তো জার্মানী ত্যাগ করে যেতে পারেন এবং জার্মানী তার একজন বিশেষ সম্মানিত বিজ্ঞানীকে হারাতে পারে। সরকারের শিক্ষামন্ত্রী আইনষ্টাইনের কাছে একটি পত্র লিখে তাঁকে শঙ্কিত না হবার জন্যে বললেন। উত্তরে আইনষ্টাইন জানালেন, এ সমস্ত ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছেন সত্য। তবে জার্মানী ত্যাগ করে যেতে তিনি চান না। কারণ জার্মানীতে তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, বাড়ি এবং সর্বোপরি বিশ্বে তাঁর প্রধান বিজ্ঞান-সহকর্মীদের মধ্যে কয়েকজন এখানে রয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সমস্যা বিষয়ে আলোচনার সমাধান হিসাবে ডঃ আইনষ্টাইন জার্মানীর নাগরিক হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, যদিও মনে মনে তিনি এ প্রস্তাব অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।

নানা দেশ থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগলো। ডঃ আইনষ্টাইন

প্রথমে যে আমন্ত্রণটি গ্রহণ করলেন সেটি হলো হল্যাণ্ডের লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের। আর একটি আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করলেন। সেটি হলো প্রাগের। যে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একদিন অধ্যাপনা করেছিলেন সেখানে বক্তৃতা দানের জন্যে ফিরে গেলেন। ফিলিপ ফ্রাঙ্ক যিনি শিক্ষকগোষ্ঠীতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দেখাও করলেন।

১৯২১ সালের সফরে আইনষ্টাইন যে প্রাগে এলেন, সেটি আর তখন অষ্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রাগ তখন স্বাধীন চেকো-শ্লোভাকিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী। প্রায় কুড়ি বছর পরে যখন জার্মান সেনারা সমগ্র ইউরোপ দখল করেছিল তখন এই প্রজাতন্ত্র আবার অবলুপ্ত হয়েছিল।

যুদ্ধের দরুন অন্যান্য অনেক দেশের মতো প্রাগেও বসবাসের স্থানাভাব দেখা দিয়েছিল। ফিলিপ ফ্রাঙ্ক এবং তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক আইনষ্টাইনের পূর্বতন অফিসের আবাসে একটি কক্ষের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন, আইনষ্টাইন যদি হোটেলে থাকতেন, তা হলে আগন্তুকেরা এসে তাঁকে জ্বালাতন করে মারবে। সে কারণে তাঁরা সে রাত্রের মতো তাঁদের বাসকক্ষের একটি সোফায় তাঁকে যতদূর সম্ভব আরামে রাখার চেষ্টা করলেন। তাঁর গতিবিধি এক রাত্রের জন্যে সকলের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। পরের দিন সকালে আইনষ্টাইন তাঁর গৃহকর্তাকে জানিয়েছিলেন, 'গতরাত্রের মতো শান্তি তিনি এর আগে কখনও পাননি।'

আইনষ্টাইন যখন ফ্রাঙ্ক দম্পতির কাছে ছিলেন, তখন একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। ফ্রাঙ্ক দম্পতি তখন নববিবাহিত। ডঃ আইনষ্টাইন ও অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর বাড়িতে সবেমাত্র ফিরেছেন। এরপর যা ঘটেছিল সেটা অধ্যাপক ফ্রাঙ্কের নিজের জবানীতে শোনা যাক্। অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক তাঁর রচিত অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের জীবনীতে এই ঘটনা বিবৃত করেছেন :

'বাড়ি ফেরার পথে আইনষ্টাইন আমাকে বললেন : মধ্যাহ্ন-

ভোজের জন্যে আমরা কিছু জিনিস কিনে নিয়ে যাই, যাতে আপনার স্ত্রীকে রান্নার জন্যে বিশেষ বিব্রত না হতে হয়।' সে সময় আমার স্ত্রী ও আমি গ্যাসবার্নারে আমাদের খাদ্য প্রস্তুত করতুম—তথাকথিত বুনসেন বার্নার যা রাসায়নিক গবেষণাগারে পরীক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। যে বড় ঘরটিতে আমরা বাস করতুম এবং যেখানে আইনষ্টাইন ঘুমিয়েছিলেন, সেই একই ঘরে এটা ঘটেছিল। আমরা কিছুপরিমাণ বাছুরের যকৃৎ কিনে বাড়িতে এনেছিলুম। আমার স্ত্রী যখন গ্যাস বার্নারে যকৃৎ রান্না শুরু করলেন, আমি তখন আইনষ্টাইনের সঙ্গে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলুম। হঠাৎ আইনষ্টাইন শঙ্কিত হয়ে যকৃতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং আমার স্ত্রীর কাছে ছুটে গেলেন—'আপনি করছেন কি! জলেতে আপনি কি যকৃৎ সেদ্ধ করছেন? আপনি নিশ্চয় জানেন, জলের স্ফুটনাঙ্ক এত কম যে তাতে যকৃৎ ভাজা যায় না। মাখন বা চর্বির মতো উচ্চ স্ফুটনাঙ্ক-বিশিষ্ট কোন বস্তু আপনার ব্যবহার করা উচিত।'

'আমার স্ত্রী কিছুদিন আগে পর্যন্ত কলেজের ছাত্রী ছিলেন এবং রান্নার বিশেষ কিছু জানতেন না। আইনষ্টাইনের পরামর্শে আমাদের সেদিনের ভোজ রক্ষা পেয়েছিল। এই ঘটনাটা আমাদের সমগ্র বিবাহিত জীবনে একটি আনন্দের খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখনই আইনষ্টাইনের তত্ত্ব উল্লেখিত হত, আমার স্ত্রী বাছুরের যকৃৎ ভাজা সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

আইনষ্টাইনের সফর শুধু প্রাগেই সীমিত রইলো না, আরও বিস্তৃত হলো। পরবর্তী দশ বছরে তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেন—ইংলণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকা, জাপান, প্যালেস্টাইন, স্পেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পরবর্তীকালে আরও কয়েকবার তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। শেষবার যান নাৎসীদের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে।

তাঁর ভ্রমণসূচী ও বক্তৃতা শুধু বৈজ্ঞানিক বিষয়েই সীমিত ছিল না। বিজ্ঞানের মতো মানুষের কল্যাণসাধনেও তাঁর সমান আগ্রহ

ছিল। যদিও তাঁর অকপট সততা ও অপরের কল্যাণের জন্যে গভীর দরদের দরুন তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, কিন্তু তিনি কোনো-দিনই রাজনীতিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সত্যকার একজন মহান মানবপ্রেমিক।

ইহুদীদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। ইহুদী আন্দোলনের নেতা ডঃ চেইস ওয়াইজম্যান যখন প্যালেস্টাইনে একটি হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে মার্কিন সাহায্য লাভের জন্যে আইনষ্টাইনকে তাঁর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি সম্মত না হয়ে পারেন নি।

১৯২১ সালের এপ্রিলের এক রুক্ষ প্রভাতে 'এস্ এস্ রটারডাম' জাহাজটি নিউইয়র্ক বন্দরে এসে নোঙর করলো। মহান বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে অগণিত সাংবাদিক জাহাজে এসে ভীড় করলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আইনষ্টাইনকে এর আগে কখনও দেখেন নি। আইনষ্টাইনকে দেখতে কেমন? তাঁর সঙ্গে কথা বলা কি কঠিন হবে? একদল সচিবের দ্বারা তিনি কি পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবেন?—এধরনের নানা প্রশ্ন জেগেছিল তাঁদের মনে।

আইনষ্টাইন জাহাজের রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল একজন সঙ্গীতজ্ঞ বা অতিথি-শিল্পী। খুব লম্বা গড়ন নয়, তবে বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা। চোখ দুটি বেশ বড় ও কটা রঙের, কপাল চওড়া। বড়ো মাথা ও এলোমেলো চুল দেখে যে-কোনো জায়গায় তাঁকে সনাক্ত করা যায়। অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের পরনে একটা রঙ-ওঠা ধুসর বর্ণের রেন-কোট, মাথায় ছিল সচরাচর ব্যবহৃত কালো পশমের টুপি, একহাতে ব্রায়ার-নির্মিত পাইপ এবং অন্য হাতে তাঁর প্রিয় বেহালাটি।

সাংবাদিকেরা যখন একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন, তিনি ধৈর্য সহকারে তার উত্তর দিলেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন? কতদিন থাকবেন এখানে? যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে এখন পরিস্থিতি কেমন?

'আমি এখানে এসেছি', আইনষ্টাইন উত্তর দিলেন, 'একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। সে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে প্যালেস্টাইনের পুনর্গঠন এবং সেখানে একটি ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি মার্কিন জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করা।'

—'কিন্তু ডঃ আইনষ্টাইন, আপনি তো একজন বিজ্ঞানী। আপনি কি মনে করেন না বিজ্ঞানের প্রশ্ন সর্বপ্রথমে আসা উচিত?'

ডঃ আইনষ্টাইন মাথা নেড়ে বললেন, 'না, মানবতার প্রশ্নই সর্বাগ্রে আসা উচিত। যুদ্ধ বিজ্ঞানকে আঘাত করেছে বটে, কিন্তু মানুষের প্রভূত দুঃখকষ্ট সৃষ্টি করেছে। মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের দিকেই সর্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করতে হবে।'

আইনষ্টাইন-দম্পতিকে প্রহরাধীনে জাহাজ থেকে নিউইয়র্ক শহরের সিটি হলের সোপান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো।

সেখানে মেয়র হিলান তাঁদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। তাঁদের সম্মানার্থে শহরের ইহুদী অঞ্চলগুলি সজ্জিত করা হলো।

ডঃ আইনষ্টাইনকে দর্শনের জন্যে হাজার হাজার নিউইয়র্কবাসী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় ভীড় করে দাঁড়ালো এবং তিনি যখন তাদের সামনে দিয়ে চলে গেলেন তখন তারা হর্ষধ্বনি করে উঠলো। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো, নিউজ রিলে তাঁর চিত্র প্রদর্শিত হলো। এই হচ্ছেন মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন।

মহান অধ্যাপক ডঃ আইনষ্টাইন কে? তিনি আপেক্ষিকতা-বাদের আবিষ্কর্তা। আপেক্ষিকতা যে কি সেটা কেউ জানত বলে মনে হয় না। এই বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে তাঁর আগমন উপলক্ষে তারা উৎসবের আয়োজন করলো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনষ্টাইন মাত্র দু-মাস ছিলেন, কিন্তু কখনও এক মিনিট সময় অযথা নষ্ট করেন নি। তিনি এবং ডঃ ওয়াইজম্যান তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে যতজন সম্ভব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে এবং যতগুলি সম্ভব স্থানে গেলেন।

অধ্যাপক আইনষ্টাইন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি এবং নিউইয়র্কের সিটি কলেজে চারটি বক্তৃতা করলেন। ওয়াশিংটনে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ওয়ারেন হার্ডিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর প্রিন্সটনে বক্তৃতা দিতে গেলেন। নৈশভোজে যোগদান করলেন এবং একাধিক সভায় বক্তৃতা করলেন।

সর্বত্রই তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হলো। একটি প্রতিষ্ঠান তাঁকে ১০ হাজার ডলার দিলেন প্যালেস্টাইনে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং অপর একটি প্রতিষ্ঠান দিলেন ২৫ হাজার ডলার। ফিলাডেলফিয়ার একদল চিকিৎসক একটি মহতী সভায় তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ৫ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করে দিলেন।

অবশেষে মে মাসের শেষভাগে ডক্টর ও শ্রীমতী আইনষ্টাইন স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। এতদিন নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে ডঃ আইনষ্টাইন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় সুখী ও আনন্দিত হয়েছিলেন।

এই সুখকর অনুভূতি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তাঁরা বার্লিনে ফিরে আসার পর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠলো। এই সংকটের প্রকৃত কারণ ছিল ক্ষুধা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্ষুধা ও অনাহার প্রকট হয়ে উঠেছিল। রাস্তায় রাস্তায় দাঙ্গাহাঙ্গামা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, রাত্রে ঠগ ও দুষ্কৃতকারীরা রাজত্ব করত। কর্পোরাল হিটলার নিজের রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ শুরু করেছেন এবং তাঁর পতাকাতলে ব্রাউন শার্ট বা ঝটিকাবাহিনী ক্রমান্বয়ে শক্তি অর্জন করতে লাগলো। ১৯২২ সালের মধ্যে তিনি সহস্র অনুগামী সংগ্রহ করলেন। এই ঝটিকাবাহিনী একমাত্র পদ্ধতি যা জানত সেটি ছিল দুর্বৃত্তের কৌশলের নামান্তর মাত্র।

কোনো লোক সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরুলো, কিন্তু রাত্রে আর ফিরলো না। পরের দিন সকালে যখন তার প্রহৃত দেহ দেখা যাবে, তখন দেহে প্রাণ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে।

তাঁরা সাবধান করে, দিলেন, 'আরও একটু বেশি সতর্ক হয়ো, একলা কখনও বাইরে যেও না।'

আইনষ্টাইন কিন্তু এ কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন নিপীড়িত মানুষের জন্যেই, নিজের জন্য নয়।

তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যখন একটা বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটলো এবং পরিচিত একজনের প্রতি আঘাত হানা হলো তখনই শুধু তিনি, উপলব্ধি করতে পারলেন তাঁর নিজের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। ব্রাউন শার্ট দলের লোকেরা ডঃ র‍্যাথেনিউকে হত্যা করলো। যুদ্ধের সময় ডঃ র‍্যাথেনিউ ছিলেন জার্মানীর একজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। ধর্মবিশ্বাসে যদিও তিনি ছিলেন ইহুদী, কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম কোনো দেশপ্রেমিক জার্মানের চেয়ে কম ছিল না, বরং বেশিই ছিল বলা চলে। যুদ্ধ উপকরণ বোর্ডের অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। সেনাদলে খাদ্যদ্রব্য ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহে তিনি যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তার জন্যে জার্মানীর লোকেরা তাঁকে বলত 'জাদুকর'।

যুদ্ধের সময় তাঁর যে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন তার পুরস্কার-স্বরূপ যুদ্ধ শেষ হবার পর সরকার তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। এটি একটি অতুলনীয় সম্মান এবং জার্মান সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ। অ্যালবার্ট আইষ্টাইন, ডঃ ওয়াইজম্যান এবং ডঃ র‍্যাথেনিউ এই তিনজন কৃতী পুরুষ, মনীষী ও হৃদয়বেত্তা মিলে জার্মানীতে ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ইহুদী সমস্যা সম্পর্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন।

হিটলার ও তাঁর ঝটিকাবাহিনী (তাঁরা নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলতেন) যখন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে ডঃ র‍্যাথেনিউ-এর মনোনয়নের বিষয় জানতে পারলেন তখন তাঁদের ক্ষোভের অন্ত রইলো না। জার্মানদের জন্যেই জার্মানী। কোনো কাজে ইহুদী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন পরম বিরোধী। সরকারী দপ্তর থেকে ইহুদীদের হটাতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে ডঃ র‍্যাথেনিউ-এর নিয়োগ

তাঁরা একেবারেই সমর্থন করেন নি। কিন্তু হিটলারের দল তখনও পর্যন্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল এবং সদুপায়ে ডঃ র‍্যাথেনিউকে সরাতে পারছিল না।

ডঃ র‍্যাথেনিউকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী জানিয়ে ভীতি-প্রদর্শক পত্র প্রেরিত হতে লাগলো। এই ভীতি-প্রদর্শন তিনি উপেক্ষা করলেন। আইনষ্টাইনের মতো তিনিও নিজের বিপদ উপলব্ধি করতে পারতেন বলে মনে হত না।

এক গ্রীষ্মের দিনে ডঃ র‍্যাথেনিউ সরকারী দপ্তরে একটি সভায় যোগদানের জন্যে বাড়ি থেকে নির্গত হলেন। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন, তাঁর গাড়ি অনুসরণ করে একটি অজ্ঞাতপরিচয় মোটর গাড়ি আসছে এবং তাতে তিনজন আরোহী রয়েছে। সেই গাড়িটি তাঁর গাড়ির পাশাপাশি এলো। তারপরই তীক্ষ্ণ আওয়াজের সঙ্গে গুলীবর্ষণ ও সশব্দে হাতবোমা বিস্ফোরণ হতে লাগলো। মুহূর্তমধ্যেই জার্মানীর ইহুদী পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিহত হলেন এবং তাঁর মোটর গাড়িটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। অজ্ঞাতপরিচয় গাড়িটি তীব্রবেগে অদৃশ্য হলো।

এই মর্মান্তিক সংবাদ শুনে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! এ রকম ঘটনা যদি ঘটে, তা হলে তিনি যা ভেবেছিলেন তার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থা জার্মানীর। কি ধরনের রাজনৈতিক দল এভাবে তাদের অবাঞ্ছিত লোককে নিবিচারে হত্যা করতে পারে? এরকম রাজনৈতিক দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তা হলে জার্মানীতে কি ঘটবে?

এলসা ও মারগট শঙ্কিতচিত্তে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। তাঁরা জানতেন ইহুদীদের পক্ষে কাজ করার দরুন অ্যালবার্টের নাম হিটলার দলের কালো খাতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তা হলে কি এবার তাঁর পালা? কিন্তু এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ না করে আইষ্টাইন প্রতিদিন একাকী উণ্টারডেন লিণ্ডেন দিয়ে প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স-এ কাজ করতে যেতেন। তখন হাওয়ার দাপটে তাঁর লম্বা অবিন্যস্ত চুল এলোমেলো হয়ে যেত।

অন্যান্য দেশ থেকে আইনষ্টাইনের কাছে আমন্ত্রণ এলো—তিনি তাদের দেশে এসে নিরাপদে ও শান্তিতে কাজ করতে পারবেন। কিন্তু তিনি পালাতে রাজী হলেন না।

এলসা ও মারগট পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, যখন বিদেশ থেকে একটি আমন্ত্রণ আসায় আইনষ্টাইন বিদেশভ্রমণে সম্মত হলেন।

তাঁরা জানতেন, তিনি আবার বার্লিনে ফিরে আসবেন, কিন্তু এখন বিদেশে গেলে কিছুদিনের জন্য অন্তত তিনি বিপন্মুক্ত থাকতে পারবেন। তাঁর মতো একজন বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিকে স্পর্শ করতে ন্যাশনালিস্টরা কি সাহস করবে? কিন্তু ব্রাউন শার্টরা আইন-ষ্টাইনকে ঘৃণা করত। তাদের ঘৃণাব কারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পব তিনিই প্রথম জার্মান যিনি বিশ্বব্যাপী সম্মান অর্জন করেছেন। যুদ্ধেব পর সর্বপ্রথম যিনি জার্মানীকে গৌরবান্বিত করলেন তিনি একজন ইহুদী—এ ব্যাপারটা তারা বরদাস্ত করতে পারত না।

এ সমস্ত ব্যাপারে অ্যালবার্টের অন্তব যদিও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো, তবু তিনি বিজ্ঞানের কাজ বা ইহুদী আন্দোলনের কাজ বন্ধ রাখলেন না। আর একটি বক্তৃতা সফরে বা শুভেচ্ছা মিশনে বিদেশে যাবেন বলে তিনি স্থির করলেন। নিজের যতই অসুবিধা হোক না কেন, মানবতার কাজে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

একজন সুইস ইহুদী এবং ইংরেজ শ্রোতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডঃ আইনষ্টাইনের প্রথম সফরের পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে ইংলণ্ড পরিদর্শনের জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি সহজ ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবেমাত্র দু-বছর শেষ হয়েছে এবং জার্মানী ও জার্মানদের বিরুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের মনোভাব তখনও বেশ তীব্র।

ওয়াইজম্যান দম্পতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন এবং আইনষ্টাইন দম্পতির প্রত্যাবর্তনেব সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। অধ্যাপক আইনষ্টাইন বার্লিনে আকাডেমি অফ সায়েন্স-এ তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে ব্যগ্র হয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে তিনি এবং শ্রীমতী আইনষ্টাইন উপলব্ধি করলেন, ইংলণ্ডে গেলে তাঁরা ইহুদী আন্দোলনের জন্যে কিছু করতে সমর্থ হবেন।

১৯২১ সালের ১১ জুন লণ্ডনের অভিজাত পত্রিকা 'টাইমস্'-এ নিম্নোক্ত সামাজিক সংবাদটি প্রকাশিত হলো :

'অধ্যাপক এবং শ্রীমতী আইনষ্টাইন ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ২৮ কুইন অ্যানেস-গেটস্থ ভাইকাউণ্ট হ্যালডেনের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন।'

এই সংক্ষিপ্ত সমাচারটির পশ্চাতে আরও অনেক কাহিনী ছিল।

লর্ড হ্যালডেন তখন ইংলণ্ডের একজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর আবাসে অতিথি হওয়ার এবং তাঁর কাছে অভ্যর্থনা লাভের অর্থ ইংলণ্ডের অধিকাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা লাভ করা।

ইংলণ্ডে আসার আগে আইনষ্টাইন দম্পতি উপলব্ধি করতে পারেন নি, এই লর্ড হ্যালডেন কি বিরাট ধনী। এখানে এসে তাঁরা দেখলেন তাঁদের জন্যে একেবারে রাজসিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে যে ঘরগুলিতে তাঁদের বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলি বার্লিনে তাঁদের নিজস্ব সমগ্র বাসকক্ষের চেয়েও বড়ো। ডঃ আইনষ্টাইন যখন দেখলেন তাঁর তদারক করবার জন্যে একজন সুসজ্জিত খানসামা নিযুক্ত করা হয়েছে, তিনি একটু ঘাবড়ে গেলেন। শ্রীমতী আইনষ্টাইন সর্বদাই এ ধরনের সমস্যার অতি চমৎকারভাবে সমাধান করতে পারতেন। তিনি এগিয়ে এসে তাঁর স্বামীকে রক্ষা করলেন এবং হৈ চৈ না করে শান্তভাবে খানসামাটিকে বুঝিয়ে দিলেন তাকে তাঁদের প্রয়োজন হবে না।

আইনষ্টাইন-দম্পতির সম্মানার্থে লর্ড হ্যালডেন এবং তাঁর কন্যা একটি ভোজসভার আয়োজন করলেন। এই আয়োজন অতি চমৎকার হয়েছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ভোজসভায় যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ এবং রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক এডিংটন। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এই সভায় যোগদান করতে না পারায় ব্যক্তিগত দুঃখ প্রকাশ করে একটি পত্র প্রেরণ করেন।

লর্ড হ্যালডেনের এই সম্বর্ধনার ফলস্বরূপ আইনষ্টাইনের প্রতি ইংলণ্ডবাসীর জার্মানবিরোধী মনোভাব ক্রমশ দূর হতে লাগলো। আইনষ্টাইন-দম্পতির কাছে অবিরত আমন্ত্রণপত্র আসতে লাগলো।

ওয়াডহাম কলেজের ডঃ লিণ্ডেম্যানের অতিথি হিসাবে আইনষ্টাইন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসমূহ ও প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করলেন। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। ইংলণ্ডে থাকাকালীন তিনি সর্বাপেক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন লণ্ডনের কিংস কলেজে। এই বক্তৃতাটি গুরুত্ব অর্জন করেছিল বিষয়বস্তুর জন্যে নয়, আসল গুরুত্ব ছিল বক্তৃতাকালে যা ঘটেছিল তারই জন্যে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রার আগেই তিনি এই আমন্ত্রণটি পান। কিংস কলেজের হলে আপেক্ষিকতাবাদের উদ্ভাবকের বক্তৃতা শোনবার জন্যে বিপুল শ্রোতা সমবেত হয়েছিল। মঞ্চের উপর ছিলেন লর্ড হ্যালডেন, কুমারী হ্যালডেন, শ্রীমতী আইনষ্টাইন, অধ্যাপক আইনষ্টাইন এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। লর্ড হ্যালডেন শ্রোতার কাছে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের পরিচয় প্রদান করেন।

সমস্ত হল-ঘরটিতে গভীর উত্তেজনা বিরাজ করছিল, কারণ অনেকে ভেবেছিল আইনষ্টাইন জার্মান হওয়ায় কিছু গোলমাল দেখা যেতে পারে।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীকে জার্মান ভাষায় বললেন, 'বিনা গোলযোগে এই সভাটি সম্পন্ন হতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে, কারণ আইনষ্টাইন জার্মান ভাষাতেই বক্তৃতা করবেন।'

ওই ভদ্রলোকের কাছাকাছি একজন ইংরেজ বসেছিলেন। তিনি তাঁকে জার্মান ভাষায় বললেন, 'না, কোনো গোলমালই হবে না। এখানে যারা এসেছে তারা প্রত্যেকেই আগে থেকে জেনেছিল, বক্তৃতাটি জার্মান ভাষাতে প্রদত্ত হবে।'

'কিন্তু এই তরুণ শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আপনি কি মনে করেন, এরা সকলেই আপেক্ষিকতাবাদের মতো দুরূহ বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে এসেছে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি উত্তর দিলেন, 'এরা সকলেই ছাত্র। তারা একজন মহাবিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছে। তা ছাড়া, জার্মান ভাষা বোঝে এমন ইংরেজ ছাত্রের সংখ্যা সাধারণত যা ভাবা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি।'

লর্ড হ্যালডেন যখন আসন থেকে উঠে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের পরিচিতি দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন, তখন শ্রোতাদের গুঞ্জনধ্বনি থেমে গেল। শ্রোতারা ভদ্র, সম্পূর্ণ ভদ্র, কিন্তু অতিমাত্রায় নিরুৎসাহিত ছিল। হতে পারে আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু তিনি একজন জার্মান এবং এটা তারা মার্জনা করতে পারে না।

লর্ড হ্যালডেন আরম্ভ করলেন, 'ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিভাধরকে সংবর্ধনা জানাতে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।' তিনি আরও দশ মিনিট কাল বক্তৃতা করলেন, কিন্তু বক্তৃতার মধ্যে একবারও উল্লেখ করলেন না যে আইনষ্টাইন একজন ইহুদী বা একজন জার্মান। আইনষ্টাইন সেখানে আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে বলবেন। লর্ড হ্যালডেন শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আইনষ্টাইন হচ্ছেন 'বিংশ শতাব্দীর নিউটন'।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রোচিত প্রশংসাধ্বনি এবং কিছু পরিমাণ হর্ষধ্বনি উত্থিত হলো। কিন্তু অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন শ্রোতাদের প্রকৃত মনোভাব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, তারা আন্তরিকভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না।

তিনি যখন সৌজন্যস্বরূপ লর্ড হ্যালডেনের প্রতি একটু নত হয়ে বক্তার টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন, তখন সমস্ত হল-ঘরে একটা চাপা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু অধ্যাপক আইনষ্টাইন বক্তৃতা শুরু করামাত্র সমস্ত গুঞ্জন থেমে গেল।

আইনষ্টাইন শান্ত নম্র প্রকৃতির মানুষ—নিজের জন্যে কারো কাছ থেকে কিছু তিনি প্রত্যাশা করতেন না। তিনি সেখানে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনা করতে উপস্থিত হয়েছেন। যখনই তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনা করতেন, তাঁর চোখে একটা স্বপ্নালু আবেগ নেমে আসত এবং নিজের চিন্তার মধ্যে তিনি আত্মসমাহিত হয়ে যেতেন।

প্রতিভাধরের উপরেও তিনি আরও কিছু ছিলেন। লর্ড হ্যালডেন তাঁর সম্বন্ধে যথার্থই বলেছিলেন, তাঁর মধ্যে কবিজনোচিত সৃজনী-কল্পনা আছে।

আইনষ্টাইন তাঁর মার্জিত শ্রোতাদের জানালেন, যে দেশে সুমহান পদার্থবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের আবির্ভাব হয়েছিল সেদেশের রাজধানীতে বক্তৃতা করতে এসে তিনি গভীর আনন্দ অনুভব করছেন। তিনি নিউটন—ইংলণ্ডের নিউটন সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, বিশ্বের সকলের জন্যেই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো জাতিধর্মের সীমারেখা নেই। নিউটন মহান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, যার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব উপকৃত হয়েছে।

আইনষ্টাইনের এই কথা শ্রোতাদের মন স্পর্শ করলো—তাদের বিরোধী মনোভাব কিছুটা অন্তর্হিত হলো।

ডঃ আইনষ্টাইন তখন চল্লিশের কোঠায়, চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে এবং চেহারায়ও একটু বার্ধক্যের ছাপ দেখা দিয়েছে। কিন্তু যাদের সামনে তিনি বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়েছেন, তারা তাঁর সম্বন্ধে অন্যকিছু ভাবতে আরম্ভ করেছে। তাঁর মধ্যে এমন একটা মাধুর্য আছে যা মানুষকে বন্ধুভাবে কাছে টেনে নেয়।

আইনষ্টাইনের মনে যে সংশয় ভাব জেগেছিল, তাঁর প্রিয় বিষয় আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তা অন্তর্হিত হয়ে গেল। তিনি মহাবিশ্বে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন এবং শ্রোতাদেরও তাঁর সঙ্গে টেনে নিলেন। শ্রোতারা ভুলে গেল যে, তারা ইংরেজ শ্রোতা এবং তাদের সামনে একজন জার্মান বক্তৃতা করছেন। সব কিছুই তারা ভুলে গেল, তাদের সমস্ত মন কেড়ে নিল বক্তার চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্য ও তাঁর প্রতিভার স্পর্শ।

তাঁরা নিজেরা বিজ্ঞানী এবং বক্তাও একজন বিজ্ঞানী, কিন্তু তাঁদের চেয়ে তাঁর জ্ঞান অনেক গভীর এবং তাঁর কাছে তাঁরা শিখতে পারেন।

অধ্যাপক আইনষ্টাইন যখন বক্তৃতা শেষ করলেন, সমস্ত হল-ঘরটি প্রশংসা ও হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল। তিনি শ্রোতাদের অন্তর সম্পূর্ণ জয় করে নিয়েছেন, তাদের মন থেকে বিরূপ মনোভাবের শেষ রেশ-টুকু পর্যন্ত মুছে গেছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিশ্বপথিক

নাৎসীরা তাদের নিজস্ব ভঙ্গীতে আইনষ্টাইনকে নিয়ে অকারণ হৈ চৈ করছিল। জার্মানীকে ইহুদী-প্রভাবমুক্ত করার জন্যে তারা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তারা একবারও ভেবে দেখে নি যে এভাবে কত মূল্যবান ব্যক্তিকে জার্মানী হারাচ্ছে। তারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো, আইনষ্টাইন একজন বিপজ্জনক লোক। আইন-ষ্টাইনের মতো শান্ত নিরাসক্ত লোকে কি করে যে বিপদজ্জনক হতে পারেন তা তারা ব্যাখ্যা করতে পারত না। কিন্তু তাঁকে আক্রমণ করতে তারা পেছপা হত না।

হত্যার আশঙ্কায় অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে একাধিকবার জার্মানী ত্যাগ করে যেতে হয়েছিল। তাঁর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই কয়েক বার ইচ্ছা করে তাঁকে জার্মানীর বাইরে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি জোর করে আবার বার্লিনে তাঁর নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসেছিলেন। বার্লিনে তাঁর বিশেষ কাজ আছে—সে কাজ বিজ্ঞানের, ইহুদীদের ও শান্তির জন্যে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বে শান্তিরক্ষার জন্যে জাতিসঙ্ঘ (লীগ অফ নেশানস) গঠিত হয়। প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে মিত্রশক্তি শান্তিচুক্তি এবং জার্মানী ও অন্যান্য মধ্য ইউরোপীয় শক্তির ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিলিত হলেন এবং উনিশজন ব্যক্তির একটি বিশেষ কমিটি সেখানে নিযুক্ত হলো। তাঁদের

মধ্যে দশজন ছিলেন বৃহৎ শক্তিত্রয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধি এবং অবশিষ্ট নয়জনকে গ্রহণ করা হয় ক্ষুদ্র মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে সভাপতি করে উনিশ ব্যক্তির কমিটি যুদ্ধসংঘটনের রাজনীতিক বাদবিসম্বাদ প্রতিরোধকল্পে ১৯২১ সালে জাতিসঙ্ঘ গঠনের জন্যে মিলিত হলেন।

জাতিসঙ্ঘ হচ্ছে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে একটি বিশ্ব সরকার গঠনের প্রকৃতপক্ষে প্রথম প্রচেষ্টা এবং শুধুমাত্র সে কারণে এটি সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিরাট পদক্ষেপ। সর্বশেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, জাতিসঙ্ঘের বিশ্বে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। যাঁরা এই সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন তাঁদের ভুলভ্রান্তি এবং বিশ্ববাসীর এই সঙ্ঘের গুরুত্ব উপলব্ধির অক্ষমতার দরুনই অসাফল্য ঘটেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব পর সম্মিলিত বাষ্ট্রপুঞ্জ গঠনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব সরকার স্থাপনার আর একটি প্রচেষ্টা হয়েছে। যাঁরা এই সাম্মলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিকল্পনা ও সংগঠনেব জন্যে মিলিত হন তাঁরা জাতিসঙ্ঘেব অসাফল্যের মূল কারণগুলি উপলব্ধি কবেছিলেন এবং পূর্বের শিক্ষালাভেব দরুনই তাঁরা অনেক সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পাবছেন।

১৯১৯-১৯২০ সালে জাতিসঙ্ঘ গঠিত হয় এবং তাতে প্রশাসনেব তিনটি বিভাগ ছিল—আইনপ্রণয়ন, কার্যনির্বাহ ও বিচার।

অ্যাসেম্বলি ছিল আইন-প্রণয়ন সভা। এই সভায় প্রত্যেক সদস্য-জাতি তিনজন করে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারতেন এবং ভোট দিতে পাবতেন মাত্র একটি। কাউন্সিল ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সংস্থা এবং এই সংস্থাকে জাতিসঙ্ঘের কার্যনির্বাহক সমিতি বলা হত। ফ্রান্স, জাপান, জার্মানী, ইতালী এবং গ্রেট ব্রিটেন এই পাঁচটি বৃহৎ শক্তিই কেবল কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য ছিল এবং ক্ষুদ্র শক্তিগুলি পর্যায়ক্রমে এতে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেত। পঞ্চ বৃহৎশক্তির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্থায়ী সদস্য পদ দেবার প্রস্তাব মূল পরিকল্পনায় ছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘে যোগদানে

অসম্মত হওয়ায় পরিকল্পনায় বহু রদবদল করতে হয়েছিল। বিচার বিভাগের ভার ন্যস্ত ছিল আন্তর্জাতিক ন্যায়ের স্থায়ী বিচারালয়ের (পারমানেণ্ট কোর্ট অফ ইণ্টারন্যাশন্যাল জাস্টিস) উপর। সদস্য দেশগুলি থেকে বিচারপতিদের নিয়ে এই স্থায়ী বিচারালয় গঠিত হয়েছিল। এই স্থায়ী বিচারালয়ে সীমান্ত-বিরোধ, চুক্তি-সমস্যা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা হত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক-কালীন রাষ্ট্রসচিব মিঃ এলিহু রুট ছিলেন স্থায়ী বিচারালয় গঠন পরিকল্পনার সভাপতি।

জাতিসঙ্ঘের সংগঠন কাঠামোর কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু জাতিসঙ্ঘ সফল হয় নি। কেন হয় নি? অসাফল্যের কারণ ছিল বহু। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে এর সংগঠনের মূলনীতিই ছিল ভুল।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয় তিনটি প্রশাসন বিভাগ এর ছিল সত্য—আইন প্রণয়নের বিভাগ, আইন কাজে পরিণত করার বিভাগ এবং আইন ব্যাখ্যা করার বিভাগ। কিন্তু এ সমস্তই ছিল শুধু কাগজে-কলমে। বাস্তবক্ষেত্রে কোনো কার্যনির্বাহক বিভাগ ছিল না এবং আইন বাস্তবে রূপায়ণের কোনো ব্যবস্থাও ছিল না।

আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারত, কিন্তু সে আইন কাজে পরিণত করার কেউ ছিল না। আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিচার করতে পারত, কিন্তু সে বিচারকে কার্যকর করার কোনো ক্ষমতা তার ছিল না।

জাতিসঙ্ঘের অসাফল্যের আর একটি কারণ হচ্ছে তার ক্ষমতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্ষতিপূরণ ও সীমান্ত পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার তার ছিল না।

অসাফল্যের তৃতীয় কারণটিই হচ্ছে আসল কারণ এবং সেটা হলো এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই জাতিসঙ্ঘে যোগদান করে নি।

কেবল দুটি অতি গুরুত্বসম্পন্ন দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া জাতিসঙ্ঘে যোগদান করে নি। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, মিঃ এলিহু রুট ও অন্যান্য মার্কিন রাজনীতিজ্ঞ জাতিসঙ্ঘ গঠনে সহায়তা করেন এবং সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কিন্তু এঁদের এত অবদান সত্ত্বেও মার্কিনবাসীরা জাতিসঙ্ঘের সদস্য পদ গ্রহণে অসম্মত হয়েছিল।

কিন্তু ১৯২০ সালের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, জাতিসঙ্ঘের অসাফল্যের কথা তখন ভাবা যায় নি, বরং বিশ্বে শান্তি স্থাপনের উচ্চাশাই তখন জেগেছিল। ১৯২২ সালের মধ্যে জাতিসঙ্ঘের কাজ পুরোদমে চালু হয় এবং বিশেষ বিশেষ বিষয় বিবেচনার জন্যে ছোট ছোট সংস্থা সৃষ্টি হয়। শান্তির স্বার্থে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের সম্মিলিত করার প্রয়াসে মনীষী সহযোগিতা সম্পর্কিত কমিটি (কমিটি অফ ইনটেলকচুয়াল কো-অপারেশন) গঠিত হয়। সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এই কমিটি উন্নততর সংগঠন পর্যালোচনা করতে পারবেন বলে অনুমিত হয়েছিল। কমিটির কাজ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল—বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক, সাহিত্য, ললিত কলা, আইন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে দুটি বিভাগ ছিল। কমিটির বিজ্ঞান বিভাগটি চোদ্দটি দেশ থেকে বিশ্বের বিশিষ্টতম বিদ্বজ্জনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তাঁর মধ্যে ছিলেন অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন, পোলাণ্ডের মাদাম কুরী, ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজির ডক্টর রবার্ট এ মিলিক্যান এবং লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর লোরেনৎস্। শেষোক্ত তিনজনই ছিলেন ডঃ আইনষ্টাইনের বন্ধু। তাঁরা একত্রে জেনেভায় বহু সময় অতিবাহিত করেন।

আইনষ্টাইনের চরিত্রের একটি গুণ সর্বদা স্মরণ করা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে তাঁর গভীর সততা। জাতিসঙ্ঘের স্থায়ী দপ্তরের সদস্যরা অল্পকালের মধ্যে তাঁর এই গুণের পরিচয় পেয়ে একান্ত বিব্রত বোধ করেছিলেন। জাতিসঙ্ঘের সভায় তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করার

প্রায় এক বছরের মধ্যে আইনষ্টাইন জাতিসঙ্ঘের বিশ্বে শান্তিরক্ষার যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে থাকেন।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন: 'বর্তমান শক্তিবর্গগুলি অতি নৃশংস কাজ করলেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের কোনো ক্ষমতা জাতিসঙ্ঘের আছে বলে মনে হয় না।'

আইনষ্টাইন মনে করতেন, শান্তিরক্ষার ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। একথা তিনি অসংকোচেই ব্যক্ত করতেন। জাতিসঙ্ঘের ব্যবস্থা অবলম্বনের কোনো ক্ষমতা নেই—তার সদস্যরা শুধু মিলিত হয়ে আলোচনা করতে পারেন। জাতিসঙ্ঘের কমিশনে একবছরকাল কাজ করার পর অবশেষে নিরাশ হয়ে আইনষ্টাইন সঙ্ঘের সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

পত্রে তিনি লিখেছিলেন: 'একজন বিশ্বস্ত শান্তিবাদী হিসাবে জাতিসঙ্ঘের সঙ্গে কোনোপ্রকার সংযোগ রাখা আমার ভালো বলে মনে হয় না।'

আইনষ্টাইন তাঁর ডেস্কে ও কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলেন। কিন্তু বিশ্ববাসী তাঁকে বিশ্রামের অবকাশ দিতে চায় নি। জাতিসঙ্ঘ থেকে তাঁর পদত্যাগের কথা শুনে জার্মান ন্যাশন্যালিস্টরা এত উল্লসিত হয়েছিল এবং জাতিসঙ্ঘের অবমাননার জন্যে এই সংবাদটি এত ব্যাপকভাবে প্রচার করছিল যে, ন্যাশন্যালিস্টদের মুখ বন্ধ করবার জন্যে ১৯২৪ সালে ডঃ আইনষ্টাইন ঘোষণা করলেন, বুদ্ধিজীবী সহযোগিতা সম্পর্কিত কমিটিতে তিনি পুনরায় যোগদান করবেন।

তখন বিশ্বে কোনো শান্তি ছিল না এবং জার্মানীতে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের মনেও কোনো শান্তি ছিল না। কারণ ইহুদীবিরোধী নির্যাতন এবং ভীতি প্রদর্শন নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলছিল। জাপানে বক্তৃতাদানের জন্যে তাঁর কাছে যখন আমন্ত্রণ এলো, সেটা গ্রহণ করবার জন্যে এলসা তাঁকে অনুরোধ করলেন। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে তিনি জার্মানীর বাইরে যেতে পারবেন এবং যতদিন এই ভ্রমণ স্থায়ী হবে ততদিন অন্ততঃ তিনি নিরাপদে থাকতে পারবেন।

তাঁর নিজের জন্মভূমি ছাড়া বিশ্বের অপর যে কোনো স্থান তাঁর পক্ষে তখন নিরাপদ বলে মনে হয়েছিল।

১৯২২ সালের শেষভাগে আইনষ্টাইন দম্পতি ফ্রান্সে যাত্রা করলেন এবং সেখানে মার্সেলস থেকে একটি জাপানী স্টীমার যোগে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিলেন। এই শান্তিপূর্ণ সমুদ্রযাত্রাটি অধ্যাপক আইনষ্টাইনের কাছে অবকাশের প্রায় সমতুল্য বলে মনে হয়েছিল। স্টীমারটি যখন ভূমধ্যসাগরে যাত্রা শুরু করলো, তখন তাঁরা দেখলেন, জাহাজে তাঁদের জন্তে সম্ভাব্য সকল রকম আরামের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই ভ্রমণটি তাঁকে পূর্বাপেক্ষা বিত্তশালী করে তুলেছিল। এই বিত্তলাভ আর্থিক দিক দিয়ে নয়—লাভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে ও উপলব্ধিতে। কারণ এই দীর্ঘ মন্থর সমুদ্রযাত্রায় তিনি পূর্বের অদেখা নানারকম ও নানা বর্ণের লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের বিচিত্র সাজপোশাক ও রীতিনীতি, সম্পদ ও দারিদ্র্যের পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি প্রাচ্য দেশীয় সঙ্গীত শ্রবণ করেন এবং জনাকীর্ণ কোলাহলপূর্ণ পথ-ঘাট-বাজার দর্শন করেন।

ভূমধ্যসাগর, সুয়েজ খাল এবং লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে তাঁরা ভারত মহাসাগরে এসে পড়লেন। সিংহল দ্বীপের কলম্বো বন্দরে তাঁরা নেমেছিলেন। তারপর পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে সিঙ্গাপুর এবং সেখান থেকে দক্ষিণ চীনা সাগরের মধ্য দিয়ে হংকং চীনে তাঁরা উপনীত হলেন।

যাত্রাপথে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের একটিমাত্র অনুযোগ ছিল এবং সে অনুযোগটা তাঁর চিরাচরিত। তাঁর মতো একজন অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে নিয়ে এত সম্মান প্রদর্শন, এত অভ্যর্থনা, এত উপহারদান. কেন? তিনি এবং শ্রীমতী আইনষ্টাইন এক মুহূর্তকালও একান্তে ভ্রমণ ও দর্শনীয় বস্তু দেখার অবকাশ পেতেন না। যেখানেই তাঁরা যেতেন তাঁদের ব্যবহারের জন্তে মোটরগাড়ি বা অন্য কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করা হত। এর ওপর ছিল ভোজ-সভা ও ফটো তোলার হিড়িক। তাঁর চারধারে যে সমস্ত ভাষায়

কথাবার্তা হত তার একটিও তিনি জানতেন না। তাঁকে জার্মান ভাষাতেই উত্তর দিতে হত এবং তাঁর পাশাপাশি একজন দোভাষী থেকে সব তর্জমা করে দিতেন।

জাহাজটি পূর্বাভিমুখে ওসাকা উপসাগরে অগ্রসর হয়ে জাপানের কোবে বন্দরে নোঙর করার আগে আর একটিমাত্র বন্দর চীনের সাংহাই-এ থেমেছিল।

অবশেষে ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে তাঁরা যখন কোবে বন্দরে অবতরণ করলেন, তখন উৎসব সমারোহ ও সম্বর্ধনা সত্যসত্যই আরম্ভ হলো। তাঁদের আগমনের সম্মানে জাপানে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষিত হয়। আইনষ্টাইন দম্পতিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন স্বয়ং জাপানের সম্রাজ্ঞী। তাঁদের পানাহারে ও ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। জাপানের প্রত্যেকটি দর্শনীয় স্থানে তাঁদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হলো। প্যাগোডা সৌধ, ধান্যক্ষেত্র, ফুজিয়ামা পর্বত, ক্রিস্যানথম্যাম উদ্যান—সব কিছুই তাঁরা দেখেছিলেন। এমব্রয়ডারী সিল্ক, কাজ-করা হাতির দাঁত, চীনামাটির মূর্তি তাঁদের উপহার দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে তিনি নতুন-ভাবে বুঝতে লাগলেন। তিনি যেমন করেছেন, সেইভাবে যদি প্রত্যেক ইউরোপীয়, প্রত্যেক জার্মান পরিভ্রমণ করতেন এবং নিজের চোখে সব কিছু দেখতেন, তা হলে কত ভালো হত!

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনষ্টাইন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতাগুলি তাঁকে জার্মান ভাষায় বলতে দেওয়া হয়েছিল, তবে জাপানী সরকার তাঁর জন্যে একজন যুবককে সচিব ও দোভাষীরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে জাপানী বিজ্ঞানীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পৃথিবীর অন্যত্র ইতিপূর্বে যা ঘটেছে—অনুরূপভাবে এখানেও তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্যে অগণিত জনতা বক্তৃতাকক্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সঙ্গীতের মতো বিজ্ঞানও বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মধ্যে সেতু বন্ধন করে এবং সকল মানুষকে ভাই বলে কাছে টেনে নেয়।

প্রায় তিন মাস পরে আইনষ্টাইন দম্পতি অসংখ্য উপহার-উপঢৌকন নিয়ে জাপান পরিত্যাগ করলেন। জাপানে থাকাকালীন তাঁরা যে প্রীতি-ভালবাসা লাভ করেছিলেন সেকথা স্মরণ করে বিদায়কালে তাঁদের চক্ষু সজল হয়ে উঠলো।

তারপর শুরু হলো স্বদেশাভিমুখে শান্তিপূর্ণ সমুদ্রযাত্রা।

ফেরার পথে তাঁরা প্যালেস্টাইনে নেমেছিলেন। ১৯২৩ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি তাঁরা মিশরের পোর্ট সৈয়দে অবতরণ করেন এবং সেখান থেকে সরাসরি জেরুজালেম শহরে চলে যান।

প্যালেস্টাইন একটা ক্ষুদ্র ভূখণ্ড। আয়তনে প্রায় ভেরমণ্ট রাজ্যের সমান। তার তিনদিক বৃহৎ আরব রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পশ্চিম দিকে ভূমধ্যসাগর। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ইহুদীদের শহর তেল আভিভ এবং দেশটির প্রায় মাঝখানে জেরুজালেম শহর।

কী এক অনন্যসাধারণ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটি। ইহুদীদের ইতিহাস অনুসারে ইহুদীরা সেখানে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ১৭০০ বছর আগে থেকে বসবাস করছিল এবং খ্রীঃ পূঃ ৭০ শতাব্দীতে রোমানরা শেষকালে এই দেশটিকে অধিকার করে নেয়। ১৫১৭ সালে অটোম্যান তুর্কীরা প্যালেস্টাইনকে পুনরায় অধিকার করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তারা দখল করে রেখেছিল।

কিন্তু ইহুদীরা তাঁদের নিজ জন্মভূমিতে ফিরে যাবার জন্যে সর্বদাই ব্যগ্র ছিলেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে হোক বা মনে মনে হোক তাঁরা সেটা কামনা করতেন। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড বেলফোর প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের একটি 'জাতীয় ভূমি' দেবার প্রস্তাবে সমর্থন জানান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এ প্রস্তাবে সম্মত হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসঙ্ঘ গ্রেট ব্রিটেনকে এই ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং সেই অনুযায়ী একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি প্যালেস্টাইনের শাসনভার গ্রহণ করেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থার কোনোটিই সমস্যার সমাধান করতে পারল না, বরং আরব-ইহুদী বিরোধ বেড়েই চললো এবং ক্রমশ অবস্থা

খারাপ হয়ে দাঁড়ালো। সন্নিকটস্থ অঞ্চলে আরব রাষ্ট্রগুলির নিয়ন্ত্রিত বিপুল খনিজ তৈল-সম্পদ রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই খনিজ তৈল যুদ্ধে জয়পরাজয় নির্ধারণের একটি উপাদানে পরিণত হলো। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন এক উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন। ইহুদীদের প্রতি ন্যায়বিচারের তাঁরা পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে আরব রাষ্ট্রগুলির খনিজ তৈলও তাঁদের প্রয়োজন ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের (United Nations) একটি বিশেষ কমিটি ইহুদী ও আরবদের মধ্যে প্যালেস্টাইন বিভাগ অনুমোদন করেন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু আরবরা এই পরিকল্পনায় সম্মত হতে পারলো না। ফলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আবার শুরু হলো।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে প্যালেস্টাইন বিভাগ পরিকল্পনা গৃহীত হলো। কিন্তু ১৯৪৮ সালের জুন পর্যন্ত আরব ও ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিলো। তারপর রাষ্ট্রপুঞ্জের সনির্বন্ধ অনুরোধে উভয় পক্ষই চার সপ্তাহের জন্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হবার ঠিক দু'সপ্তাহ পূর্বে ১৯৪৮ সালের ১৫ মে তারিখে স্বাধীন স্বতন্ত্র ইস্রায়েল প্রজাতন্ত্র জন্মলাভ করে এবং ডঃ চেইস ওয়াইজম্যান এই প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন।

১৯২৩ সালের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। আইনষ্টাইন দম্পতি যখন প্যালেস্টাইন পরিদর্শন করেন, তখন যুদ্ধবিগ্রহে এই ভূখণ্ড বিধ্বস্ত হয় নি। দু'বছর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের সময় আইনষ্টাইন যে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন, প্যালেস্টাইনে এসে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়েছিল তাঁর। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্যালেস্টাইনের অলিভ গিরি-শিখরে (বর্তমানে স্কোপাস পর্বত নামে অভিহিত) অবস্থিত। এই পাহাড়টি জেরুজালেমের পুরাকালের প্রস্তর-প্রাচীর-ঘেরা প্রাচীন

অঞ্চলের ঠিক উত্তরে এবং পুণ্যভূমির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। মেঘমুক্ত দিনে দেখা যায়, পূর্বদিকে মোয়াব পর্বতমালা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং জর্ডন নদী ধীরগতিতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়ে ডেড সি-তে মিলিত হয়েছে। উত্তরে হাইফা বন্দর এবং পশ্চিমে সুবিশাল সমতল ভূমি ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রকৃতপক্ষে ১৯১৮ সালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়ে যায় এবং ১৯২৫ সালে নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ ও ভবন উৎসর্গীকৃত হয়। কিন্তু কোনো সময়েই এর প্রসার থেমে থাকে নি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের মধ্যে পনেরোটিরও অধিক ভবন নির্মিত হয়েছে এবং আনুমানিক এক সহস্র ছাত্রছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সর্বজাতি ও সর্বধর্মের জন্যে উন্মুক্ত এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আরবরাও আছে।

মেডিক্যাল স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ গৌরবের বস্তু। এখানে শুধু যুবকদের চিকিৎসক হবার শিক্ষা দেওয়া হয় না, অধিকন্তু পৃথিবীর উক্ত অঞ্চলে ব্যাপক রোগসমূহ পর্যালোচনা ও তা নির্মূল করার এক দুঃসাহসিক কাজ করেছে এই মেডিক্যাল স্কুলটি। যে সকল রোগ জয়ের জন্যে কঠিন আয়াস এখানে করতে হয়েছে তার মধ্যে ম্যালেরিয়া অন্যতম। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবর্ধক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এই স্কুল সহায়তা করেছে। শস্যাদির ফলন বৃদ্ধির জন্যে সেচব্যবস্থা ও জমিকে উর্বর করে তুলতে কৃষিবিদ্যালয় কঠিন পরিশ্রম করেছে এবং তার ফলে অনেক জমি, যা একদা অনাবাদী হয়ে পড়েছিল, তা এখন উর্বর চাষাবাদের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

১৯২৩ সালে আইনষ্টাইন হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করতে এলেন। এই প্রসঙ্গে প্যালেস্টাইনের তদানীন্তন ব্রিটিশ হাই-কমিশনার সার হার্বার্ট সামুয়েল বলেছিলেন : 'হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একটি শুভ লক্ষণ যে এখানে প্রথম বক্তৃতা প্রদান করছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী।'

হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে অধ্যাপক আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দু'বছর পূর্বে অধ্যাপক আইনষ্টাইন এই বক্তৃতা প্রদানের জন্যে মঞ্চের ওপর উঠে এলেন এবং হিব্রুতে কয়েকটা কথা বলে বক্তৃতা শুরু করলেন। হিব্রু সম্পূর্ণ বলতে না পারায় বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ তিনি ফরাসী ভাষাতে পেশ করেছিলেন।

জেরুজালেম থেকে আইনষ্টাইন-দম্পতি ইহুদীদের শহর তেল-আভিভ পরিদর্শন করতে গেলেন। সেখানে আধুনিক ঘর, কালোপযোগী সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ক্রমবর্ধমান ব্যবসাবাণিজ্য এবং উন্নত ধরনের স্কুল দেখে আইনষ্টাইন আনন্দিত হয়েছিলেন। হাই স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে তিনি ক্লাশে যোগদান করলেন। আর এক দফা সংবর্ধনা ও সম্মাননা-সভায় তাঁকে যোগ দিতে হলো।

প্যালেস্টাইন ভ্রমণ শেষ হবার পর অধ্যাপক আইনষ্টাইন লিখেছিলেন: 'প্যালেস্টাইনে অবস্থানকালে যাঁরা আমার প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেছিলেন তাঁদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে আমি কিছু লিখতে পারি না। তাঁদের অভ্যর্থনার মধ্যে যে আন্তরিকতা ও প্রগাঢ়তা আমি দেখেছি তা কোনোদিন ভুলতে পারব বলে মনে করি না। কারণ প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জীবনে যে সামঞ্জস্য ও সজীবতা বিরাজমান, এগুলি হচ্ছে আমার মতে তারই বহিঃপ্রকাশ।'

প্যালেস্টাইন থেকে আইনষ্টাইন দম্পতি স্বদেশে ফিরে যাবার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু স্পেনে যাত্রাবিরতি ঘটিয়ে মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্যে তাঁর কাছে একটি আমন্ত্রণ এলো। আইনষ্টাইন স্বদেশে ফেরার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিলেন; কিন্তু শ্রীমতী এলসা বার্লিনে তাড়াতাড়ি ফিরতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই অ্যালবার্টকে এই আমন্ত্রণটি গ্রহণের জন্য তিনি উৎসাহিত করলেন।

ইতিপূর্বে আইনষ্টাইন দম্পতি ভারতীয়, চৈনিক, জাপানী ও হিব্রু রীতিতে সম্বর্ধিত হয়েছেন। এবার সম্বর্ধনা সমারোহ হবে

প্রাচীন স্পেনের রীতিতে এবং সে সম্বর্ধনায় সভাপতিত্ব করবেন স্বয়ং রাজা ত্রয়োদশ আলফোন্‌সো। আইনষ্টাইনকে স্পেনের আকাডেমি অফ সায়েন্স-এর সদস্য মনোনীত করা হলো এবং সে অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী উঠে এক দীর্ঘ সালঙ্কার ভাষণ দিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মন্ত্রীমহোদয় আইনষ্টাইন-দম্পতিকে স্পেনে একটি নতুন আশ্রয় দেবার প্রস্তাব করলেন, যাতে জার্মানীতে তাঁদের জীবন দুর্বিষহ মনে হলে যখনই খুশী তাঁরা চলে আসতে পারবেন। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর প্রাচীন জগতের স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জন-সূচক মনোভাব প্রকাশ করে প্রস্তাব করলেন, অধ্যাপক আইন-ষ্টাইনকে যে ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে সে ডিগ্রি তাঁর স্ত্রীকেও প্রদান করা হোক।

অবশেষে আইনষ্টাইন-দম্পতি তাঁদের স্বদেশভূমিতে ফিরে এলেন। দীর্ঘদিন ভ্রমণের ফলে তাঁরা ক্লান্ত বটে, কিন্তু শুধু এক জার্মানী ছাড়া সর্বত্র তাঁরা যে শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও শুভেচ্ছা পেয়েছেন তার জন্যে মন কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।

জার্মানীতে ফিরে এসে তাঁরা গুছিয়ে বসতে না বসতেই চারিদিক থেকে ভীতি-প্রদর্শন করে চিঠিপত্র আসতে লাগলো। যে দল ডাঃ র‍্যাথেনিউকে হত্যা করেছিল তাদের কাছ থেকে মৃত্যুর হুমকি দেখিয়ে চিঠি এলো।

এই ভীতিপ্রদর্শন যথার্থই বিপজ্জনক ছিল এবং এগুলিকে তাচ্ছিল্য করার সময় ছিল না। এলসা এবং ডঃ আইনষ্টাইনের বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে কিছুদিনের জন্যে জার্মানী ছেড়ে চলে যেতে অনুনয় করলেন। সেই অনুযায়ী দুজন শক্তসমর্থ ইহুদী যুবককে দেহরক্ষী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে অধ্যাপক আইনষ্টাইন লিডেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে হল্যাণ্ড অভিমুখে ট্রেনে চেপে বসলেন। স্থির হলো যতদিন না জার্মানীতে বিদ্বেষভাব কিছু পরিমাণে কমে আসে ততদিন আর ফিরবেন না। শ্রীমতী আইনষ্টাইন এবার তাঁর সঙ্গে গেলেন না। হল্যাণ্ড খুব

বেশী দূরের রাস্তা নয়, তিনি ইচ্ছা করলেই সেখানে যেতে পারবেন। তা ছাড়া, তিনি জানতেন লিডেনে আইনষ্টাইনের প্রতি যথেষ্টই যত্ন নেওয়া হবে।

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ছিলেন আজন্ম শান্তিবাদী—শান্তির একজন অক্লান্ত যোদ্ধা। তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি বক্তৃতা করতে ও নিবন্ধ রচনা করতে লাগলেন। হিটলারের ঝটিকা বাহিনী তাঁকে নীরব থাকতে দেয় নি। নাৎসীরা যাতে তাঁকে ভুলে যায় এমন সংহত হয়ে চলার বাসনা তাঁর ছিল না।

তাঁর পরিবারবর্গ ও বন্ধুরা তাঁকে জার্মানীতে ফেরার অনুমতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বার্লিনে ফিরে এসে তাঁর কাজ আরম্ভ করলেন। সে বছরেরই গোড়ার দিকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন আর কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশনের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন এবং সে-কাজটা যত শীঘ্র সম্ভব তিনি করতে চান।

এক বছরেরও কিছু সময় পরে তিনি বার্লিনে ফিরে এলেন। তখন জীবন-নাশের ভীতি প্রদর্শন করে তাঁর কাছে আবার পত্র আসতে লাগলো। পারিবারিক ইহুদী সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মহত্ত্ব ও কৃতিত্বের কোন মূল্যই ছিল না নাৎসীদের কাছে।

শ্রীমতী এলসা তাঁর স্বামীর বিপদ সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন থাকতেন এবং যে কোন আগন্তুক বাড়িতে এলে তার প্রতি সতর্ক ও সুতীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতেন। এত সতর্ক হবার প্রয়োজন কেন তিনি পূর্বাহ্ণেই উপলব্ধি করেছিলেন? কারণ নাৎসী দলের সদস্যদের কাছে অসাধ্য কাজ কিছুই ছিল না।

একদিন মেরী ডিকিনসন নামে একজন আগন্তুক মহিলা আইনষ্টাইনের বাড়িতে এলেন। এই মহিলা অত্যন্ত অদ্ভুত আচরণ করতে লাগলেন এবং শ্রীমতী এলসা সন্দিহান হয়ে উঠলেন। এই মহিলাকে বিচিত্র বলে মনে হলো। তিনি শ্রীমতী এলসাকে নিজের পরিচয় না বলে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের সঙ্গে দেখা করবার

জন্যে জেদ করতে লাগলেন। শ্রীমতী আইনষ্টাইন আর বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে ফোন তুলে পুলিশকে ডেকে পাঠালেন।

সঙ্গে সঙ্গে সেই বিচিত্র প্রকৃতির মহিলাটি তাঁর টুপী থেকে একটি বড়ো ও বিষাক্ত পিন বার করে তাঁর দিকে ধাবিত হলো। শ্রীমতী আইনষ্টাইন তার কব্জি ধরে ফেললেন এবং তাঁরা দুজনে যখন ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিলেন সে-সময় পুলিশ ছুটে এলো। তারা মারমুখী আগন্তুকটিকে ধরে কাবু করে ফেললে এবং তাকে পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি উন্মাদ আশ্রমে নিয়ে গেল।

কে এই মেরী ডিকিনসন? সম্ভবত সে ছিল বিকৃতমস্তিষ্ক। কিছুকাল পূর্বে তাকে প্যারিসে রাশিয়ান দূতাবাসের সম্মুখে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন সে একটা রিভলবার হাতে নিয়ে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। সে চিৎকার করে জানিয়েছিল, কম্যুনিজম-এর কবল থেকে পৃথিবীকে সে রক্ষা করতে চায়। ফরাসীরা তাকে তিন সপ্তাহের জন্য জেল দিয়েছিল এবং তারপর ফ্রান্স থেকে তাকে বহিষ্কার করেছিল। এরপর জনসম্মুখে তার আবির্ভাব হলো আইনষ্টাইন পরিবারের বাড়িতে।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। আর মার্চ মাসে অধ্যাপক আইনষ্টাইন হামবুর্গ থেকে 'ক্যাপেলোনিও' জাহাজ যোগে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এরস্-এর অভিমুখে যাত্রা করলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো—অধ্যাপক আইনষ্টাইন বুয়েনস এরস্ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্যে যাচ্ছেন এবং সেখানে গিয়ে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করবেন। এলসা ও তাঁর মেয়ে মারগট তাঁর এই বিদেশযাত্রায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কয়েক সপ্তাহের জন্যে অন্ততঃ তিনি আবার নিরাপদে থাকতে পারবেন—এটাই ছিল তাঁদের স্বস্তির কারণ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অসুস্থতা

সম্ভাব্য সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও ভ্রমণ ব্যাপারটা ক্লান্তিকর এবং মানুষের সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। অধ্যাপক আইনষ্টাইন সাধারণত ভ্রমণ করতে আদৌ পছন্দ করতেন না। কিন্তু জার্মানীতে ইহুদী-বিরোধী নিপীড়নের জন্যে তাঁকে কয়েকবার জার্মানীর বাইরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল এবং অন্যান্যদের সাহায্য করার জন্যেই আরও বহুবার তিনি ভ্রমণ করেছিলেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর নিজের কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলেছিল। এই বছরগুলিতে তিনি দীর্ঘক্ষণ এত কঠিন পরিশ্রম করতেন যে, বিশ্রাম গ্রহণের অবসর কদাচিৎ মিলতো। এই সময় তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি উদ্ভাবিত ও সম্প্রসারিত হয। সেই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্যে তিনি প্রায়শ আহূত হ'তেন।

প্রাচ্যদেশে তাঁর ভ্রমণের অল্পদিন পরে আর একটি সম্মান তাঁকে অর্পণ করা হয়—যে সম্মানলাভেব জন্য সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা ব্যাকুল হয়ে থাকেন। প্রতি বছর ইংলণ্ডের রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতি (রয়েল অ্যাষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি) এক অনন্যসাধারণ বিজ্ঞানীকে কোপলে পদক প্রদান করে থাকেন। ১৯২৬ সালে এই পদক অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্যে প্রদান করা হয়।

তাঁর মানবকল্যাণের কাজ কখনও মন্দীভূত হয় নি, কারণ

অন্যান্যদের কল্যাণার্থে কিছু কাজ সব সময়ই করবার থাকে। যখন জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টির কিছুসংখ্যক সদস্য এসে তাঁদের কয়েকজন সহকর্মীর জেল-মুক্তির জন্যে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন, তিনি তাঁদের সাহায্য করতে স্বীকৃত হলেন।

'না, আমি কম্যুনিস্ট নই,' তিনি দৃঢ়ভাবে জানালেন, 'কিন্তু রাজনীতিক মতবাদের দরুন কোনো মানুষকে জেলে আবদ্ধ রাখা হবে, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। প্রত্যেক চিন্তাশীল জার্মানের উচিত রাজনীতিক ক্ষমাপ্রদর্শন সমর্থন করা।'

আর একবার তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হুভারের কাছে আটজন নিগ্রোর ফাঁসি রদ করার জন্যে আবেদন জানান। এই আটজন নিগ্রো স্কটসবোরো নামে একটি মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিল। বহুলোক অনুভব করেছিলেন, এই নিগ্রোদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয় নি এবং জাতিগত মোহান্ধতাই এক্ষেত্রে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই তারা প্রকৃতপক্ষে যত-না অপরাধী তার চেয়ে অপরাধ বেশি ভেবে তাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয়।

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের চোখে সব মানুষই সমান এবং মানুষ হিসাবে একজনের সঙ্গে অপরের কোনো পার্থক্য নেই।

মানবকল্যাণের জন্যে আইনষ্টাইন অক্লান্তভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। বহুজনের কাজ তিনি নিজেই করতেন এবং তার জন্যে নিজের দেহের ওপর অত্যধিক ধকল তাঁকে সহ্য করতে হত। যেটুকু বিশ্রাম ও অবসর তিনি গ্রহণ করতেন, সেটা হলো মাঝে মাঝে একটু ভ্রমণ বা তাঁর প্রিয় বেহালা নিয়ে দু-এক ঘণ্টা সুরসাধনা।

এই প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধু ও চিকিৎসক ডাঃ রুডলফ্ এরম্যান বলেছেন: "অধ্যাপক আইনষ্টাইনের একমাত্র দৈহিক ত্রুটি হচ্ছে যে তাঁর অন্তর অত্যন্ত কোমল। অপরের জন্যে কাজ করতে গিয়ে তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে যান। তিনি যে কত সহৃদয় সে সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। একবার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ইষ্ট ইণ্ডিস-এর পার্বত্য অঞ্চলে একটি রম্যক্ষেত্র সম্পর্কে আমরা আলোচনা

করছিলুম। সে-সময় মোটর গাড়ির বিশেষ প্রচলন ছিল না। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, রিক্সায় তিনি আরোহণ করবেন কিনা। তিনি উত্তর দিলেন, 'না, একেবারেই নয়। আমি হেঁটেই যাব।' তারপর একটু হেসে তিনি বললেন : 'আমার জীবনে কখনও কোনো মানুষকে গৃহপালিত জন্তুর মতো আমাকে বহন করবার জন্যে রিক্সা টানতে দেব না।"

১৯২৭ সালে অধ্যাপক আইনষ্টাইন পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেন নি এবং দীর্ঘক্ষণ কঠিন পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। সে বছর তিনি মৃদু বাতরোগে আক্রান্ত হন, কিন্তু শ্রীমতী এলসা রীতিমতো বাতে আক্রান্ত হন। তখন তাঁরা দুজনে দক্ষিণ সুইজারল্যাণ্ডের লোচে লেস্ বেনস্, লিউক-এর স্নানাগার অভিমুখে যাত্রা করেন। রোন্ নদী যেখানে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে জেনেভা হ্রদে গিয়ে মিলেছে, তার উত্তর তীরে লিউক শহরটি অবস্থিত। এখানে রোন্ নদী ফ্রান্সের মতো চওড়া নয়। এখানে সে আল্পস্ পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে এবং পর্বতমালা থেকে আগত উপনদীর জলধারা তার সঙ্গে মিলিত হয়ে শক্তিবৃদ্ধি করেছে। লিউক শহর থেকে লিউকবাথ পর্যন্ত ষোল কিলো মিটার দীর্ঘ পথে সিম্পলন রেলপথের ছোট রেল গমনাগমন করে। এখানে খনিজসমৃদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করার জন্যে শৌখিন লোকেরা এসে থাকেন। এই প্রস্রবণ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এর উষ্ণতা ১১৭-১২৪ ডিগ্রীর মধ্যে থাকে। এই উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করলে বাতরোগ সেরে যেতে পারে—এই আশায় আইনষ্টাইন-দম্পতি সেখানে এলেন।

কিন্তু আইনষ্টাইন কখনও বুঝে উঠতে পারতেন না, কেন লোকে তাঁর কাজ থামাতে চায়। বাতরোগের আক্রমণ প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু নয় যে, তাঁর নতুন বৈজ্ঞানিক কাজ নিয়ে পরিশ্রম করা চলবে না। সেই বছরই শীতকালে যুগপৎ কয়েকটি ভাষায় তাঁর গবেষণা গ্রন্থটি প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল।

পরের বছর আইনষ্টাইন বক্তৃতা-ভ্রমণে সুইজারল্যাণ্ড ফিরে এলেন। এবার এলেন ড্যাভোস্ উপত্যকায়—সেখানে বিজ্ঞানীদের একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল এবং সে সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদানের জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হন।

ড্যাভোস উপত্যকা হচ্ছে শীতকালীন অবসর বিনোদনের একটি অঞ্চল। সেখানে বহু হাসপাতাল ও হোটেল বিদ্যমান এবং সেখানকার উচ্চতায় শুষ্ক আবহাওয়া ক্ষয়রোগের পক্ষে উপকারী বলে বিবেচিত হয়। কিছু সংখ্যক ছাত্র-রোগীকে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের বক্তৃতা শোনবার জন্যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এতে আইনষ্টাইন খুশীই হয়েছিলেন, কারণ তিনি সবসময়ই তরুণ যুবাদের সঙ্গ পছন্দ করতেন।

ড্যাভোস-এ তাঁর বক্তৃতা শেষ হবার পর অধ্যাপক আইনষ্টাইন নিম্ন এনগাডিন উপত্যকায় জুওজ-এর পূর্বদিকে যাবার মনস্থ করলেন। তাঁকে যে নিবৃত্ত করা যাবে না সেটা তাঁর স্ত্রী বেশ ভালোভাবেই জানতেন। সাগরকে স্থির হবার আদেশ করা বরং সহজতর। আইনষ্টাইন তাঁর কথায় কর্ণপাত মোটেই করবেন না। কিন্তু অধ্যাপক আইনষ্টাইন তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবার তিনি সত্যসত্যই বিশ্রাম গ্রহণ করবেন।

এনগাডিন উপত্যকার অধিকাংশ স্থানই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশ উঁচু এবং এই উপত্যকাটি সমগ্র ইউরোপের মধ্যে অন্যতম সুরম্য স্থান। এখানে দেখা যায় ইটালীদেশের নীল আকাশের নিচে ফুলের মেলা এবং সুশোভন স্থাপত্যসমৃদ্ধ গৃহের সারি।

প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আইনষ্টাইন শেষ পর্যন্ত তাঁর সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করেছিলেন। দুটি বড় তোরঙ্গ তাঁদের সঙ্গে ছিল। সে দুটিকে তোলবার জন্যে লোক না ডেকে তিনি নিজেই সে কাজে হাত দিলেন। ফল হলো মারাত্মক। অত্যধিক পরিশ্রমের জন্যে বিপজ্জনকভাবে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হলো। তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হলো। বেশ কিছুদিন তাঁকে সেখানে থাকতে

হয়েছিল, যে পর্যন্ত না তিনি এমন সুস্থ হয়ে ওঠেন যে শ্রীমতী আইন-ষ্টাইন তাঁকে ট্রেনে করে জুরিখে নিয়ে যেতে পারেন। সে সময় তিনি এইটুকুই মাত্র ভ্রমণ করতে সাহস পেয়েছিলেন।

জুরিখের সর্বাপেক্ষা বিপদের অবস্থা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আইনষ্টাইনকে কয়েক সপ্তাহ সেখানে থাকতে হয়েছিল। অবশেষে তিনি বার্লিনে এবং তাঁর নিজের চিকিৎসকের কাছে ফিরে যেতে সমর্থ হলেন।

ডাঃ রুডলফ্ এরম্যান পঁচিশ বছর যাবৎ অধ্যাপক আইন-ষ্টাইনের ব্যক্তিগত বন্ধু ও চিকিৎসক। সে সময় তিনি একটি হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর এবং বার্লিন বিশ্ববিত্থালয়ের স্কুল অফ মেডিসিনের অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডাঃ এরম্যান ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত জার্মানী থেকে পালিয়ে আসতে পারেন নি। শেষকালে যখন তিনি পালাতে সমর্থ হলেন, তখন তিনি নিউইয়র্ক-এ চলে এসে দেহাভ্যন্তরের ভেষজ বিশেষজ্ঞরূপে কাজ করতে লাগলেন।

ডাঃ এরম্যান বলেন ঃ 'অধ্যাপক আইনষ্টাইন সাধারণ অবস্থায় একজন স্বাস্থ্যবান লোক, অত্যন্ত কর্মঠ ও আমোদপ্রিয়। হাস্ত-পরিহাস তিনি খুব পছন্দ করেন এবং নিজেও ঠাট্টা-তামাসা করেন। তাঁর উচ্চতা পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি এবং ওজন স্বাভাবিক।'

অধ্যাপক আইনষ্টাইন হৃদ্‌যন্ত্রের ওপর অত্যধিক চাপ না দিলে তাঁর অবস্থা বেশ সুস্থই থাকে। যখনই তাঁর হৃদ্-আক্রমণ হয়েছে, সেটা তাঁর অত্যধিক পরিশ্রমের ফলেই ঘটেছে। নিম্ন এনগাডিন উপত্যকায় তিনি যখন ভারী তোরঙ্গ তোলবার চেষ্টা করেন, তখন হয় তাঁর প্রথম হৃদ্-আক্রমণ। এর দু-তিন বছর পরে তিনি যখন ক্যাপুথ হ্রদ থেকে তাঁর গ্রীষ্মাবাসে নিজের নৌকা বয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, তখন হয় দ্বিতীয় হৃদ্-আক্রমণ।

এনগাডিনে হৃদ্-আক্রমণ হবার পর ডঃ আইনষ্টাইন উপলব্ধি করেন, তিনি অসুস্থ এবং তাঁর নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন নেওয়া

দরকার। কিছুদিনের জন্যে সব কিছু কাজ বন্ধ রাখতে হবে। শুধু বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে—কোনোরকম বক্তৃতা, বিজ্ঞানের কাজ বা হাঁটাহাঁটি চলবে না।

শ্রীমতী এলসা তাঁকে চোখে চোখে নিয়মমাফিক রাখার দরুন অধ্যাপক আইনষ্টাইন ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করলেন ডাঃ এরম্যানের নির্দেশ ছিল—ধূমপান একেবারেই চলবে না। আইনষ্টাইনের মতো একজন অতি ধূমপানপ্রিয় লোককে ধূমপানে নিবৃত্ত করতে এলসাকে বেগ পেতে হয়েছিল। তবে আইনষ্টাইন চিকিৎসকদের যুক্তি সব সময়ই মেনে নিতেন। যখন তিনি জানলেন কিছুকালের জন্যে ধূমপান বন্ধ রাখা তাঁর নিজের জন্যই ভালো, তখন তিনি সেটা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন।

১৯২৯ সালে যখন তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিন সমাসন্ন হলো, তখন অধ্যাপক আইনষ্টাইন তাঁর বাড়িতে ঘোরাফেরা করছেন, এমন কি কাছাকাছি একটু বেড়াতেও যাচ্ছেন। কিন্তু সে সময় তাঁকে সবরকম উত্তেজনা ও খাটুনি পরিহার করতে হয়েছিল। এদিকে সারা বিশ্বে তখন তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিবস পালন উপলক্ষে নানা উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। এইসব পরিকল্পনা সৎ-উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর রুগ্ন দেহের পক্ষে তা ছিল অত্যন্ত শ্রান্তিজনক ও ক্ষতিকর। তখন তিনি মহাকর্ষ সম্পর্কে তাঁর নবতম বৈজ্ঞানিক চিন্তা বিষয়ে একটি পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণী সবেমাত্র প্রকাশ করেছেন। জটিল গণিত তত্ত্বে এই পাঁচপৃষ্ঠা সম্পূর্ণ ভরা। তিনি নিজে মনস্থির করেছিলেন, জনসাধারণকে তাঁর তত্ত্বসমূহ বোঝাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। কিন্তু জনসাধারণ সে-বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিল বলে মনে হয় না। তারা এই মহাবিজ্ঞানীর জন্মদিবস পালন করার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়েছিল।

এই মাতামাতি থেকে আইনষ্টাইনকে রক্ষার জন্যে তাঁর পরিবার-বর্গ বার্লিনের এক ধনী নাগরিকের তালুকের মধ্যে মালীর কুটিরে

তাঁর গুপ্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। অধ্যাপক আইনষ্টাইন একলা সেই ক্ষুদ্র কুটিরে চলে গেলেন, তাঁর স্ত্রী ও কন্যারা বার্লিনের আবাসে রইলেন সাংবাদিক ও আগন্তুকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবার জন্যে। সাধুর মতো তিনি বাস করতে লাগলেন, নিজের হাতে রান্না ও নিজের তদারক করতে লাগলেন। এদিকে ৫ নম্বর হ্যাবারল্যাণ্ড সরণিতে বন্ধুবান্ধবেরা দেখা করতে ও উপহার দিতে আসতে লাগলেন এবং বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে চিঠিপত্র এসে পৌঁছতে লাগলো।

কিন্তু অধ্যাপক আইনষ্টাইন কোথায়?

শ্রীমতী এলসার কাছ থেকে এ প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

অধ্যাপক আইনষ্টাইনের সচিব একটি জবাব ভেবে রেখেছিলেন এবং সে জবাব বার বার পুনরাবৃত্তি করতে হলো:

'সম্ভাব্য অভ্যর্থনা এড়াবার জন্যে অধ্যাপক আইনষ্টাইন কয়েকদিন আগে গোপনে শহর ত্যাগ করে গেছেন। কোথায় গেছেন তা প্রকাশ না করার জন্যে আমাকে একান্ত নির্দেশ দিয়েছেন।'

কিন্তু একথায় একটা সমস্যা উপস্থিত হলো। তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা এবং তাঁদের স্বামীরা আইনষ্টাইনের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে সম্মিলিত হবার জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন। তাঁরা আইনষ্টাইনের প্রিয় খাদ্যদ্রব্যগুলি প্রস্তুত করেছিলেন এবং তাঁদের নিজেদের দিক থেকে প্রীতি-উপহার দেবার ছিল। শেষপর্যন্ত তাঁরা বাড়ির পেছন দিক দিয়ে গোপনে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন, ঢাকা ডিসে করে ছত্রাক-পুর-ভরা বানমাছ-সমেত তাঁর সবরকম প্রিয় খাদ্য নিয়ে গেলেন।

মালীর কুটিরে শ্রীমতী এলসা খাবার টেবিলে খাদ্য সাজিয়ে দিলে তাঁরা সকলে খেতে বসলেন। এই নৈশ-ভোজ পরম আনন্দদায়ক হয়েছিল। পরিবারের প্রিয়জনদের সঙ্গে এইভাবে সম্মিলিত হওয়াই ছিল অধ্যাপক আইনষ্টাইনের কাছে পরম সুখের।

নৈশভোজের পর শ্রীমতী এলসা তাঁর স্বামীকে একটা জিনিস দিয়ে হকচকিয়ে দিলেন।

'দেখো, অ্যালবার্ট, এই বিশেষ জিনিসটি শুধুমাত্র আজকের জন্যে।'

এই জিনিসটি হচ্ছে তাঁর ধূমপানের পাইপ। তাঁর প্রথম হৃদ্-আক্রমণের সময় এই পাইপটি তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। জন্মদিন উপলক্ষে আজকে তিনি এক পাইপ তামাক সেবন করতে পারেন। তিনি পাইপটি তুলে নিয়ে মুখে পোরবার আগে মশলা ভরবার দিকটা সাদরে নাড়া-চাড়া করলেন।

এমন সময় দ্বারে একটি তীব্র আঘাতের শব্দ শোনা গেল। লোকটি কে হতে পারে? কারণ কেউ তো তাঁদের গোপন আশ্রয়-স্থলের হদিশ জানতো না। শ্রীমতী আইনষ্টাইন দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। যে লোকটি তখন ভিতরে প্রবেশ করলো তাকে পূর্বে তাঁরা দেখেছেন। তাঁদের দেখতে পেয়ে সে যেন নিজেকে একটু অপরাধী বোধ করছিল। সে একটি মার্কিন সংবাদ-পত্রের বার্লিনস্থ রিপোর্টার।

অধ্যাপক আইনষ্টাইন একটু বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে আগন্তুককে বললেন: 'তোমার সন্ধান করবার ক্ষমতা ভালোই আছে দেখছি।'

ষোড়শ অধ্যায়

বার্লিনের উপহার

তাঁর জন্মদিন অতিবাহিত হবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে অধ্যাপক আইনষ্টাইন দেখতে পেলেন সারা পৃথিবী থেকে অজস্র চিঠি-পত্র ও উপহার এসে উপস্থিত হয়েছে। তাঁদের বার্লিনের বাসকক্ষটি কার্ড, টেলিগ্রাম, কেবলগ্রাম ও চিঠিপত্রে ভরে গিয়েছিল। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনপত্র এসেছিল পৃথিবীর সর্বপ্রান্ত ও সর্বস্তরের লোকের কাছ থেকে। শুধু অভিনন্দনপত্র নয়, সেই সঙ্গে এলো অসংখ্য প্রীতি-উপহার, সাবান, টাই, রুমাল, তামাক ও বই। বার্লিন আকাদেমির ছাত্ররা তাঁর নৌকাপ্রীতির কথা স্মরণ করে তাঁকে এমন একটি জিনিস উপহার দিলে যা তাঁর বাড়িতে ধরে নি। সেটি একটি পাল-তোলা নৌকা।

বার্লিনের পৌরসভা অধ্যাপক আইনষ্টাইনের জন্মদিনে উপহার দানের ব্যাপারে বাদ পড়তে চাইলেন না। তাঁরাও অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে একটি জন্মদিনের প্রীতি-উপহার দেবেন ঠিক করলেন—গ্রীষ্মাবাস নির্মাণের জন্যে তাঁকে একখণ্ড জমি দান করবেন।

তিনি কি বার্লিনের প্রথম নাগরিক নন? আর বার্লিন কি একটি ঐশ্বর্যশালী শহর নয়? পৌরসভার সদস্যরা আইনষ্টাইন-দম্পতিকে তাঁদের অভিপ্রায়ের কথা জানালেন। তাঁরা বললেন, হ্যাভেল নদীর ধারে তাঁর জন্যে একখণ্ড জমি তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। আইনষ্টাইন যে নৌবিহার ভালবাসেন সেটা তাঁরা জানতেন বলেই

এই ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠিক নদীর ধারে সেই ভূমিখণ্ডের ওপর একটি আবাসের কাঠামো ছিল।

পৌর সভা এই সৎকাজে এত গর্ব অনুভব করেছিলেন যে, সংবাদপত্রেও এই সংবাদটি তাঁরা প্রচার করেছিলেন। সারা জার্মানীতে প্রচার হয়ে গেল যে, অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে একটি গ্রীষ্মাবাস দেওয়া হবে। এই সম্পর্কে সংবাদপত্রে বিশেষ নিবন্ধ ও আলোকচিত্র প্রকাশিত হলো। এই অভিনব ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই গর্ব অনুভব করছেন বলে মনে হলো। কিন্তু······

সচরাচর লোকে যা করে থাকে, শ্রীমতী আইনষ্টাইন তা-ই করলেন। বার্লিনের শহরতলী ক্ল্যাডো যেখানে সেই ভূমিখণ্ডটি অবস্থিত, সেটা নিজের চোখে দেখবার জন্যে তিনি গেলেন। নদীর ধারে এই সুরম্য স্থানটি দেখে তিনি আনন্দিত হলেন। ফটোর চেয়ে স্থানটি আরও বেশি সুন্দর বলে তাঁর মনে হলো।

সেই ছোট বাড়িটির মধ্যে বাসিন্দা রয়েছে দেখে তিনি একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি একেবারে দরজার কাছে গিয়ে ধাক্কা দিলেন।

দ্বার উন্মুক্ত হবার পর তিনি বললেন: বার্লিনের পৌরসভা আমার স্বামী ও আমাকে যে সম্পত্তি দিয়েছেন সেটা দেখতে এসেছি।

তাঁর কথার মাঝে থামিয়ে তাঁকে বলা হলো 'জায়গাটা বার্লিনের পৌরসভার নয় যে তাঁরা দান করতে পারেন। জায়গাটা হচ্ছে ডন ব্রাণ্ডিস নামে একটি পরিবারের।' এ কথা শুনে শ্রীমতী আইনষ্টাইন হকচকিয়ে গেলেন। হতাশ মনে তিনি বার্লিনে ফিরে এলেন।

পৌরসভাও এ ব্যাপারে হতবুদ্ধি ও বিব্রত বোধ করেছিলেন। মনে হয়, বার্লিন পৌরসভা একটি সাধারণ উদ্যান নির্মাণের জন্যে কিছু পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি কিনেছিলেন বা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা মনে করেছিলেন এই জায়গাটিও তার অন্তর্ভুক্ত। পুরানো নথিপত্র ঘেঁটে তাঁরা দেখলেন, তাঁদেরই ভুল হয়েছে। বার্লিন পৌরসভা

তখনও পর্যন্ত সেই ভূমিখণ্ডটি কেনেন নি। এই ভুল সংশোধনের জন্যে পৌরসভা অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে ওই একই জায়গার ওপর একটি বাসভবন নির্মাণ করার জন্যে প্রস্তাব করে পাঠালেন। অধ্যাপক আইনষ্টাইন কি এই প্রস্তাবে সম্মত হবেন? অধ্যাপক আইনষ্টাইন অবশ্য এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। পৌরসভা তাঁকে জানালেন: তিনি গৃহনির্মাণের কাজে অগ্রসর হোন। তিনি নিজে গৃহ নির্মাণ করিয়ে ফেলুন, তার দরুন যা খরচ পড়বে তা সমস্তই বহন করবেন পৌরসভা। এই প্রস্তাব যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ হয়েছিল এবং আইনষ্টাইন-দম্পতি গৃহনির্মাণের প্ল্যান তৈরী করার জন্যে একজন স্থপতিকে নিযুক্ত করেছিলেন।

কিন্তু এ প্রস্তাবটাও ভণ্ডুল হয়ে গেল। আর একটি পুরানো নথিপত্র খুঁজে দেখা গেল, একই তালুকে আর একটি গৃহ নির্মাণ করা যাবে না। এই ঘটনাটা রাতারাতি একটা কলঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। সংবাদপত্র মহল এই ব্যাপারে কার্টুনের মাধ্যমে পৌরসভাকে হাস্যাস্পদ করার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। সংবাদপত্রের স্তম্ভে সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হলো। কয়েকজন রাজনীতিজ্ঞের সুনাম নষ্ট হবার উপক্রম হলো। আইনষ্টাইন-দম্পতির বহু বন্ধু এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, অধ্যাপক আইনষ্টাইন ও তাঁর স্ত্রীকে এভাবে অত্যন্ত বিব্রত করা হচ্ছে। আইনষ্টাইন-দম্পতি ছিলেন সবসময় শান্তিপ্রিয় ও নির্ঝঞ্ঝাট। তাই সংবাদপত্রের এই হৈ-চৈ তাঁদের কাছে বেদনাদায়ক বোধ হয়েছিল।

বার্লিনের অবিবেচক পৌরপিতারা এরপর আইনষ্টাইন-দম্পতির কাছে প্রস্তাব করলেন: 'আমরা আপনাদের একটি সম্পত্তি কিনে দেব।'

অধ্যাপক আইনষ্টাইন বললেন: 'খুব ভালো কথা।'

বার্লিন থেকে একটু দূরে, ট্রেনে করে প্রায় এক ঘণ্টার দূরত্বে হ্যাভেল নদীর তীরে ক্যাপুথ গ্রামে একখণ্ড জমি পাওয়া গেল। সেখানে পাইনগাছ-ঘেরা একটি পাহাড়ের ওপর আইনষ্টাইন-দম্পতি

তাঁদের গ্রীষ্মাবাস নির্মাণ করা স্থির করলেন। তাঁরা এই জমিটি কেনার ব্যবস্থা করে বার্লিন পৌরসভাকে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন।

এরপর যা ঘটলো তা জঘন্য—এত জঘন্য যে প্রায় বলা চলে না। জমি ক্রয় করার জন্যে অর্থব্যয়ের সম্পর্ক থাকায় পৌরসংস্থার সভা আহ্বান করে অর্থের পরিমাণ বরাদ্দ করার জন্যে সদস্যদের ভোট-গ্রহণের প্রয়োজন। কিন্তু ন্যাশানালিস্ট পার্টির দলভুক্ত পৌরসভার সদস্যরা অর্থবরাদ্দের প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। জমি ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ২০ হাজার মার্ক মুদ্রা বরাদ্দের প্রস্তাব যখন উত্থাপিত হলো, ন্যাশানালিস্টরা তার প্রতিবাদ করলেন। তাঁরা দীর্ঘ বিতর্কের অবতারণা করলেন এবং তাঁদের প্রবল বিরোধিতায় প্রস্তাবটি সে সভায় গৃহীত হলো না। প্রস্তাবিত অর্থ বরাদ্দ করা গেল না এবং সমস্ত বিষয়টি পরবর্তী সভার জন্যে মুলতবী রাখা হলো। তাঁদের এই বিরোধিতার উদ্দেশ্য কি হতে পারে? অনেক মনে করেন, এই বিরোধিতার মূলে ইহুদিবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

এদিকে অধ্যাপক আইনষ্টাইন ইতিমধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। তিনি জমির মালিককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, জমিটি কিনবেন এবং স্থপতি তাঁর গৃহের প্ল্যানও সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। অধ্যাপক আইনষ্টাইন মনস্থির করে বার্লিনের মেয়োরের কাছে একটি সংক্ষিপ্ত পত্র লিখে জানালেন, এই ব্যাপারে তিনি যেন আর বিব্রত না হন। পত্রে তিনি লিখলেন: মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং তাঁর জন্মদিনের উপহার নিয়ে অনেক অর্থহীন ঘটনা ঘটে গেছে। তিনি নিজেই সমস্ত ব্যাপারটির মীমাংসা করবেন এবং দাম ও গৃহ-নির্মাণের ব্যয় সমস্ত কিছুই নিজে বহন করবেন।

উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন: 'এখন আপনাদের কাছ থেকে আমি আর বোধ হয় গৃহ গ্রহণ করতে পারি না।'

এই হলো ঘটনার পূর্ণ বিবরণ। এইভাবে তিক্ত ঘটনার অবসান ঘটলো। আইনষ্টাইন দম্পতি ধনী ছিলেন না এবং ক্যাপুথে

গ্রীষ্মাবাস নির্মাণ করতে তাঁদের সঞ্চিত অর্থের প্রায় সবটাই ব্যয় হয়ে গেল। কিন্তু গৃহটির নির্মাণকার্য যখন সম্পূর্ণ হলো তখন দেখা গেল অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে। আইনষ্টাইন-দম্পতি এই গ্রীষ্মাবাসে তিন বছর অতিবাহিত করেছিলেন। গৃহটির সাদাসিধে গড়নের দরুন ব্যয়ভার বেশি পড়ে নি, কিন্তু শিল্পসৌকর্যের দিক থেকে গৃহটি ছিল সুরম্য। গৃহের বহিরাঙ্গনে ছিল সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যান এবং চারিদিকে লম্বা পাইন গাছের সারি।

গৃহের অল্প একটু দূরে হ্যাভেল নদী সম্প্রসারিত হয়ে হ্রদের রূপ ধারণ করেছে এবং সেখানে তার নামকরণ হয়েছে লেক সুইলো। এত সন্নিকটে হ্রদ থাকায় অ্যালবার্ট একটি নতুন অবসর বিনোদনের সুযোগ পেলেন—নৌবিহার। নির্মেঘ গ্রীষ্মের দিনে তিনি তাঁর পালতোলা নৌকো 'টামলার' জলের বুকে ভাসিয়ে দিতেন এবং হাল ধরে মহাবিশ্বের কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যেতেন। যখন কোনো সমস্যা সম্পর্কে তিনি চিন্তা করতেন তখন পদব্রজে ভ্রমণের মতো নৌবিহারও ছিল তাঁর কাছে পরম আরামদায়ক।

সপ্তদশ অধ্যায়

তাঁর দ্বারপ্রান্তে বিশ্বের পদধ্বনি

যদিও অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন প্রায় সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করে-ছিলেন, সারা বিশ্বও তাঁর কাছে এসেছিল। বিশ্ব তাঁর কাছে এসেছিল পত্রের মাধ্যমে, উপহারের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিবিশেষের আগমনে। প্রতিদিন তাঁর গৃহে বিশ্বের সম্ভাব্য সকল ভাষায় চিঠি-পত্র আসত। এই রাশি রাশি চিঠিপত্র তাঁর স্ত্রী ও একান্ত সচিব বেছে নিয়ে উত্তর দিতেন। বিশ্বের সর্বপ্রান্ত থেকে তাঁর কাছে নানারকম উপহার আসত। বিশেষ করে যাঁরা বই লেখেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের স্বাক্ষরিত এক কপি বই তাঁকে পাঠিয়ে দিতেন, তিনি তাঁদের চিনুন আর না চিনুন। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে তাঁর কাছে লোকেরা দেখা করতে আসত। বার্লিনে অথবা ক্যাপুথে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনেক বড় বড় লোক আসতেন। তাঁরা যতই বড় হোন না কেন, অধ্যাপক আইন-ষ্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে আসাকে মর্যাদাহানিকর বলে মনে করতেন না।

১৯৩০ সালে জার্মানীতে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন মহান ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আইনষ্টাইনের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ আঠার বছরের বড় ছিলেন তিনি যখন ইংলণ্ড, জার্মানী, ডেনমার্ক ও রাশিয়া পরিভ্রমণ করে

মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে ক্যাম্পুথে আসেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি।

এই কবি ছিলেন দীর্ঘকায় ও সৌম্যদর্শন। তখন রবীন্দ্রনাথের পরণে ছিল প্রাচ্যদেশীয় উজ্জ্বল রেশমের আলখাল্লা, তাঁর অকর্তিত চুল, সুদর্শন মুখমণ্ডলে রেশমশুভ্র লম্বা শ্মশ্রু ও স্বপ্নালু চক্ষু। এই দুই মনীষী—বিজ্ঞানী এবং অতীন্দ্রিয় কবি, যখন পাশাপাশি বসে আলোচনার মধ্যে আত্মসমাহিত হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের মুখমণ্ডলে, বিশেষ করে তাঁদের চোখের দৃষ্টিতে সামঞ্জস্য প্রকাশ পেয়েছিল। সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণার বাইরে রহস্যময়ী প্রকৃতির নানারূপ লীলা প্রকাশে দু-জনেই মুগ্ধ। তাঁদের মধ্যে বিশ্বের সৌন্দর্য ও সত্য সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা হয়।

মার্কিন চলচ্চিত্রের বিশ্ববিখ্যাত হাস্যরসিক অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনও অধ্যাপক আইনষ্টাইনের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে, যখন অধ্যাপক আইনষ্টাইন ক্যালিফোর্নিয়া পরি-ভ্রমণে আসেন। দ্বিতীয়বার তিনি বার্লিনে এসে আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সবাকচিত্র যুগের আগে নির্বাক চলচ্চিত্রের হাস্যার্ণব ছিলেন চার্লি চ্যাপলিন। নির্বাক যুগের তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তাঁর খর্বাকৃতি, ঢলঢলে প্যাণ্ট, লম্বা পদযুগল, ছড়ি এবং ছোট্ট কালো গোঁফ বিশ্বের সকলের কাছে ছিল সুপরিচিত।

তাঁর সর্বশেষ নির্বাক চলচ্চিত্র 'সিটি লাইটস'। ১৯৩১ সালের শেষভাগে যখন সকলে সবাক চলচ্চিত্রে অভ্যস্ত হচ্ছিল, তখন তিনি এই চিত্রটি নির্মাণ করেন। সে সময় হলিউড নির্বাক চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তাবে 'না' বলতে পারত, কিন্তু চার্লি চ্যাপলিন ছিলেন এমন এক শিল্পী যাঁকে সকলে ভালবাসতেন। 'সিটি লাইটস' দেখবার জন্যে জনসাধারণ রঙ্গালয়ে ভিড় জমাত। এই নাটকের নায়িকা ছিলেন একজন অন্ধ ফুলওয়ালী বালিকা। নাটক শেষে সে গুন্ গুন্ স্বরে গানের কলি গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসত—'কে আমার ভায়োলেট ফুল কিনবে?'

হলিউডে এই ছবিটি যখন মুক্তিলাভ করে, তখন অধ্যাপক আইনষ্টাইন সেখানে ছিলেন। তিনি এই ছবিটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং করুণার্দ্র দৃশ্যে অশ্রু বিসর্জন করেন। তিনি সে-সময় পাসাডেনায় ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে পরিদর্শক-অধ্যাপকরূপে কাজ করছিলেন এবং এই পরিভ্রমণের সময় চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

যে রাত্রিতে তিনি 'সিটি লাইটস্'-এর প্রথম প্রদর্শনী দেখতে যান, সে-রাত্রে রঙ্গালয় অভিমুখী সকল রাস্তায় চলচ্চিত্র-ভক্তরা ভিড় জমিয়েছিল। যে গাড়িতে ডঃ আইনষ্টাইন এবং চার্লি চ্যাপলিন আরোহণ করেছিলেন, সেটি শম্বুকগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। যখন লোকেরা গাড়িটির কাছে ঘিরে দাঁড়ালো, তখন তাদের মধ্যে একজন গাড়ির জানালার মধ্য দিয়ে মাথা গলিয়ে ভালো করে আরোহী দুজনকে দেখে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করে উঠল—'গাড়ীর মধ্যে চার্লি এবং আইনষ্টাইন রয়েছেন! এটা একেবারে অভাবনীয়।'

অধ্যাপক আইনষ্টাইন কোনোদিনই চলচ্চিত্র-ভক্ত ছিলেন না। কিন্তু চার্লি চ্যাপলিন যখন সবাকচিত্র নির্মাণ আরম্ভ করেন, তখন তিনি 'গ্রেট ডিক্টেটর' ছবিখানি দেখেছিলেন এবং দেখে তাঁর ভালো লেগেছিল। তিনি এই ছবিটি পছন্দ করেছিলেন, কারণ এটি একটি অপূর্ব চিত্র এবং এর একটি অন্তর্নিহিত বাণী ছিল। চার্লি সমগ্র বিশ্বকে হিটলার সম্বন্ধে সাবধান করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেটা করেছিলেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে। এই চিত্রে তিনি হিটলারের একটি হাস্যরসাত্মক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছিলেন। এই চিত্রে তিনি হাস্যকর গোঁফ সমেত খর্বকায় ক্ষৌরকারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যে জার্মানীর প্রকৃত ডিক্টেটরের মতোই সমগ্র বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখেছিল।

সুইস বিজ্ঞানী অগাস্তে পিকার্ড, যিনি ১৯৩১ সালের গ্রীষ্মকালে বেলুনযোগে ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন, ওই বছর বসন্তকালে ভিয়েনায় ডঃ আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সেদিন অপরাহ্নে ডঃ আইনষ্টাইন তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান উপভোগ করছিলেন এবং নিজে বেহালায় একটি সুর বাজাচ্ছিলেন, এমন সময় একজন লোক এসে তাঁর হাতে একটি লিপিকা দিল। এই লিপিকাটি এসেছিল অধ্যাপক পিকার্ডের কাছ থেকে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, তিনি সেখানে এসে ডঃ আইনষ্টাইনের সাক্ষাৎ পেতে পারেন কিনা? অধ্যাপক পিকার্ড তাঁর বেলুন-অভিযান বিষয়ে বক্তৃতাদানের জন্যে ভিয়েনায় এসে-ছিলেন। ডঃ আইনষ্টাইন অবশ্য তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। ষ্ট্রাটোস্‌ফিয়ার অভিযান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্যে তিনি সে বিষয়ে শুনতে ইচ্ছুক ছিলেন।

অধ্যাপক পিকার্ড দেখতে রোগা ও লম্বা, তাঁর গোঁফটি তৎ-কালীন প্রচলিত ফ্যাশনের মত। তিনি একটি আরামকেদারায় বসে অধ্যাপক আইনষ্টাইন ও তাঁর গানের আসরের বন্ধুদের সকা-কাশে তাঁর (পিকার্ডের) দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক অভিযানের কথা বলেছিলেন।

পিকার্ড ও তাঁর সহকারী একটি হাইড্রোজেনপূর্ণ বেলুন এবং একটি অ্যালুমিনিয়াম নির্মিত গণ্ডোলা ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা দুজনে কেবল সাত আট ঘণ্টার জন্যে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে আরোহণের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু যখন আঠার ঘণ্টায় তাঁদের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন সকলেই ভাবলেন, তাঁরা চিরতরে বিলীন হয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের বেলুন সুইস আল্পস-এর একটি হিমবাহের ওপর অবতরণ করেছিল এবং তাঁরা জানাতে পেরেছিলেন যে তাঁরা প্রায় দশ মাইল অর্থাৎ ৫২,০০০ ফিট ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছিলেন। ষ্ট্রাটোসফিয়ারের সুতীব্র শৈত্য তাঁদের বিস্ময়াহত করেছিল। সেখানে শৈত্য বিজ্ঞানীর থার্মোমিটারে শূন্যাঙ্কের ১০০° ডিগ্রী নীচে, অথবা গৃহব্যবহার্য থার্মোমিটারে হিমাঙ্কের ১৪৮° ডিগ্রী নীচে।

অধ্যাপক পিকার্ড ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: একদিন বিমান

সু-উচ্চতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করবে। তিনি বলেছিলেন, ষ্ট্রাটোসফিয়ারে বিমান ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগে ধাবিত হতে পারবে। কিন্তু বিমানচালকদের অক্সিজেন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। তাঁর উক্তি নির্ভুল বলে পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিল।

মেরী কুরী, পোলিশ মহিলাবিজ্ঞানী, যিনি তাঁর স্বামী পিয়ের কুরীর সঙ্গে পরীক্ষাকালে রেডিয়াম আবিষ্কার করেন, ডঃ আইনষ্টাইনের বহুদিনের বন্ধু ছিলেন। বিজ্ঞানীমহলে তাঁর স্বীকৃতি লাভের বহুপূর্বে মেরী কুরীই উপলব্ধি করেছিলেন আইনষ্টাইনের কাজ কত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১০ সালে যাঁরা আইনষ্টাইনকে একটি ভালো পদ দেবার জন্যে প্রাগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

মেরী কুরী এবং অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন জাতিসঙ্ঘের বুদ্ধিজীবী সহযোগিতা সম্পর্কিত কমিটিতে কাজ করেছিলেন এবং জেনেভায় তাঁরা দুজনে অনেকবার মিলিত হয়েছিলেন। কখনও কখনও তাঁদের দুজনকে জাতিসঙ্ঘের ভবনের সংযোগ-পথে একসঙ্গে পায়চারি করতে অথবা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে আলাপ করতে দেখা যেত। যখন তাঁরা বসে যখন কথাবার্তা বলতেন, তখন অন্যান্যেরা তাঁদের কাছ থেকে ভদ্ররকম দূরত্বে সরে থাকতেন, যাতে না এই দুজন অনন্য-সাধারণ মানুষের আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

মেরী কুরী সম্বন্ধে একটা কথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, পরমাণু-বোমা উদ্ভাবনে তাঁর গবেষণারও বিশেষ গুরুত্ব আছে। তিনি তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করেন এবং তাঁর একটি শ্রেষ্ঠতম অবদান হচ্ছে স্বামীর সঙ্গে একযোগে রেডিয়াম আবিষ্কার। এই বিস্ময়কর মৌল পদার্থটি চিকিৎসকরা মানুষের কত শত রোগযন্ত্রণা নিরাময় বা উপশমের জন্যে ব্যবহার করে থাকেন।

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের প্রতি বিশ্ববাসীর পক্ষ থেকে যে-সকল শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হয়েছে তার মধ্যে একটি নিউইয়র্ক শহরে

রিভারসাইড পথে চিরস্থায়ীভাবে প্রস্তরাকারে বিদ্যমান আছে। রিভারসাইড গীর্জায় সহনশীলতা ও মহত্বে বরিষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হয়েছে। সুদীর্ঘ গথিক চূড়া সমন্বিত এই গীর্জাটি হাডসন নদীর তীরে যান-চলাচলের পথের ওপর অবস্থিত। ১৯৩০ সালে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয়বার পরিভ্রমণ করার কিছু পূর্বে এই গীর্জাটি সম্পূর্ণ ও উৎসর্গীকৃত হয়।

গীর্জার দ্বারের উপর খিলানের মধ্যস্থলে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি খোদিত। প্রবেশপথের সুউচ্চ খিলানে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা, সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের প্রতিমূর্তি বিদ্যমান। এই খিলানে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের মূর্তি প্রস্তরে খোদিত আছে। তাঁদের মধ্যে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন অন্যতম।

গীর্জার অন্যতম পরিচালক ডঃ ইউ-জীন সি কার্ডারকে এর নির্মাণ কার্যের অনেক কিছু তত্ত্বাবধান করতে হয়েছিল। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চৌদ্দ জন বিজ্ঞানী মনোনয়ন করার সময় তিনি বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিদের কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সে পত্রে তিনি প্রত্যেককে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁদের নিজ নিজ ধারণানুযায়ী বিশ্বের সর্ব-কালের চৌদ্দজন সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাদের নামের একটি তালিকা পাঠাতে। তালিকাগুলি এলে দেখা গেল, স্বভাবতই নামের তারতম্য ঘটেছে, কিন্তু প্রত্যেকটি তালিকাতে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের নাম অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা প্রত্যেকেই ভেবেছিলেন, অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনকে বাদ দিয়ে এই তালিকা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

এই সুবৃহৎ গীর্জার খিলানে, রঙ-করা কাচের গবাক্ষে, প্যানেলে জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বকালের প্রায় ছয়শত জন এমন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে—যাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ পন্থায় বিশ্ব-মানবের সুখশান্তির জন্যে মহান অবদানের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিট্যুট অফ্ টেকনোলজি

সারা বছর ধরে ৫ নম্বর হ্যাবারল্যাণ্ড সরণির ঠিকানায় এবং ক্যাপুথে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমন্ত্রণপত্র আসত। অধ্যাপক আইনষ্টাইন সঙ্গে সঙ্গেই সে-সব পত্রের উত্তর দিতেন। বহু শত পত্রের উত্তরে তাঁকে আমন্ত্রণ রক্ষার অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে হত। কারণ স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে অত শত জায়গায় স্বশরীরে উপস্থিত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া পরিদর্শনের এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিট্যুট অফ্ টেকনোলজিতে অধ্যাপক রবার্ট এ. মিলিক্যানের সঙ্গে ছ সপ্তাহকাল আলোকতত্ত্ব সম্পর্কিত পরীক্ষণ বিষয়ে কাজ করার যখন আহ্বান এলো, তখন আইনষ্টাইন সে বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন। ন বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর প্রথম পরিভ্রমণের কথা মনে পড়ল। সে সময় তিনি কেবল নিউইয়র্ক ও তার আশে-পাশে ভ্রমণ করেছিলেন। এখন যদি তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় যান, তা হলে তিনি এবং এলসা পানামা খালের মধ্য দিয়ে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন এবং সেটা সত্যি সত্যিই তাঁদের পক্ষে অবসরবিনোদন হবে।

তা ছাড়া, ডঃ মিলিক্যান তাঁর সুপরিচিত। কারণ তাঁরা দুজনেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সহযোগিতা কমিটিতে কয়েক বছর একযোগে কাজ করেছিলেন এবং অনেক সময় দুজন একই হোটেলে ছিলেন। তিনি ডঃ মিলিক্যানকে পছন্দ করতেন এবং তাঁর কাজের

তারিফ করতেন। তাই ডঃ মিলিক্যানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন বলে তিনি স্থির করলেন। অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের ক্যালিফোর্নিয়া পরিদর্শনের প্রায় সমস্ত ব্যবস্থা ডঃ মিলিক্যান ও তাঁর সহকর্মীদের উদ্যোগেই রচিত হয়।

আইনষ্টাইনের আমেরিকা পরিদর্শনের সংকল্পের কথা যখন গোপনসূত্রে প্রকাশ পেল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা জায়গা ও নানাজনের কাছ থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগল। ব্যক্তিগত বন্ধুরা আহ্বান জানালেন তাঁদের গৃহে আসার জন্যে, প্রতিষ্ঠানসমূহ আমন্ত্রণ জানালেন বক্তৃতাদানের জন্যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আগ্রহান্বিত হলেন তাঁর উপস্থিতির গৌরব লাভের জন্যে, বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলি তাঁকে পেতে চাইলেন তাঁদের সংস্থায় এসে কাজ করার জন্যে। এই সমস্ত চিঠিপত্র পেয়ে শ্রীমতী আইনষ্টাইন প্রবল উত্তেজনা অনুভব করলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যখন একজন সংবাদদাতা এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আসন্ন ভ্রমণের বিবরণ জানতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁর কাছে এই নিবেদন পেশ করলেন :

‘আপনি অনুগ্রহ করে নিউইয়র্কে এই সংবাদ পাঠাবেন যে, আমাদের আসন্ন ভ্রমণ সম্বন্ধে চতুর্দিকে যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমরা খুশী হয়েছি, কিন্তু এই সমস্ত পরম আতিথেয়তা রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।’

অধ্যাপক আইনষ্টাইন এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ় মতামত জানিয়ে আলোচনায় ছেদ টানতে চাইলেন। তিনি বললেন, তাঁদের জাহাজ যখন নিউইয়র্ক বন্দরে নোঙর করবে, তখন তিনি তীরভূমিতে পদার্পণই করবেন না। দুটি উদ্দেশ্যে তাঁদের এই ভ্রমণ—বিশ্রাম ও কাজ। গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার আগে ভ্রমণপথে তিনি চান বিশ্রাম করতে আর পাসডেনা পৌঁছে চান কাজ করতে।

তাঁর এই অভিমত ঘোষণা করা সত্ত্বেও বিশেষ কোনো ফল হলো না। ক্রমাগতই এত চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম এবং কেবল্‌ আসতে লাগল যে ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে অধ্যাপক আইনষ্টাইন ভয়

পেয়ে গেলেন—ক্যামেরাম্যান ও সাংবাদিকদের সম্মুখীন হতে হবে, জনতার সামনে দাঁড়াতে হবে, বক্তৃতা দান করতে হবে এবং আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর দিতে হবে। যা তাঁকে সবচেয়ে আতঙ্কিত করলো তা হলো এই যে, মার্কিন কোম্পানীগুলি তাদের পণ্যদ্রব্য অনু-মোদনের জন্যে তাঁকে শত সহস্র ডলার দিতে চাইল।

তারা তাঁর কাছে এই আকুতি জানাতে লাগল—'শুধু একটু লিখে দিন যে আপনি আমাদের জীবাণু-নাশক দ্রব্য, আমাদের গানবাজনার যন্ত্রপাতি, আমাদের নেকটাই, হ্যাট, সেভিং ক্রীম ব্যবহার করেন।' যার ক্ষেত্রে যে জিনিস প্রযোজ্য তারা তদনুরূপ অনুরোধ জানাল।

অধ্যাপক আইনষ্টাইন জাহাজে অবস্থানের সংকল্প ঘোষণা করা সত্ত্বেও শ্রীমতী এলসা একটি কারণে নিউইয়র্কের তীরভূমিতে যেতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। রীভারসাইড গীর্জায় যেখানে বিশ্বের চোদ্দজন সুবিখ্যাত বিজ্ঞানীদেব মধ্যে তাঁর স্বামীর প্রতিমূর্তিও আছে, সেটি তিনি দেখতে চান।

অধ্যাপক আইনষ্টাইন তাঁকে বললেন : 'আমার জন্যে সেখানকাব একটা ফটো এনো।'

কিন্তু শ্রীমতী এলসার সনির্বন্ধ অনুবোধে শেষ পর্যন্ত তিনি শুধু রীভারসাইড গীর্জা দেখবার জন্যেই তীরভূমিতে পদার্পণ করতে রাজী হলেন।

স্থির হলো, অধ্যাপক আইনষ্টাইনের নতুন সহযোগী ডঃ ওয়াল্টার মেয়ার তাঁদের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবেন। ডঃ মেয়ার ছিলেন অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত ভিয়েনার একজন গণিতবিশেষজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। যেহেতু আইনষ্টাইন তাঁর কাজের অত্যন্ত তারিফ করতেন, তাই তাঁদের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবার জন্যে ডঃ মেয়ারকে তিনি আহ্বান জানালেন।

অবশেষে ১৯৩০ সালের ২ ডিসেম্বর রেডষ্টার যাত্রীবাহী 'বেলগেন-

ল্যাণ্ড’ জাহাজ যোগে আইনষ্টাইন-দম্পতি শান্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সমুদ্রযাত্রা শুরু করলেন। তাঁদের শান্তির যাতে ব্যাঘাত না হয় সে বিষয়ে অন্যান্য সহযাত্রীরা সচেতন ছিলেন। অধ্যাপক আইনষ্টাইন এবং ডঃ মেয়ার তাঁদের নির্দিষ্ট কক্ষে বসে গণিতের সমস্যা সমাধানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন।

কিন্তু যখন ‘বেলগেনল্যাণ্ড’ জাহাজ নিউইয়র্ক শহরের নর্থ নদীর ৬০ নম্বর জেটির দক্ষিণ পার্শ্বে ভিড়ল, তখন আর শান্তি ও নিস্তব্ধতা বজায় রইলো না। বস্তুত. ‘বেলগেনল্যাণ্ড’ ৬০ নম্বর জেটিতে প্রবেশ করার পূর্বেই আলোড়ন পড়ে গেল। বন্দরের বাইরে সঙ্গরোধকালেই সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা জাহাজে উঠে এল। একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি সমেত তাঁদের ঘোষক ও যন্ত্রবিদকে পাঠালেন, যাতে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের কেবিনে মাইক্রোফোন টাঙিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর অভ্যর্থনার প্রথম প্রত্যুত্তর প্রচার করা যায়।

শ্রীমতী আইনষ্টাইনের ইংরেজি ভাষাজ্ঞান তাঁর স্বামীর চেয়ে অনেক ভালো ছিল। তাই তিনি স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে রক্ষা করলেন এবং তার দোভাষীর কাজ করলেন।

বিচক্ষণ ও নির্বোধ উভয় প্রকারের প্রশ্নই আইনষ্টাইনকে করা হলো।

একজন তাঁকে একটিমাত্র কথায় ‘চতুর্থমাত্রা’ ব্যাখ্যা করতে বললেন।

তিনি উত্তর দিলেন: ‘এ প্রশ্ন অধ্যাত্মবাদীকে আপনার করতে হবে।’

আর একজন বললেন: ‘একটিমাত্র বাক্যে আপেক্ষিকতাবাদ বর্ণনা করুন।’

উত্তরে আইনষ্টাইন বললেন: ‘আপেক্ষিকতাবাদের একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করতে আমার তিন দিন সময়ে লেগে যাবে।’

‘আপনি আপনার বেহালাটা সঙ্গে এনেছেন?’

আইনষ্টাইন বললেন : 'না, সেটা বাড়িতে রেখে এসেছি। কারণ পানামার গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় বেহালার ক্ষতি হতে পারে।'

আইনষ্টাইনকে অনুরোধ জানানো হলো, তিনি একবার ডেকে এসে দাঁড়ান যাতে তাঁর একটা ফটো তোলা যায়। এই কথায় রাজী হয়ে আইনষ্টাইন যখন শান্তভাবে দাঁড়ালেন, তখন বাতাসে তাঁর দীর্ঘ চুল উড়তে লাগল।

আইনষ্টাইন সাংবাদিকদের বললেন : 'আপনাদের এ ব্যাপারে আমার 'পাঞ্চ ও জুডি'র প্রদর্শনীর কথা মনে পড়েছে।

শেষকালে তাঁর পক্ষে আর ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব হলো না। শ্রীমতী আইনষ্টাইনকে রেখে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেলেন। শ্রীমতী এলসা তখন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করলেন।

অবশেষে 'বেলগেনল্যাণ্ড' জাহাজ ৬০ নম্বর জেটিতে এসে লাগল এবং অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে সস্ত্রীক তীরভূমিতে উঠে তাদের জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠোর কর্মক্লান্ত পাঁচটি দিন অতিবাহিত করতে হলো।

সিটি হলের সোপানে মেয়র ওয়াকার তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং শহরে প্রবেশের চাবি অর্পণ করলেন। তাঁরা মোটরযোগে চায়না টাউনের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করলেন। শ্রীমতী আইনষ্টাইনের অভিপ্রায়ানুযায়ী তারা রীভারসাইড গির্জাও দর্শন করলেন। সেখানে ডঃ হ্যারী এমার্সন ফস্‌ডিক এবং ডঃ ইউজীন সি কার্ডার তাঁদের সংবর্ধনা জানালেন। গির্জার সম্মুখস্থ পথে তাঁরা সকলে এক মুহূর্তকাল দার্শনিক, ধর্মনেতা ও বিজ্ঞানীদের খিলানের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেসময় আইনষ্টাইনের ইংরাজি ভাষাজ্ঞান পাকাপোক্ত ছিল না এবং দোভাষীর মাধ্যমেই তিনি কথা বলা পছন্দ করতেন।

বিশ্বের এই মনীষীদের দিকে আইনষ্টাইন যখন তাকিয়েছিলেন তখন তার মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হলো। এই মনীষীদের মধ্যে কাণ্ট,

প্লেটো, কনফুসিয়াস, বুদ্ধ এবং মহম্মদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর মনে হলো এই মহামানবদের মধ্যে অনেকে হচ্ছেন অ-খ্রীষ্টান এবং কেউ কেউ আবার ইহুদী।

এর কারণ তিনি জানতে চাইলেন। জানানো হলো, প্রাজ্ঞজন বলেই তাঁরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

'এমন ব্যাপার ইউরোপে ঘটতে পারত না,' আইনষ্টাইন বললেন, 'আর আমার বিশ্বাস কোনোদিনই এমন ঘটনা ইউরোপে ঘটবে না।'

সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ধরনের মনোভাব যে আমেরিকায় বিদ্যমান তা তিনি উপলব্ধি করলেন।

গির্জায় প্রবেশ করে মধ্যবর্তী গমনপথ দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে লাগলেন। ডঃ কার্ভার গির্জার কাচের জানালায় অঙ্কিত কাহিনী তাঁকে ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন। পথের তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রম করার পর অধ্যাপক আইনষ্টাইন দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তের পূর্ণ গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই প্রতীকা প্রতিমূর্তিগুলির মধ্যে আমিই কি একমাত্র জীবিত ব্যক্তি?'

উত্তর হলো: 'হ্যাঁ, ইতিহাসের মধ্য থেকে ছ' শত চরিত্র এখানে রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে আপনিই হচ্ছেন একমাত্র জীবিত ব্যক্তি।'

ডঃ আইনষ্টাইন মাথা নেড়ে বললেন: 'তা হলে অবশিষ্ট জীবনে আমাকে সতর্ক হয়ে কাজ করতে ও কথাবার্তা বলতে হবে।'

নিউইয়র্কে পদার্পণের তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আইনষ্টাইন-দম্পতি মেট্রোপলিটন অপেরা হাউসে 'কারমেন' অনুষ্ঠান শোনবার জন্যে ৪৮ নম্বর বক্স-এ এসে বসলেন। প্রধান ভূমিকায় গান গাইলেন মাসিয়া জেরিৎজা। বক্স-এ আইনষ্টাইন-দম্পতির সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহযোগী ডঃ মেয়ার এবং তাঁর একান্ত সচিব কুমারী হেলন ডুকাস্।

প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্বর্তী বিরতির সময় খবর ছড়িয়ে পড়ল যে অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আইনষ্টাইন উপস্থিত রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হলো, ঘাড় ও মাথা বেঁকিয়ে লোকেরা তাঁকে

দেখার চেষ্টা করল এবং আনন্দোচ্ছ্বাস-ধ্বনি শুরু হলো। এই আনন্দোচ্ছ্বাস-ধ্বনি যে তাঁকে উপলক্ষ করেই তা আইনষ্টাইন বুঝতে পারেন নি, যতক্ষণ না তাঁর স্ত্রী তাঁকে ঠেলে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন। সৌজন্যবশে ডঃ আইনষ্টাইন দাঁড়িয়ে উঠে অভিবাদন জানালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দোচ্ছ্বাস-ধ্বনি আগের চেয়ে আরও উচ্চ গ্রামে উঠলো।

বেশ কয়েক মিনিট কাল এই উচ্ছ্বাসধ্বনি চললো এবং তা শেষ হলে অর্কেষ্ট্রা আরম্ভ হলো।

পরদিন সন্ধ্যায় আর্টুরো টোসক্যানিনির পরিচালনায় বিটোফেন রচিত আধ্যাত্মিক ঐক্যতানবাদন শোনার জন্যে আইনষ্টাইন-দম্পতি আবার অপেরা হাউসে এলেন।

যদিও টোসক্যানিনির সঙ্গে আইনষ্টাইনের কখনও নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল না, তবু বহুদিন থেকে তিনি টোসক্যানিনির ভক্ত ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, টোসক্যানিনি একজন মহৎ শিল্পী এবং একজন সচ্চরিত্র ও সাহসী ব্যক্তি।

এই সময় আইনষ্টাইন একটি বিশেষ সামাজিক সাক্ষাতের জন্যে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। ভারতীয় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন নিউইয়র্কে ছিলেন। ক্যাপুথে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ করেন, তার স্মরণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে তিনি উৎসুক হন।

কথা ছিল, রবীন্দ্রনাথ 'বেলগেনল্যাণ্ড' জাহাজে এসে আইন-ষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। কিন্তু আইনষ্টাইনের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বয়সে বড় হওয়ায় এবং তাঁর শরীর ভালো না থাকায় আইনষ্টাইন ১১৭২ নম্বর পার্ক এভিনিউতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

'বেলগেনল্যাণ্ড' আবার সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিল। এবার যাত্রা পানামা অভিমুখে। পানামা খালের স্তর পরিবর্তন স্থানটি 'বেলগেন-ল্যাণ্ড' যখন আস্তে আস্তে পার হচ্ছিল, তখন অধ্যাপক আইনষ্টাইন তামাটে রঙের লিনেন পোশাক ও চটি জুতো পরে অন্যান্য যাত্রীদের

সঙ্গে রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। পরিবর্তনশীল জলস্তর দেখে তিনি মুগ্ধ হন।

অনেকের ধারণা, পানামা খাল পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। এটি প্রথমে গ্যাটুন লকস্-এর মধ্য দিয়ে সরাসরি দক্ষিণদিকে গ্যাটুন হ্রদের দিকে বয়ে যায় এবং তারপর সত্যসত্যই পূর্বদিকে ঘুরে দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে পানামা উপসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয়। গ্যাটুন লকস্ আছে তিনটি এবং তারা প্রায় ৮৫ ফিট জলস্তর উন্নীত করার পর জাহাজ গ্যাটুন হ্রদে এসে পৌঁছায়। গ্যাটুন হ্রদ পার হয়ে জাহাজ গেলার্ড সঙ্গম ও পরে পেড্রো মিগুয়েল লক্‌সে পৌঁছায়। সেখান থেকে জলস্তর ক্রমশ নিচু হয়। এইভাবে ৬৪ কিলোমিটার অধিক পথ অতিক্রম করার পর অবশেষে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে এসে উপস্থিত হয়।

পানামাতেও ডঃ আইনষ্টাইন তাঁর খ্যাতির ব্যাপ্তি রোধ করতে পারেন নি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরা তাঁদের সূক্ষ্মতম শিল্পনিদর্শন একটি মনোরম পানামা টুপি আইনষ্টাইনকে উপহার দিলেন। এই টুপি এত হালকা যে এর ওজন মাত্র এক আউন্স এবং এত সূক্ষ্ম যে একটি আংটির ভিতব দিযে গলিয়ে বার করা যায়।

নববর্ষের দিনে বেলগেনল্যাণ্ড জাহাজ ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো বন্দরে এসে নোঙর ফেললো। পুনরায় সাংবাদিকেরা ক্যামেবা ও মাইক্রোফোন নিয়ে জাহাজে উপস্থিত হলেন এবং অধ্যাপক আইনষ্টাইন বেতার মারফৎ ক্যালিফোর্নিয়াবাসীদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন। আইনষ্টাইন-দম্পতি এমন সময় ক্যালি-ফোর্নিয়ায় উপস্থিত হলেন যখন সেখানে গোলাপ ফুল প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা হচ্ছিল।

তাঁদের গন্তব্যস্থল ছিল পাসাডেনা—ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং উইলসন পর্বত বীক্ষণাগার।

অধ্যাপক আইনষ্টাইন অন্যান্য স্থানে যেমন অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন

ক্যালিফোর্নিয়ার অধিবাসীরাও তাঁকে সেভাবে একান্ত আপন করে নিতে চাইল। একজন চলচ্চিত্র প্রযোজক একটি ছবি তোলার জন্যে অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থদানের প্রস্তাব পেশ করলেন। তাঁর কথা শুনে আইনষ্টাইন স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, আমি অভিনেতা হতে চাই না।'

একজন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল, বার্লিনে তিনি ছবি তোলার জন্যে সম্মত হয়েছিলেন এবং তাতে তাঁর স্ত্রী তাঁর হয়ে কথা বলেছিলেন। শ্রীমতী আইনষ্টাইন উত্তর দিলেন, বার্লিনে তিনি ছবি তুলতে দিতে সম্মত হয়েছিলেন কেবলমাত্র এই শর্তে যে, তার সমস্ত লভ্যাংশ অনাথ শিশুদের জন্যে ব্যয়িত হবে।

অধ্যাপক আইনষ্টাইন সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে বেশি সময় নষ্ট করতেন না। পাসাডেনায় তাঁর অধিকাংশ সময় বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় অতিবাহিত হত। কারণ ডঃ আইনষ্টাইনের ইউরোপে প্রত্যাবর্তনের আগে আর মাত্র ছ'টি মূল্যবান সপ্তাহ ছিল ডঃ মিলিকান ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করার এবং তাঁরা এই সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন

ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিট্যুট প্রতি বছর শীতকালে একজন বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানীকে পরিদর্শক-অধ্যাপকরূপে আসবার আমন্ত্রণ জানান। ইউরোপের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এভাবে ক্যালিফোর্নিয়ায় এসেছেন। আইনষ্টাইন ছিলেন এই বিশিষ্টদের মধ্যে একজন। নরওয়ে, জার্মানী, ভারত এবং হল্যাণ্ড থেকে বিজ্ঞানীরা এখানে এসেছেন। যেমন কয়েক বছর আগে ডঃ আইনষ্টাইনের সুহৃদ হল্যাণ্ডের লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এইচ. এ. লোরেনৎস্ পরিদর্শক-অধ্যাপকরূপে এখানে এসেছিলেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার উইলসন পর্বত-শীর্ষে যে সুবৃহৎ প্রতিফলক দূরবীক্ষণটি আছে আইনষ্টাইন সেটা দেখতে ভোলেন নি। এটি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম দূরবীক্ষণ। এর দর্পণের ব্যাস হচ্ছে এক শত ইঞ্চি। 'শত ইঞ্চি চক্ষু' নামে এটি আখ্যাত। ডঃ আইনষ্টাইনকে

বলা হয়েছিল, এর চেয়ে আরও বহুগুণ বড় দুইশত ইঞ্চি চক্ষু-বিশিষ্ট দূরবীক্ষণ নির্মাণের পরিকল্পনা ইনস্টিট্যুট করেছে। এর সাহায্যে এতদিন পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদৃশ্য অংশগুলি মানুষের দৃষ্টিগোচরে এনে দেওয়া হবে।

ইনস্টিট্যুটে আইনষ্টাইনের কাজ এত মূল্যবান হয়েছিল যে স্থির হয়, তিনি আরও দু'বার এখানে ফিরে আসবেন। পরবর্তী দুটি শীতকালে পাসাডেনা অভিমুখে আবার তিনি যাত্রা করেছিলেন।

আইনষ্টাইন-দম্পতি স্থির করেন, মার্চের প্রথম সপ্তাহে তাঁরা নিউইয়র্ক থেকে জার্মানী অভিমুখে যাত্রা করবেন। কিন্তু এবার আর তাঁরা পানামা খালের পথ দিয়ে গেলেন না। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের বিশাল সমভূমি ও পাহাড়পর্বতগুলি তাঁরা দেখতে চাইলেন। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে তাঁরা যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন অধ্যাপক আইনষ্টাইন একটা জিনিস উপলব্ধি করলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি ভালবাসতে আরম্ভ করেছেন।

এরিজোনায় কোলোরাডো নদীর বিশাল গিরিসঙ্কটে তিনি যখন পৌঁছান, তখন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়। হোপী ইণ্ডিয়ানরা তাদের দলপতিরূপে তাঁকে বরণ করল। তাদের প্রথানুযায়ী ডঃ আইনষ্টাইনের একটি নতুন নামকরণের প্রয়োজন এবং সে নামটা এমন হবে যাতে তাঁর কাজের সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ থাকবে। কিন্তু আইনষ্টাইনকে কি নাম দেওয়া যায় তা নিয়ে হোপী ইণ্ডিয়ানরা একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

হোপী ইণ্ডিয়ানরা জানতে চাইল, তিনি কি কাজ করেন?

উত্তর হলো: 'তিনি আপেক্ষিকতাবাদ (থিওরী অফ রিলেটিভিটি) আবিষ্কার করেছেন।'

তারা বললো: 'ঠিক আছে, আমরা ওঁকে 'গ্রেট রিলেটিভ' বলে ডাকব।'

এবং তারপর থেকে বিশাল গিরিসঙ্কট অঞ্চলের হোপী ইণ্ডিয়ানদের কাছে তিনি 'গ্রেট রিলেটিভ' হয়ে গেলেন।

অবশেষে চিরাচরিত উপহার, ডালি ও পুষ্পসম্ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আইনষ্টাইন-দম্পতি জার্মানীতে নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক থেকে জাহাজে আরোহণ করলেন।

বিদায়কালে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল : 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আপনার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা কি হয়েছে ?'

'আমার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা হয়েছে', আইনষ্টাইন বললেন, 'মার্কিন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের বিষয় জানতে পাবা।'

ঊনবিংশ অধ্যায়

তাঁর মস্তকের জন্যে সহস্র পাউণ্ড

১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে পরবর্তী দুটি পরিভ্রমণের সময় ডঃ আইনষ্টাইন তাঁকে নিয়ে হৈ চৈ পরিহারের জন্যে সতর্ক হয়েছিলেন। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে তাঁদের ভ্রমণের পরিকল্পনার বিষয় কেউ জানতে পারার পূর্বেই তিনি এবং শ্রীমতী আইনষ্টাইন 'অ্যাণ্টওয়ার্প' জাহাজে আরোহণ করেন। এবার তাঁরা নিউইয়র্কে থামেন নি, কিন্তু পানামা খাল ও পশ্চিম উপকূল ভাগ দিয়ে সরাসরি চলে যান।

অধ্যাপক আইনষ্টাইন তাঁর বিশ্বখ্যাতি থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পেতে পারেন নি এবং কোলনে তাঁকে একটি সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছিল। পূর্ববর্তী ভ্রমণে পাওয়া পানামা টুপি পরে তিনি জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালেন এবং শ্রীমতী আইনষ্টাইন তাঁর পাশে রইলেন দোভাষীরূপে।

সেসময় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হিটলার ও জার্মানীর সংবাদে পরিপূর্ণ। কিন্তু সাংবাদিকের দল এ সম্পর্কে তাঁকে অজস্র প্রশ্ন করা সত্ত্বেও অধ্যাপক আইনষ্টাইন তৎকালীন রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোনো মন্তব্যই করলেন না। কারণ তিনি রাজনীতিক নন —তিনি বিজ্ঞানী।

ডঃ মিলিক্যান এবং তাঁর সহযোগীরা আইনষ্টাইন-দম্পতি যাতে শান্ত পরিবেশে অবস্থান করতে পারেন সেজন্যে অত্যন্ত যত্নবান

হয়েছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিট্যুটের এলাকায় আইনষ্টাইন-দম্পতির অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং সেখানে ডঃ আইনষ্টাইনের সমগ্র সময় বিজ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত হত। সেসময় বিশ্ব-পরিস্থিতি এমন একটা বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পৌঁচেছিল যে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

অবশেষে আইনষ্টাইন-দম্পতির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের দিন শেষ হয়ে এলো। স্বদেশাভিমুখে যাত্রার পূর্বদিন সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে মিলিত হতে তাঁরা সম্মত হলেন। সাংবাদিকের দল ছুটে এলো এবং অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলো।

—'অন্যান্য গ্রহেও কি প্রাণী বাস করে?'

—'আমি জানি না। তবে তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয় জাগা সম্ভব নয়।'

'জার্মানীর নির্বাচনে হিটলার কি নির্বাচিত হবেন?'

'আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি অকৃতকার্য হলেই তাঁর নিজের পক্ষে ভালো হবে।'

'আপনি কি আশা করেন একক ক্ষেত্র-তত্ত্বের সম্প্রসারণ সাধনে আপনার জীবনের অবশিষ্ট কালের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হবে?'

'এই তত্ত্ব সম্পর্কেই আমার জীবনের অবশিষ্টকাল কাজ করতে হবে।'

'সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলা আপনার কি সহজ মনে হচ্ছে না?'

'একটি জার্মান প্রবাদ আছে—যে কেউ ফাঁসি-কাঠে ঝোলায় অভ্যস্ত হতে পারে।'

সাংবাদিকেরা এ কথা শুনে হেসে উঠল। অধ্যাপক আইনষ্টাইনের এই সূক্ষ্ম রসিকতাবোধের জন্যে সাংবাদিকেরা তাঁর সঙ্গে কথা বলে সব সময় গভীর আনন্দ পেতেন।

ডঃ আব্রাহাম ফ্লেক্সনার পাসাডেনায় ডঃ আইনষ্টাইনের সঙ্গে

মিলিত হন। ডঃ আইনষ্টাইনের সঙ্গে যারা একবার মিলিত হয়েছেন কেউ তাঁকে ভুলতে পারেন নি। নিউ জার্সির অন্তর্গত প্রিন্সটনে একটি উচ্চ গবেষণামন্দির (ইনস্টিট্যুট ফর অ্যাডভান্সড্ স্টাডি) স্থাপনের জন্যে ডঃ ফ্লেক্সনার, মিঃ লুই ব্যামবার্জাব ও তাঁর বোন শ্রীমতী ফেল্কিস্ ফ্লুডের সঙ্গে চেষ্টা করেছিলেন। মিঃ ব্যামবার্জার ও তাঁর বোন ইনস্টিট্যুট প্রতিষ্ঠার জন্যে পাঁচ মিলিয়ন ডলার দান কবেন এবং ডঃ ফ্লেক্সনার এর পরিচালন দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এই ইনস্টিট্যাটটি একটু নতুন ও ভিন্নধরনের। এখানে উচ্চশিক্ষিত ছাত্রদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পুরোধাদেব সংস্পর্শে আসার সুযোগ দেওয়া হবে ইনস্টিট্যুটে প্রবেশের সবানম্ন যোগ্যতা হচ্ছে ডক্টরেট ডিগ্রী, কিন্তু শুধুমাত্র সেটাই পর্যাপ্ত নয়। ইনস্টিট্যুটেব ছাত্র হতে হলে প্রার্থীকে এক বছর বা দু'বছর যাবং অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও মহৎ সম্ভাবনার নিদর্শন দাখিল করতে হবে।

যদিও এই ইনস্টিট্যাটটি নিউ জার্সিব প্রিন্সটনে যুক্ত হল-এ অবস্থিত ছিল, কিন্তু প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়েব সঙ্গে এব কোন সম্পর্ক ছিল না। ইনস্টিট্যুট এবং বিশ্ববিদ্যালয়েব মধ্যে কাজের নিমিত্ত যোগাযোগ ছিল এবং ইনস্টিট্যুটের সদস্যবা বিশ্ববিদ্যালয়েব গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার তাঁদের নিজস্ব গ্রন্থাগারের তুলনায় অনেক বড় এবং সেখানে প্রযুক্তি-বিদ্যা সংক্রান্ত বই-এর সংখ্যাব চেয়ে অন্যান্য বিষযেব বই অনেক বেশি। ১৯৪৫ সালে ইনস্টিট্যুট প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের জন্যে অর্ধ মিলিয়ন ডলার দান করে।

ডঃ ফ্লেক্সনার ও ডঃ আইনষ্টাইন উভয়ে যখন ক্যালিফোনিয়ায় ছিলেন, সেসময় ফ্লেক্সনাব ইনস্টিট্যুট সম্পর্কে আইনষ্টাইনের সঙ্গে আলোচনায আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু আইনষ্টাইনের সীমিত সময়ের কথা ভেবে সাক্ষাতের দিনক্ষণ নির্ধারণে ইতস্ততঃ বোধ করেন। অবশেষে অপর একজন অধ্যাপক তাঁকে ডঃ আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাতেব জন্যে বিশেষ অনুরোধ জানান। তখন তিনি ক্যালি-

কোনিয়া ইনস্টিট্যুটের প্রাঙ্গণে আইনষ্টাইন-দম্পতির সাময়িক আবাস স্থলে সাক্ষাৎ করলেন।

ডঃ আইনষ্টাইন তাঁর সঙ্গে এক ঘণ্টার বেশি সময় কথাবার্তা বলেছিলেন। তাঁদের কথাবার্তা আরও হত, যদি না শ্রীমতী আইন-ষ্টাইন একটি ভোজ-অনুষ্ঠানে যোগদানেব কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। ডঃ ফ্লেক্সনার বিদায় গ্রহণের জন্যে উঠলে ডঃ আইনষ্টাইন তাঁকে অনুরোধ করলেন—যদি তিনি ইউরোপে আসার মতলব করেন তা হলে যেন তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করেন।

ডঃ আইনষ্টাইন তাঁকে বললেন: 'বসন্তকালে আমি থাকব অক্সফোর্ডে এবং গ্রীষ্মকালে থাকব জার্মানীতে।'

ডঃ ফ্লেক্সনার উভয়স্থানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সাক্ষাৎকারের পব ডঃ ফ্লেক্সনার লিখে-ছিলেন: 'তাঁর ভদ্র আচরণে, সরল সুন্দব ব্যবহারে এবং আন্তরিক অমায়িকতায় আমি বিমুগ্ধ হয়েছিলুম।'

এরপর তাঁরা দুজনে অক্সফোর্ডে মিলিত হয়ে ইনস্টিট্যুট সম্বন্ধে আরও বিশদ অলোচনা করেছিলেন এবং জুন মাসে ফ্লেক্সনার জার্মানীর ক্যাপুথে আইনষ্টাইন-দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ডঃ ফ্লেক্সনার প্রথমে ভাবতে পারেন নি যে, আইনষ্টাইন নিজের থেকে প্রিন্সটনে এই নতুন ইনস্টিট্যুটে যোগদানে আগ্রহান্বিত হবেন, কিন্তু শেষকালে তিনি নিজের দিক থেকে ডঃ আইনষ্টাইনকে একটি পদগ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ক্যাপুথে সাক্ষাৎকারের সময় তাঁরা এ বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা স্থির করলেন: ডঃ আইনষ্টাইন মূল ফ্যাকাল্টির একজন আজীবন সদস্য হবেন এবং সেখানে তাঁর কাজ প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমির অনুরূপ হবে, অর্থাৎ গবেষণা ও অধ্যয়ন-মনন।

অধ্যাপক আইনষ্টাইন ডঃ ফ্লেক্সনারকে বুঝিয়ে বললেন, চিরদিনের মত তিনি জার্মানী ছেড়ে যেতে চান না। তিনি জার্মানীর লোক; জার্মানী তাঁর জন্মভূমি।

'আমি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করব,' তিনি বললেন, 'যদি প্রতি বছর কেবল পাঁচ মাস কাল আমাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে দেওয়া হয়। আমার অবশিষ্ট সময় জার্মানীতে অতিবাহিত করতে চাই।'

১৯৩২ সালে জার্মানীতে অন্যান্য অনেক ইহুদীর মত অধ্যাপক আইনষ্টাইন উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, অবস্থা কত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এবং হিটলার সত্যসত্যই কত শক্তিশালী হয়েছেন। রাজনীতি তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করতেন না, তাঁর আগ্রহ ছিল বিজ্ঞানে।

পরবর্তী প্রশ্ন যা ইনস্টিট্যুট ও তাঁর নিজের মধ্যে মীমাংসিত হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে বেতনের প্রশ্ন। তিনি কত বেতন চান? তিনি এমন একটা অল্প পরিমাণ বেতনের উল্লেখ করলেন যে, ইনস্টিট্যুটের পরিচালকবর্গ তাতে বিব্রত বোধ করলেন। তাঁরা অবিলম্বে জানালেন, তাঁর বেতন অনেক বেশি হওয়া উচিত এবং সেই অঙ্কের কম হলে ইনস্টিট্যুটের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।

মনে হলো, সব কিছুই মীমাংসিত হয়ে গেল। কিন্তু জনবন্দিত ব্যক্তির কাছে অসুবিধা সৃষ্টির জন্যে কেউ না কেউ যেন সব সময় এসে হাজির হয়। 'উওমেনস্ প্যাট্রিয়টিক অরগ্যানিজেশন' নামে অভিহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মহিলা সংস্থা অধ্যাপক আইন-ষ্টাইনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার না দেবার জন্যে প্রকাশ্যে দাবি জানাল। তারা অনুযোগ করল, তিনি একজন কম্যুনিষ্ট। এই সম্পর্কে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে একটি সরকারী প্রতিবাদও পেশ করল।

ডঃ আইনষ্টাইন ব্যাপারটিকে সেসময় গভীরভাবে গ্রহণ করেন নি। তিনি সংবাদপত্র মহলে একটি চিঠি লিখে জানালেন, এ ব্যাপারে তিনি আদৌ বিব্রত বোধ করেন না।

এই চিঠির একাংশে তিনি লিখেছিলেন: 'ইতিপূর্বে আর কখনও মহিলাদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার প্রগতির এমন অত্যুৎসাহী প্রত্যাখ্যান লাভের অভিজ্ঞতা আমার হয় নি; যদিও বা হয়ে থাকে,

তা একসঙ্গে এতজনের থেকে হয় নি কখনও।' চিঠির উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন, 'অতএব আপনাদের সুচতুর ও দেশপ্রেমিক নারী সম্প্রদায়ের প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং স্মরণ রাখবেন মহাপরাক্রান্ত রোমের রাজধানী একদা হংসীদের প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজের দ্বারা রক্ষা পেয়েছিল।'

এখানেই এই ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত ছিল। আইন-ষ্টাইন-দম্পতি বার্লিনস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ভিসার জন্যে আবেদন করলেন। যখন তাঁরা জিনিসপত্র বাঁধছিলেন, রাষ্ট্রদূতের কার্যালয় থেকে টেলিফোনে তাঁদের ডাকা হলো।

'অধ্যাপক আইনষ্টাইন, কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে আমাদের কার্যালয়ে একবার আসবেন অনুগ্রহ করে?'

'আপনারা যদি ভিসাটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, তা হলে আরও ভালো হয়,' ডঃ আইনষ্টাইন উত্তর দিলেন।

রাষ্ট্রদূত তাঁকে আসবার জন্যে অনুনয় করলেন। ডঃ আইনষ্টাইন বুঝতে পারলেন না, তিনি কেন অনুনয় করছেন। এর আগের সব পরিভ্রমণের সময় জাহাজ কোম্পানী সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। যা হোক, তিনি রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়ে গেলেন।

তিনি সেখানে উপস্থিত হলে তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হলো: আপনার রাজনীতিক মতবাদ কি? আপনি কোন্ সংস্থাভুক্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আপনার গমনের উদ্দেশ্য কি? আপনি সেখানে কি ধরনের কাজ করবেন? আর অন্য কিছু জানাবার আছে?—এইভাবে দীর্ঘ ৪৫ মিনিট কাল তাঁকে প্রশ্ন করা হলো।

অধ্যাপক আইনষ্টাইন ছিলেন একজন ধৈর্যশীল মানুষ। তিনি সহজে কখনও ক্রোধান্বিত হতেন না। কিন্তু তাঁকে যদি অত্যধিক উত্যক্ত করা হত, তখন তিনি সত্যসত্যই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। এইসব প্রশ্নবাণে বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি টুপি ও কোট তুলে নিলেন।

'আপনারা কি মনে করেন আমাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতেই হবে? না, তার কোন প্রয়োজন নেই।'

একথা বলেই তিনি বেরিয়ে এলেন এবং হ্যাবারল্যাণ্ড সরণিতে তাঁর বাসভবনে ফিরে গেলেন।

জনসাধারণের মধ্যে যখন প্রচারিত হলো যে আইনষ্টাইন-দম্পতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমনের প্রবেশাধিকার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তখন চারিদিক থেকে তারবার্তা আসতে লাগল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা চিঠি ও টেলিগ্রামে ওয়াশিংটন ছেয়ে ফেলল। বার্লিনে আইনষ্টাইন-দম্পতিকে টেলিগ্রাম ও কেবলগ্রাম যোগে জানানো হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁরা স্বাগত। ওয়াশিংটন ও বার্লিন দূতাবাসের মধ্যে তারবার্তা বিনিময় হলো। কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই ব্যাপারে বিপাকে পড়লেন।

দূতাবাস থেকে যখন তাঁকে পুনরায় টেলিফোনে ডাকা হলো, তখন আইনষ্টাইনের বেশি কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল না।

তিনি তাঁদের বললেন: 'ছ'টা ট্রাঙ্ক আমি গুছিয়ে নিয়েছি এবং আগামীকাল মধ্যাহ্নের মধ্যে সেগুলিকে জাহাজযোগে ব্রিমেনে নিশ্চিত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং আগামী কাল দ্বিপ্রহরের মধ্যে আমরা যদি ভিসা না পাই, তা হলে আমেরিকায় পুনরায় যাওয়ার এখানেই চিরদিনের মত ইতি হবে।'

সাধারণত এত শীঘ্র ভিসা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওয়াশিংটনকে জানিয়ে দেওয়া হলো, অধ্যাপক ও শ্রীমতী আইনষ্টাইনকে ভিসা মঞ্জুর করা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আইনষ্টাইন-দম্পতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করলেন। আগের মত এবারও পানামা খালের মধ্য দিয়ে তাঁরা গেলেন। স্থির হলো ফেরার পথে তাঁরা প্রিন্সটনে চূড়ান্ত আলোচনার জন্যে নামবেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁদের সম্ভবত এই শেষ যাত্রা। কারণ পরবর্তী অক্টোবরে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের নতুন কাজ আরম্ভ করবার কথা।

আইনষ্টাইন-দম্পতিকে এবার যতদূর সম্ভব প্রচার ও হৈ চৈ থেকে রক্ষা করা হয়েছিল। তাঁরা পুনরায় ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিট্যুটের প্রাঙ্গণে অবস্থান করেছিলেন এবং ডঃ আইনষ্টাইন তাঁর সমস্ত সময় ডঃ মিলিক্যান ও অন্যান্যদের বৈজ্ঞানিক কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আইনষ্টাইনরা যখন পূর্বদিকে শিকাগো থেকে নিউইয়র্কে আসার জন্যে ক্যালিফোনিয়া ত্যাগ করছিলেন, ইউরোপে তখন ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এত দ্রুত সংঘটিত হচ্ছিল যে বাইরে থেকে তা উপলব্ধি করার উপায় ছিল না।

রাইখস্টাগ ছিল জার্মানীর প্রতিনিধি-সভা। ১৯৩০ সালের কথায় ফিরে এলে দেখা যায়, তখন নাৎসী দল প্রায় ৩৫ মিলিয়ন ভোটের মধ্যে ৬ মিলিয়নেরও বেশি ভোট লাভ করে এবং তার ফলে রাইখস্টাগে কয়েকটি আসন দখল করে। পরবর্তী নির্বাচনে তারা আরও ভালো ফল প্রদর্শন করে। ৬০৭টি আসনের মধ্যে ২৩০টি আসন তারা লাভ করে। এর ফলে তারা রাইখস্টাগে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। ১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকালে হিটলার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের এত কাছাকাছি আসেন যে পরবর্তী কয়েক-মাসে তিনি রাইখস্টাগ সম্পূর্ণ ভেঙে দেন এবং স্বহস্তে সমস্ত শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

হিটলার যখন রাইখস্টাগের সদস্যদের গৃহে পাঠিয়ে দিলেন. এরপর আব কোন অধিবেশনে যোগদানের বিষয়ে তাদের মাথা ঘামাতে বারণ করলেন, তখন তিনি কার্যত জার্মানীর চ্যান্সেলার হয়ে গেছেন। তাঁর ঝটিকাবাহিনী এবং গেস্টাপো দল দিনের দিন শক্তিশালী হতে লাগল। জার্মানী থেকে হিংস্রতা, বর্বরতা ও হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসতে লাগল।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে জার্মানীতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তাতে জয়লাভের জন্যে হিটলার স্থির-নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন, কারণ এতে জয়লাভ করলে শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণ তাঁর হাতে আসবে। এর জন্যে যেটা তাঁর প্রয়োজন ছিল সেটা হচ্ছে একটা চমকপ্রদ

প্রচার কৌশল। তিনি যা মতলব করেছিলেন সেটা ঐতিহাসিক অ্যাখ্যা লাভ করেছে : পরিত্যক্ত রাইখস্টাগ ভবনে 'অজানা' উৎস থেকে আগুন লেগে গেল। হিটলার সঙ্গে সঙ্গে অনুযোগ করলেন, কম্যুনিষ্টরা ভোটদাতাদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে এই আগুন লাগিয়েছে। অদ্ভুত ও কৌতূহলকর যোগাযোগ হচ্ছে এই যে, রাত্রি ৯টার সময় যখন এই আগুন লাগে, হিটলার তখন বার্লিনে ।ছলেন এবং তাঁর ঝটিকাবাহিনী অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়ে সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করে। তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রায় পনের শত লোককে গ্রেপ্তার করা হলো। এই পনের শত হতভাগ্য লোক এবং তাদের পর আরও শত শত লোকের তালিকা নিঃসন্দেহে আগে থেকে তৈরি করা ছিল।

এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে। এর কয়েকদিন পরে হিটলার তাঁর মার্চ নির্বাচন সম্পন্ন করেন এবং তাতে সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত হিটলার জার্মানীর ডিক্টেটর হলেন!

ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান এবার ঘৃণ্য প্রতিহিংসারূপে প্রকাশ পেল এবং ব্যক্তিগতভাবে আইনষ্টাইনের বিরুদ্ধে জেহাদ পুরোমাত্রায় শুরু হলো। ইহুদী আইনষ্টাইনকে সৎ জার্মান বলে সম্ভবত ভাবা যেতে পারে না এবং সে কারণে তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব হচ্ছে একটা 'কলঙ্কময় তত্ত্ব'। আইনষ্টাইন তাঁর 'অবিবেচক কাজের দ্বারা' জার্মান বিজ্ঞানে 'সংশয় সৃষ্টি' করছেন। ইহুদী জাতি মনীষা-বন্ধ্যাত্ব-দুষ্ট। সুতরাং একজন ইহুদী নতুন বৈজ্ঞানিক ভাবধারা কি করে সৃষ্টি করতে পারে? সে যাই হোক, বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বাইরে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। বিজ্ঞান হওয়া উচিত রাষ্ট্রের একটি অস্ত্র বা যন্ত্রস্বরূপ—রাজনীতির পরিচায়ক।

নাৎসীদের যুক্তি বোঝার চেষ্টা না করাই ভালো। কারণ এই যুক্তি বুদ্ধিশালীদের বিচার-বিশ্লেষণের জন্যে নয়। কিন্তু অ্যালবার্ট

আইনষ্টাইনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার পেছনে ছিল এই ধরনের অদ্ভুত যুক্তি ও ধারণা।

একটি ভোজসভায় যোগদানের জন্যে আইনষ্টাইনরা শিকাগোতে পৌঁছবার পর ঘোষণা করলেন, তাঁরা আর জার্মানীতে ফিরে যাবেন না, তার পরিবর্তে যাবেন বেলজিয়ামে। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা বিজ্ঞজনোচিত হয়েছিল। কারণ ১৯৩৩ সালে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন যদি জার্মানীতে ফিরে যেতেন তা হলে তিনি জীবিত থাকতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

আইনষ্টাইন যখন নিউইয়র্কের গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছলেন, তখন শত শত লোক তাঁকে দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। জনতার ভীড় পরিহারের জন্যে তাঁকে ও শ্রীমতী এলসাকে একটি প্রাইভেট লিফ্‌ট-এ করে স্টেশনের উপরতলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তারপর সেখান থেকে তাড়াতাড়ি একটি অপেক্ষমাণ মোটরগাড়ীতে তুলে দেওয়া হলো। কিন্তু তাঁর পলায়নের কথা অনুরাগীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা স্টেশন থেকে গাড়ির দিকে ধাবিত হলো। যতক্ষণ তাঁদের ছবি তোলা হলো এবং জনতা হর্ষধ্বনি করলো, ততক্ষণ ডঃ আইনষ্টাইন হাসিমুখে ও প্রফুল্লচিত্তে বসেছিলেন। তারপর তিনি ওয়াল্ডর্ফ অ্যাসোরিয়া হোটেল অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

হোটেলে পৌঁছবার পর আইনষ্টাইন অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সাংবাদিকেরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে বার বার অনুনয় করছিলেন। জার্মানীতে পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি কি মনে করেন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি সে বিষয়ে তাঁরা জানতে চাইছিলেন। শেষকালে আইনষ্টাইন কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত হন, যদি সে প্রশ্নগুলি লিখে তাঁর কক্ষে পাঠানো হয়। আইনষ্টাইনের কাছ থেকে যে সকল উত্তর এসেছিল তার মধ্যে ছিল তাঁর চমকপ্রদ ও সরকারী ঘোষণা ঃ

'বর্তমানের মত অবস্থা জার্মানীতে যতদিন থাকবে ততদিন আমি জার্মানভূমিতে পদার্পণ করতে চাই না।'

তাঁর এই ঘোষণায় প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের ৫৪তম জন্মদিন উপলক্ষে সেদিন সন্ধ্যায় আইনষ্টাইন-দম্পতির সম্মানার্থে আয়োজিত হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিন বন্ধুদের নৈশভোজে তাঁরা যোগদান করেন। প্রকাশ্যে হিটলারকে উপেক্ষা করার মত শক্তিধর ব্যক্তিটির সঙ্গে মিলিত হবার নৈশভোজে সমাগত অগণিত অতিথিরা উৎসুক হয়েছিলেন।

আইনষ্টাইনরা আর বিশ্রামের অবসর পেলেন না। পরের দিন অপরাহ্ণে তাঁদের সম্মানার্থে বিশিষ্ট মার্কিন শান্তিবাদীদের প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় তাঁরা যোগদান করলেন। সেই সভায় অধ্যাপক আইন-ষ্টাইন ও শ্রীমতী এলসা দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের সম্মুখে দীর্ঘ সারিবদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে অক্লান্তভাবে একের পর এক করমর্দন করলেন।

আইনষ্টাইনদের আর একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে হয়েছিল, সেটা হচ্ছে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ রক্ষা। পরবর্তী অক্টোবরে অধ্যাপক আইনষ্টাইন যখন ইনিষ্টিট্যুট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিতে ডঃ ফ্লেক্সনারের সঙ্গে কাজ করার জন্যে প্রত্যাবর্তন করবেন তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করবার জন্যে তাঁরা প্রিন্সটনে গমন করলেন।

প্রিন্সটন যাবার পর আইনষ্টাইনরা অচিরে সাগরবক্ষে আবার পাড়ি দিলেন বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যে। বেলজিয়ামে 'কক্-সুর-মের' নামে সমুদ্রোপকূলবর্তী একটি শহরে তাঁহারা অবস্থান করবেন।

ইত্যবসরে নাৎসীরা তাদের ইহুদী-বিরোধী অভিযান পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা তারস্বরে ঘোষণা করল, আইনষ্টাইন 'বুদ্ধিগত বিশ্বাসঘাতকতা'র অপরাধে অপরাধী। তাদের আর একটি অভিপ্রায় ছিল জার্মানীকে ইহুদীমুক্ত করা এবং এই অভিপ্রায়কে কঠোরভাবে কাজে পরিণত করার জন্যে তারা ব্যাপৃত হয়েছিল। সমস্ত ইহুদী ডাক্তারকে হাসপাতালে চিকিৎসা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, ইহুদী বিচারক ও আইনজ্ঞদের কোর্ট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইহুদীদের পেছনে লাগা ও অসদ্ব্যবহার করা ছাড়াও তাদের জীবিকার্জনে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

আইনষ্টাইন ছিলেন নাৎসীদের একজন বিশেষ ঘৃণার পাত্র। তিনি যখন বেলজিয়ামে যাত্রাপথে সাগরবক্ষে ছিলেন, তখনই খবর এলো যে ক্যাপুথে তাঁর বাসভবনে জোর করে প্রবেশ করে লুঠতরাজ করা হয়েছে। নাৎসীরা অভিযোগ করেছিল, আইনষ্টাইন বাসভবনে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ লুকিয়ে রেখেছেন। মারাত্মক অস্ত্রের সন্ধানে তারা ড্রয়ার নামিয়ে, নিভৃত কক্ষ খুলে ফেলে বাড়ীর চারিদিক তছনছ করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা একটা জিনিস পেল। রন্ধনশালায় একটি পাউরুটি কাটার ছুরি। এ জিনিসটা তারা সঙ্গে কবে নিয়ে গেল প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে 'যে, অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন রাষ্ট্রের একজন শত্রু।

এই সংবাদ শুনে আইনষ্টাইন শুধু এই কথা বলেছিলেন : 'পূর্ববর্তী বছরগুলিতে আমার গ্রীষ্মাবাসে ভদ্রলোকেরাই জোর কবে ঢুকত।'

আইনষ্টাইন দম্পতি যখন বেলজিয়ামে এসে পৌঁছলেন, তখন সম্পত্তির চেয়ে তাঁদের তুটি কন্যার জন্যে তাঁরা বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। কারণ বিষয়-সম্পত্তি কোনো সময়েই তাঁদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় নি। বার্লিনের বাড়িতে টেলিফোনে খবর নিয়ে তাঁদেব মন আশ্বস্ত হলো। পরিচারিকার কাছে শুনলেন, তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইলসা এক জার্মানকে বিয়ে কবে হল্যাণ্ডে পলায়ন করেছে এবং কনিষ্ঠা কন্যা মার্গট এক রাশিয়ানকে বিয়ে কবে ফ্রান্সে পালিয়ে গেছে।

প্রায় একই সময়ে খবর এলো যে, নাৎসীরা অধ্যাপক আইনষ্টাইনের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সমস্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। অর্থের পরিমাণ খুব বেশি ছিল না, কিন্তু এই অর্থই ছিল তাঁর সর্বসম্বল এবং নাৎসীরা সে অর্থ তাদের নিজেদের কাজে লাগিয়েছিল।

বেলজিয়াম থেকে আইনষ্টাইন প্রুশিয়ান আকাডেমিতে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করলেন। কারণ তাঁকে নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেটা তাঁর সহকর্মীদের অত্যন্ত বিব্রত করে তুলেছিল এবং আইনষ্টাইন উপলব্ধি করেছিলেন যে, বার্লিনে তাঁর কাজ পুনরারম্ভের

অতি ক্ষীণ আশাই আছে। ম্যাক্স প্লাঙ্ক ছিলেন আইনষ্টাইনের সর্ব-প্রথম অনুমোদকদের অন্যতম। বহুদিন পূর্বে তিনি নার্স্টের সঙ্গে জুরিখে গিয়ে বার্লিনে নতুন ইনষ্টিট্যুটের কর্মাধ্যক্ষ-মণ্ডলীতে যোগ-দানের জন্য অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে অনুরোধ করেছিলেন। এটা সত্যসত্যই রুচিবিগর্হিত হবে, যদি ম্যাক্স প্লাঙ্কের মত বশংবদ ও অনুগত জার্মান আইনষ্টাইনকে পদত্যাগ করতে বলেন। ডঃ আইন-ষ্টাইন তাঁকে এই অস্বস্তি থেকে অব্যাহতি দিলেন, দুঃখের সঙ্গে শিক্ষকমণ্ডলীর সদস্য পদে নিজেই ইস্তফা দিয়ে।

'কক্-স্যর-মের'-তে আইনষ্টাইনের আবাসস্থলে একটা স্বল্পকালীন শান্তি নেমে এলো। অধ্যাপক আর একবার তাঁর বেহালা বাজাতে পারলেন, গণিতচর্চা করতে পারলেন এবং জনতার ভীড় থেকে দূরে বাস করতে পারলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা জানতেন, তাঁর জীবন তখনও বিপন্মুক্ত হয় নি এবং সেজন্যে তাঁকে চিরদিনের মত ইউরোপ ত্যাগ করার বিষয় ভাববার জন্যে তাঁরা অনুরোধ করতে লাগলেন।

ইংলণ্ডের কমাণ্ডার অলিভার লকার-ল্যাম্পসনের কাছ থেকে একটা পত্র এলো এই মর্মে যে, অধ্যাপক আইনষ্টাইন ওয়েস্টমিনষ্টার-এ তাঁর বাসভবনে একবছর কাল স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করতে পারেন। সেটি ছিল এপ্রিল মাসের ব্যাপার এবং আইনষ্টাইন অক্টোবর মাসে প্রিন্সটনে যাবার কল্পনা করে রেখেছেন। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কমাণ্ডার লকার-ল্যাম্পসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিলেন। কিন্তু তিনি বেলজিয়ামে অবসর বিনোদন করতে লাগলেন।

আগস্ট মাসের শেষভাগে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা থেকে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন উপলব্ধি করতে পারলেন, তিনি নিজেই নিজের কত মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করলেন, নাৎসীরা তাঁর প্রাণহরণের জন্যে তাঁকে চিহ্নিত করে রেখেছে।

'দি ব্রাউন বুক অফ হিটলার টেরার' নামে একটি বই ইংলণ্ড ও

ফ্রান্সে প্রকাশিত হয় এবং এই বই-এর অন্যতম লেখকরূপে আইন-ষ্টাইনের নাম সংযোজিত হয়। বইটিতে নামের পর নামের তালিকা ছিল। এতে নাৎসীদের সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের একটা দীর্ঘ তালিকা ছিল এবং রাইখস্টাগের অগ্নিকাণ্ডের জন্যে নাৎসীদের অভিযুক্ত করা হয়। জার্মান ফ্যাসীবাদের নিগৃহীতদের জন্য বিশ্বকমিটি কর্তৃক বইটি প্রস্তুত হয় এবং অধ্যাপক আইনষ্টাইন ছিলেন এই কমিটির সভাপতি।

নাৎসীরা এই বই-এর ব্যাপারে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অধ্যাপক আইনষ্টাইন যদিও বললেন এই বইটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই এবং এটি প্রকাশিত হবার পূর্বে তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না, তবু তাতে কোন ফল হলো না। একটি গুজব চতুর্দিকে প্রচারিত হলো যে, নাৎসীরা যে সকল লোকের জীবননাশ করতে কৃতসংকল্প তাদের সেই তালিকার প্রথম স্থানে আছে আইনষ্টাইনের নাম। গুজবে প্রকাশ, তারা আইনষ্টাইনের মস্তকের জন্যে এক সহস্র পাউণ্ড, প্রায় ৪.৫০০ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কেউ তাঁকে চিরদিনের মত নীরব করে দেবে সে-ই এই পুরস্কার পাবে।

অধ্যাপক আইনষ্টাইন এ কথা শুনে শুধু একটু হাসলেন এবং মাথা নেড়ে বললেন, 'আমার মাথার যে এত দাম তা তো আমি উপলব্ধি করতে পারি নি।'

তাঁর স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তারা জানতেন, নাৎসীরা যা বলে তাই করে। তাঁরা আইনষ্টাইনকে তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। বেলজিয়াম যে বার্লিনের খুবই কাছে!

সে যাই হোক, আইনষ্টাইনের আরও দু-একটি ব্যাপারে যোগদান করার ছিল। অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে তিনি একটি পত্র পেয়েছিলেন। এই পত্রে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছিল দু'জন বেলজিয়ান নাগরিকের জন্যে—যারা বেলজিয়াম সৈন্যদলে কাজ করতে স্বীকৃত

না হওয়ায় কারাগারে প্রেরিত হয়েছিল। শান্তিবাদী হিসাবে আইনষ্টাইন সু-পরিচিত ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা যুক্তিসঙ্গতই হয়েছিল।

এই ব্যাপারে তিনি এমন একটি বিবৃতি প্রকাশ করলেন, যা বহু লোককে বিস্মিত করেছিল। শান্তিবাদ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণাই পরিবর্তিত হচ্ছিল। একদা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যদি লোকেরা শুধু যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হয় তা হলে আর কোন যুদ্ধ হবে না। তিনি যখন হিটলারদের ক্রমবর্ধমান উত্থান লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করলেন, সারা পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ বাঁধবার উপক্রম হয়েছে। ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে অস্ত্রের সাহায্যে তাদের আত্মরক্ষা করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আইনষ্টাইন একজন সংগ্রামী শান্তিবাদীতে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কোনো শহর বা নগরের শান্তি রক্ষার জন্যে যেমন পুলিসদল প্রয়োজন, তেমনি বিশ্বেরও প্রয়োজন আছে শান্তিসেনার।

যে দুটি লোক বেলজিয়াম সেনাদলে কাজ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় কারাদণ্ড ভোগ করছিল তাদের সম্পর্কে তিনি স্থির করলেন, কোন প্রকারে তাদের সাহায্য করবেন না। তিনি বললেন, জার্মানীর বিরুদ্ধে বেলজিয়ামকে রক্ষার জন্যে তাদের অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের পক্ষ হয়ে বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি কিছু লিখবেন না।

সে সময় কক্-সুর-মের-তে আইনষ্টাইনরা যে উত্তেজনার মধ্যে বাস করছিলেন তা সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে ফিলিপ ফ্রাঙ্কের তাঁদের কাছে গমনের কাহিনীর মাধ্যমে। প্রয়োজনবোধেই তখন আইনষ্টাইনের ঠিকানা গোপন রাখা হয় এবং বেলজিয়ান সরকার সর্ব সময়ে তাঁর আবাসে দেহরক্ষী মোতায়েন রাখা সম্পর্কে সবিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন। ফ্রাঙ্কের নিজের কথায় সে কাহিনী এখানে বিবৃত করা যাক্।

"অবশেষে, বালিয়াড়ির মধ্যে একটি ভিলায় আমি উপস্থিত হলুম এবং সেখানে শ্রীমতী আইনষ্টাইনকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখলুম। তাঁকে দেখে বুঝতে পারলুম, আমার গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হয়েছি। দূর থেকে দেখলুম দুজন স্থূলদেহী লোকের সঙ্গে শ্রীমতী আইনষ্টাইন অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলছেন। এই আগন্তুকদ্বয়কে দেখে আমি একটু বিস্মিত হয়েছিলুম, কারণ আইনষ্টাইনের সঙ্গে কেবল বিজ্ঞানী, লেখক ও শিল্পীদের দেখতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলুম। আমি ভিলার কাছাকাছি এগিয়ে এলুম। সেই দুটি লোক আমাকে দেখামাত্র আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও জাপটে ধরল। শ্রীমতী আইনষ্টাইন লাফিয়ে উঠলেন এবং ভয়ে তাঁর মুখমণ্ডল খড়ির মত শাদা হয়ে গেল। শেষকালে তিনি আমাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন, 'এরা আপনাকে প্রচারিত গুপ্তঘাতক বলে সন্দেহ করেছিল।' তিনি গোয়েন্দাদ্বয়কে আশ্বস্ত করে আমাকে তাঁদের গৃহে নিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ পরে আইনষ্টাইন নীচে নেমে এলেন। ইতিমধ্যে শ্রীমতী আইনষ্টাইন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি কিভাবে তাঁদের বাসা খুঁজে পেলুম?' আমি বললুম, 'আপনাদের প্রতি-বেশীরা বাসাটা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে।' তিনি বললেন, 'কিন্তু এটা তো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।' তাঁর নিরাপত্তার জন্যে পুলিশের অবলম্বিত ব্যবস্থার এই অকৃতকার্যতায় আইনষ্টাইন নিজে খুব হেসে উঠলেন।"

আইনষ্টাইনকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের নিরাপত্তার বিষয় চিন্তা করতে বোঝানো হলো। একান্ত গোপনে তাঁকে বেলজিয়াম থেকে ইংলণ্ডে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হলো। সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ তা না হলে অর্থের লোভে ভাড়াটে লোক তাঁর জীবননাশের চেষ্টা করতে পারে।

এই গোপনীয়তা খুব ভালভাবেই পালিত হয়েছিল। ইউরোপের কোন্ স্থান থেকে তিনি জাহাজে আরোহণ করলেন এবং রাত্রির আড়ালে ইংলণ্ডে কমাণ্ডার লকার-ল্যাম্পসনের আবাসে উপস্থিত

হলেন। ১৯৩৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বরে এই ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশের গুপ্ত বিভাগের লোকেরা তাঁর গাড়ি অনুসরণ করেছিল এবং কমাণ্ডারের বাসভবনের প্রাঙ্গণের সর্বত্র এবং আবাসের অভ্যন্তরে গোয়েন্দা রাখা হয়েছিল। কোন প্রকার বিপদের ঝুঁকি তাঁরা নেন নি।

পরের দিন কঠোর প্রহরাধীনে আইনষ্টাইনকে উত্তর সাগরের সম্মুখস্থ নরফোক উষর প্রান্তরে একটি কুটীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কুটীরটি নাগালের বাইরে এবং খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং সশস্ত্র প্রহরীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমনের পূর্বে কয়েক সপ্তাহ এখানে প্রতীক্ষাকালে তিনি তাঁর অভিলষিত শান্তি ও অনাড়ম্বর পরিবেশ লাভ করবেন।

আইনষ্টাইন সম্পর্কে ইংরাজরা এত সতর্ক হয়ে ঠিকই করেছিল। সংবাদ এলো—অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের সঙ্গে একই মৃত্যু পরোয়ানায় তালিকাভুক্ত অপর একজন ইহুদী, থিওডোর লেসিং নৃশংসভাবে নাৎসীদের হাতে নিহত হয়েছেন।

গত জুলাই-এ কমাণ্ডার লকার-ল্যাম্পসন অধ্যাপক আইন-ষ্টাইনের গৃহকর্তা ছিলেন। তিনি রাজনীতি করতেন। তিনি যখন আইনষ্টাইনকে 'হাউস অফ কমন্স' দর্শনের জন্যে আহ্বান জানালেন, আইনষ্টাইন তখন সানন্দে রাজী হলেন। তিনি অনুভব করলেন, কর্মরত অবস্থায় ইংলণ্ড লোকসভার সদস্যদের দেখা করা খুবই কৌতূহলজনক হবে। হিটলার যে জার্মান রাইখস্টাগকে তল্পি বাঁধতে বলেছেন, তার সঙ্গে ইংলণ্ডের এই লোকসভার পার্থক্য অনেক।

পার্লামেণ্ট ভবনে বড় ঘড়ির নিচে দর্শকদের আসনে বসে আইন-ষ্টাইন পার্লামেণ্ট সদস্যদের সামনে প্রদত্ত তাঁর বন্ধুর বক্তৃতা শুনলেন।

কমাণ্ডার লকার-ল্যাম্পসন হাউস অফ কমন্সকে এই মর্মে একটি আইন পাস করবার চেষ্টা করেছিলেন যাতে গ্রেট ব্রিটেনের বাইরের ইহুদীরা গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিক হতে পারে। দর্শকের আসনে

উপবিষ্ট অধ্যাপক আইনষ্টাইনের দিকে নাটকীয়ভাবে অঙ্গুলী সংকেত করে তিনি দেখালেন যে, জার্মানী শ্রেষ্ঠ খ্যাতিম্যান নাগরিক বিতাড়িত করেছে। তিনি হাউস অফ কমন্সকে জানালেন, সম্প্রতি একটি দর্শক-বইতে অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে স্বাক্ষর করতে বলা হয়েছিল এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি কোন ঠিকানা দিতে পারেন নি। 'ঠিকানা' কথাটির নীচে তাঁকে লিখতে হয়েছিল 'কোন ঠিকানা নেই।' কমাণ্ডার বক্তৃতা করে চললেন এবং অন্যান্য কৃতী ব্যক্তিদের উদাহরণ তুলে ধরলেন যাঁরা আকস্মিকভাবে সর্বপ্রকার নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

বক্তৃতা শেষ করে তিনি এক পলকে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন যে, তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি মাথা নাড়ছেন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে হর্ষ প্রকাশ করছেন।

অধ্যাপক আইনষ্টাইনের এই পরিদর্শন সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত কম গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছিল।

অবশেষে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার সময় হয়ে এলো। আবার তাঁর ইংলণ্ডের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাগমন সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। দেহসমেত বা দেহছাড়া তাঁর মস্তকের জন্যে এখনও সহস্র পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষিত রয়েছে।

কঠোর প্রহরাধীনে রাত্রির আঁধারে একটা ক্ষুদ্র জলযানে করে তাঁকে একটি জাহাজে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই জাহাজে তাঁর স্ত্রী এলসা অপেক্ষা করছিলেন, বেলজিয়ামে তিনি এই জাহাজে আরোহণ করেছেন। তাঁর সহকারী ডঃ ওয়লথার মেয়ারও সেই জাহাজে ছিলেন। নিঃশব্দে—কোন সাক্ষাৎকার, কোন রকম হর্ষধ্বনি, কোনরকম সংবাদ প্রচার ছাড়াই আইনষ্টাইন-দম্পতি ইংলণ্ড থেকে, ইউরোপ থেকে যাত্রা করলেন এবং ঠিক তেমনি নিঃশব্দে নিউইয়র্কে এসে উপস্থিত হলেন। তখন ১৯৩৩ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি।

সঙ্গরোধে তাঁদের জাহাজ থেকে ওঠানো হলো এবং একটা

গুন-টানা নৌকায় তীরভূমিতে আনা হলো। সেখান থেকে তাঁদের সরাসরি প্রিন্সটনে নিয়ে যাওয়া হলো।

জন্মভূমি ছেড়ে আসতে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের যাই মনে হোক না কেন, তাঁর চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি—আগের তুলনায় বার্ধক্যের ছাপ যা একটু পড়েছিল। আগের মত এখনও তাঁর পরনে ছিল ঢলঢলে ওভারকোট, মাথায় ছিল বড় কানাওয়ালা কালো টুপি এবং তার তলায় লম্বা চুল। অবশ্য তাঁর মূল্যবান বেহালাটিও সঙ্গে ছিল।

আইনষ্টাইনরা প্রিন্সটনে এসে গুছিয়ে বসতে না বসতে খবর এলো, জার্মানীতে নাৎসীরা তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে: বাসভবন, নৌকা—সব কিছুই বেহাত হয়ে গেছে।

বিংশ অধ্যায়

হিটলারের শক্তিবৃদ্ধি

প্রিন্সটনে অধ্যাপক আইনষ্টাইন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। সেই শান্ত বিশ্ববিদ্যালয় নগরীতে লোকেরা ঢলঢলে প্যাণ্ট ও সোয়েটার-কোট-পরা একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে প্রায়ই দেখতে পেতেন। তিনি যখন জোর কদমে পা ফেলে বেড়াতে বেরুতেন, তখন বাতাসে তাঁর অবিন্যস্ত সাদা চুল উড়ত।

কোন মানুষ সম্বন্ধে জানতে গিয়ে অপরে তাঁর সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তা জানতে পারলে কোন কোন সময় সেই মানুষটির ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করা সহজ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডঃ লিওপোল্ড ইনফেল্ডের কথা বলা যায়। ইনফেল্ড, যিনি বর্তমানে টোরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতবিদ্যা শিক্ষা দেন, আইনষ্টাইনের সঙ্গে সর্বপ্রথম মিলিত হন বার্লিনে। সে সময় ইনফেল্ড একজন যুবক এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের আশায় পোল্যাণ্ড থেকে বার্লিনে এসেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইনফেল্ডের আবেদন-পত্র প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন আইনষ্টাইনের একটি চিঠির প্রভাবে তিনি বিশেষ-ছাত্ররূপে বক্তৃতাসমূহে যোগদানের অনুমতি পেয়েছিলেন।

ষোল বছর অতীত হওয়ার পর আইনষ্টাইনের সঙ্গে ইনফেল্ডের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তখন আইনষ্টাইনের প্রভাবে প্রিন্সটনে ইন্‌ষ্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড্ স্টাডি-তে একবছর (১৯৩৬-৩৭)

অতিবাহিত করার জন্যে ইনফেল্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার সুযোগ লাভ করেন। প্রিন্সটনে অবস্থানকালে অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে 'দি ইভলিউশন অফ ফিজিক্স' (পদার্থবিজ্ঞানের বিবর্তন) নামে একটি পুস্তক রচনায় সহযোগিতা করার সদুর্লভ অভিজ্ঞতা ইনফেল্ডের হয়েছিল। ইনফেল্ডের স্বরচিত পুস্তক 'কোয়েস্ট : দি ইভলিউশন অফ এ সায়েনটিষ্ট' (অনুসন্ধান : একজন বিজ্ঞানীর ক্রমবিকাশ) থেকে তাঁর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি।

'যদিও আইনষ্টাইনের সঙ্গে অতি সহজেই বোঝাপড়া করা যায় এবং তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও দয়ালু, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করা সহজ নয়। এর কারণ হচ্ছে তাঁর চিন্তাধারার উর্বরতা। বস্তুত, তিনি সর্বদাই আমাকে ছাড়িয়ে যেতেন। তাঁর নিজের নিরন্তর কর্মকৃতিত্বে তিনি আমাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে উত্তেজনাময় কর্মতৎপরতায় উদ্বুদ্ধ করতেন। যাতে পেছিয়ে না পড়ি সেজন্যে আমাকে কাজ করে যেতে হত এবং গতি-বিষয়ক সমস্যায় সহযোগিতাকালে আমরা যে সব বড় রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হতুম সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করতে হত।'

'পরস্পর থেকে পৃথক হবার পর কখনও কখনও রাত্রিকালে আমাদের শেষ আলোচনার বিষয় আমি চিন্তা করতুম এবং একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করে এমন নতুন চিন্তাধারা আমার মনে জাগরিত হত। পরের দিন আইনষ্টাইনের কাছে আমি ছুটে যেতুম এবং বেশীর ভাগ সময়ে দেখতে পেতুম তিনি শুধু যে একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন তা নয়, আরও বহুদূর এগিয়ে গেছেন।'

আইনষ্টাইনের চরিত্রে ইনফেল্ড একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছিলেন—যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আরও বহুজন পেয়েছেন সেটি মানবতায় তাঁর সুগভীর আগ্রহ এবং মানুষের সঙ্গ পরিহারের আকাঙ্ক্ষা। মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি আবেগ সহকারে চিন্তা করতেন, কিন্তু নিঃসঙ্গভাবে কাজ করতে তিনি চাইতেন। নিজের

ধারণায় নিজের চিন্তাধারায় মগ্ন হয়ে থাকতে তিনি চাইতেন ; অপর কেউ তাঁর চিন্তাধারায় অংশ গ্রহণ করুক বা না করুক—তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত যতদিন ইনফেল্ড প্রিন্সটনে ছিলেন, তার প্রায় প্রতিদিনই আইনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হত। তখন তিনি দেখতে পেতেন—তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে : 'আইনষ্টাইনের জীবনের অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে তাঁর মননের অ্যাডভেঞ্চার।' অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন তাঁর নিজস্ব জগতে বাস করতেন এবং জাগ্রতাবস্থায় প্রতি মুহূর্তে তাঁর মন নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান করত। একবার তিনি বলেছিলেন, তিনি বাতিঘর-প্রহরী হতে চান যাতে তাঁর সমস্ত সময় কাজে তিনি ব্যয় করতে পারেন। বাতিঘর-প্রহরী হিসাবে অধ্যাপক আইনষ্টাইন সুখী হতে পারতেন, কিন্তু অনেকের কাছে সে জীবন এত নিঃসঙ্গ বোধ হত যে সহ্য করা সম্ভব নয়।

ইনফেল্ড লক্ষ্য করেছিলেন যে, নিজের বিপুল খ্যাতি সম্বন্ধে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের কোন ধারণা ছিল না। প্রিন্সটনে এক সন্ধ্যায় তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে চলচ্চিত্র দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে যা ঘটেছিল ইনফেল্ড তাঁর 'কোয়েস্ট : দি ইভলিউশন অফ এ সায়েনটিস্ট' গ্রন্থেতা বর্ণনা করেছেন। এখানে সেটা উদ্ধৃত করছি :

"প্রিন্সটনে প্রত্যেক লোক তৃষিত বিস্মিত দৃষ্টিতে আইনষ্টাইনের দিকে তাকিয়ে থাকত। আমাদের ভ্রমণের সময় জনাকীর্ণ সড়ক পরিহার করে আমরা মাঠ-ময়দান ও অজ্ঞাত গুপ্তপথের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতুম। একবার একটি মোটরগাড়ী এসে আমাদের সামনে থামল এবং একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা ক্যামেরা হাতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। সলজ্জ ও আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'অধ্যাপক আইনষ্টাইন, আপনার একটি চিত্র গ্রহণের অনুমতি দেবেন?'

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

"এক মুহূর্তকাল তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তারপর আবার তাঁরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এই দৃশ্য তাঁর কাছে স্থায়ী হয় নি এবং আমি নিশ্চিত বলতে পারি কয়েক মিনিট পরে তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন এটা কখনও ঘটেছিল কিনা।"

"একবার প্রিন্সটনে একটি সিনেমা হলে আমরা 'এমিল জোলার জীবনী' সম্বন্ধে একটি চলচ্চিত্র দেখতে গিয়েছিলুম। টিকিট কেনার পর আমরা একটি লোকভর্তি প্রতীক্ষাগারে গিয়ে দেখলুম আরও পনের মিনিট কাল আমাদের প্রতীক্ষা করতে হবে। আইনষ্টাইন প্রস্তাব করলেন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। বেড়াতে যাবার সময় দ্বাররক্ষীকে আমি বললুম, 'কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা ফিরে আসব।"

"কিন্তু আইনষ্টাইন ব্যাপারটাকে গভীরভাবে নিয়ে অকপটে বলে ফেললেন: আমাদের আর এখন টিকিট নেই। তুমি আমাদের চিনতে পারবে তো?"

"দ্বাররক্ষী আমাদের কথাটাকে ঠাট্টা ভেবে হাসতে হাসতে বলল: 'হ্যাঁ, অধ্যাপক আইনষ্টাইন, আমি চিনতে পারব।"

যুদ্ধের সময় প্রিন্সটনেও আইনষ্টাইনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। কারণ পৃথিবীর সর্বত্র নাৎসীদের চর ছড়ানো ছিল এবং তাদের ঘোষিত এক সহস্র পাউণ্ডের পুরস্কার তখনও বলবৎ ছিল।

ডঃ আইনষ্টাইনের নিজের দিক থেকে বলতে গেলে, তাঁর নিরাপত্তা-ব্যবস্থা তাঁকে কোন সত্যকার কঠিন কাজে নিমগ্ন থাকার সুযোগ শুধু এনে দিয়েছিল। তিনি ইনষ্টিট্যুটে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর গবেষণা বিষয়ে কাজ করতে লাগলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ইহুদীদের সঙ্গে ইহুদী জাতির জন্যে কাজ করতেন।

তাঁর প্রথম পক্ষের দুটি ছেলের নিরাপত্তার জন্যে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। সেসময় দুটি ছেলেই নিরাপদে ছিলেন। জ্যেষ্ঠ

পুত্র হানস্ অ্যালবার্ট ক্যালিফোর্নিয়ায় বাস করছিলেন এবং সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমি সংরক্ষণ কৃত্যকে কর্মরত ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র তার মা'র, অর্থাৎ আইনষ্টাইনের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন।

হিটলার যতই ক্ষমতাশালী হতে লাগলেন এবং ইউরোপকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে লাগলেন, ততই জার্মানী ও পোল্যাণ্ডে ইহুদীদের অবস্থা আইনষ্টাইনের কাছে ক্রমশ গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠল। ইউরোপে যাঁরা তখনও পর্য্যন্ত পলায়ন করতে পারেন নি এবং অনেকে যাঁরা কখনও পলায়ন করতে পারবেন না তাঁদের সাহায্য করার জন্যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। জায়োনিষ্ট সংস্থা এবং অন্যান্য ইহুদী দলের ভোজসভায় তিনি যোগদান করলেন, বক্তৃতা করলেন, পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলেন এবং যেখানে যেখানে তাঁর নাম ব্যবহার করলে সত্যই সাহায্য হবে সেখানে তাঁর নাম ব্যবহারের অনুমতি দিলেন।

এমন কি, প্রকাশ্যে বেহালা না বাজাবার যে সংকল্প তাঁর ছিল সেটা পর্যন্ত ভঙ্গ করলেন এবং জার্মানীতে তাঁর সহকারীদের সাহায্য কল্পে তিনি একটি কন্সার্ট দিলেন। নিউইয়র্ক শহরের ফিফ্থ এভিনিউ-এ অ্যাডলফ্ লিউইসনের বাসভবনে ঘরোয়াভাবে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। এটি হলো জনসমক্ষে ডঃ আইনষ্টাইনের প্রথম সঙ্গীতানুষ্ঠান। আড়াই শো জনের বেশি লোক মহাবিজ্ঞানীর এই বেহালাবাদন শুনতে এসেছিলেন। আইনষ্টাইন যখন তাঁর বেহালাটি চিবুকের নিচে ধরে ছড় টানতে উদ্যত হলেন, তখন শ্রোতারা বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন তাঁরা এমন একজন নিপুণ সঙ্গীতজ্ঞের বেহালাবাদন শুনছেন. যিনি অপেশাদার যন্ত্রশিল্পীদের চেয়ে অনেক দক্ষ এবং যিনি কনসার্ট স্তরে যন্ত্রবাদন পরিবেশনের যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

যখন সংযুক্ত প্যালেস্টাইন সংস্থা প্যালেস্টাইনে গমনেচ্ছু ইহুদীদের জন্যে অর্থসংগ্রহের অভিযান শুরু করলেন, তখন তাঁরা আইনষ্টাইনের

৫৭তম জন্মদিনে এই অভিযান আরম্ভ করেন এবং এই তহবিলকে 'আইনষ্টাইনের প্যালেস্টাইন তহবিল' (আইনষ্টাইন ফাণ্ড ফর প্যালেস্টাইন) নামে অভিহিত করেন। এটি ধনীর অভিযান ছিল না, এই অভিযান সকলের জন্যে এবং কারোকে এক ডলারের বেশি দিতে হয় নি। এইভাবেই অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন কাজ করতে চাইতেন।

শ্রীমতী এলসাও ইহুদীদের সাহায্য করার কাজে তাঁর স্বামীর সহযোগিতা করতেন। তিনি 'উওমেনস্ লীগ ফর প্যালেস্টাইন'-এর হয়ে কাজ করেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপনীত হবার অল্পদিন পরেই তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙতে থাকে এবং তিনি বেশি কাজ করতে পারতেন না। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি রোগে আক্রান্ত হন এবং এর ফলে একমাসেরও বেশি সময় তাঁকে ব্রোন্‌কস্-এ মণ্টে ফিওয়র হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকতে হয়। অবশেষে ডাক্তার যখন তাঁকে প্রিন্সটনে ফেরার অনুমতি দিলেন, তখন তাঁকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি যেন কখনও নিজে অত্যধিক পরিশ্রম না করেন।

এর কিছুকাল পূর্বে আইনষ্টাইনরা প্রিন্সটনে ১১২ নম্বর মার্সার স্ট্রীটে একটি বাড়ি কেনেন। সেখানে ডঃ আইনষ্টাইন, তাঁর সৎকন্যা মারগট এবং তাঁর একান্ত সচিব হেলেন ডুকাস বাস করতেন। এটি ছিল একটি সাদাসিধে দোতালা কাঠের বাড়ি। ক্যাপুথের কুটীরের মত এই বাড়িরও ব্যয়বাহুল্য ছাড়া আর সব কিছুই ছিল। বাড়িটি কিন্তু শিল্পীজনোচিত সৌন্দর্য-শৈলীতে নির্মিত হয়েছিল। বাড়ির পশ্চাদ্‌ভাগে ছিল পুষ্পোদ্যান এবং সম্মুখভাগে গাড়িবারান্দার ওপর উঠে গেছে বেগনী রঙের ফুলসমেত একটি বড় দ্রাক্ষালতা। দ্বিতলে ডঃ আইনষ্টাইনের পাঠকক্ষ এবং সেখানে আছে তাঁর কাজ করবার টেবিল। তাঁর কাজ করবার টেবিলের সামনের দেওয়ালে আছে একটি লম্বা গবাক্ষ—তার মধ্যে দিয়ে পুষ্পোদ্যান দেখা যায়।

এই হলো তাঁর প্রয়োজনীয় সব কিছু—তাঁর বই, তাঁর কলম,

ও কালি এবং লেখার কাগজ। তিনি ইচ্ছা করলে বিরাট ধনী হতে পারতেন, কিন্তু তিনি কোনদিনই টাকার জন্যে ভাবেন নি। [১] একবার ইউরোপে তিনি একটি পত্রিকায় একটি নিবন্ধ পাঠিয়ে বলেছিলেন, সম্পাদক মশায় এই শর্তে লেখাটি প্রকাশ করতে পারেন যে, এই নিবন্ধের জন্যে ডঃ আইনষ্টাইনকে এক পেনিও দেওয়া হবে না।

তিনি ফ্যাশন বা প্রচলিত আচার-আচরণের দাস ছিলেন না। বিনা ইস্ত্রী-করা ও ঢিলে করে বাঁধা প্যাণ্ট এবং নেকটাই ছাড়া সার্টের ওপর একটি সোয়েটার পরে তিনি সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এ ছাড়া আর বিশেষ কোন পোশাক তিনি পরতেন না। বাড়িতে বেহালা বাজিয়ে, পাইপে ধূমপান করে এবং বই পড়ে তিনি পরম সুখ অনুভব করতেন। এবং এ সমস্ত কাজই তিনি করতেন।

তিনি পালতোলা নৌকা চালাতে ভালবাসতেন এবং ক্যাপুথ লেকে নৌচালনার সেই সুখস্মৃতি কোনদিনই ভুলতে পারেন নি। ১৯৩৫ সালে তিনি কনেক্‌টিকাট নদীর সন্নিকটে ওল্ড লীম-এ একটি গ্রীষ্মাবাস ভাড়া করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি একটি পালতোলা নৌকা সংগ্রহ করলেন। এক সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ভাঁটার সময় জলের গভীরতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে নৌকো জলে ভাসালেন এবং তার ফলে বালুবেলায় নৌকো আটকে গেল। এক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন হবার কি আছে? কিছুই নেই। তিনি শুধু বসে জোয়ার আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, কারণ তখন তাঁর নৌকোকে জলে তুলতে পারবেন। কয়েকজন গ্রীষ্মকালীন দর্শনার্থী একটি মোটর বোটে করে জলে মৃদু আঘাত করতে করতে এগিয়ে এলেন এবং তাঁর পালতোলা নৌকোটিকে জলে ঠেলে দিতে সাহায্য করলেন। অনতিবিলম্বে তাঁরা জানতে পারলেন কাকে তাঁরা সঙ্কটমুক্ত করেছেন।

কয়েক বছর আগে থেকে ডঃ আইনষ্টাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছেন। ১৯২১ সালে তাঁর প্রথম ভ্রমণের সময় থেকে তিনি এই দেশটির প্রতি ক্রমবর্ধমান অনুরাগ অনুভব

করতে থাকেন—যে দেশে কোনো জাতিভেদ নেই এবং যেখানে প্রত্যেকটি মানুষ তার অতি সাধারণ অবস্থা থেকে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার সর্বপ্রকার সুযোগ পায়।

১৯৩৬ সালের ১৫ জানুয়ারী তারিখে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন মার্সার পল্লী কোর্টঘরে উপস্থিত হয়ে নাগরিকত্ব কাগজপত্রের ভারপ্রাপ্ত করণিকের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

'একাজের জন্যে আপনাকে ডাকঘরে যেতে হবে'—করণিক বললেন।

তিনি প্রফুল্লচিত্তে মাথা নেড়ে ডাকঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখান থেকে ডাকঘব পনের মিনিটেব পথ। তখন বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। কিন্তু আইনষ্টাইনের মাথায় কোন টুপি ছিল না। ডাকঘরে পৌঁছতে তাঁর লম্বা শাদা চুল জলে ভিজে গেল এবং তাঁর মাথায় লেপটে গেল। কিন্তু আইনষ্টাইন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন মনে হলো। ডাকঘরে তিনি তাঁর প্রাথমিক কাগজপত্র পেলেন, সামান্য ফি জমা দিলেন এবং তারপর বাড়ির দিকে রওনা হলেন। আরও দু'বছর পার হলে তিনি তাঁর নাগরিকত্ব লাভের চূড়ান্ত কাগজপত্র পেয়েছিলেন।

কয়েকমাস পরে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে আইনষ্টাইন পরিবারে দুঃখের এক পরম যবনিকা নেমে এলো। সাম্প্রতিক কয়েক মাসে শ্রীমতী এলসাব শরীর ভেঙে পড়েছিল এবং ২০ ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বাইরের লোকেরা শুধু জানল শ্রীমতী আইনষ্টাইন প্রাণত্যাগ করেছেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে একটি অনুরক্ত ও প্রেমময় জীবনের অবসান ঘটল।

ডঃ ব্লেক্সনার, যিনি সেসময়ের মধ্যে আইনষ্টাইন পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন, সকলকে জানালেন:

'অধ্যাপক আইনষ্টাইন এবং তাঁর পবিবারবর্গের ইচ্ছা, তাঁদের এই শোকবেদনা ব্যক্তিগত ভেবেই বন্ধুবান্ধবেরা যেন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।'

প্রিন্সটনের কাছাকাছি একটি সমাধিক্ষেত্রে শ্রীমতী এলসাকে সমাধিস্থ করা হয় এবং অধ্যাপক আইনষ্টাইন কাজের মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখতে তাঁর পাঠকক্ষে ফিরে 'এলেন। এলসার মৃত্যুজনিত শোক তাঁর নিজস্ব ব্যাপার এবং এই শোকবেদনাকে তিনি সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে সহ্য করছিলেন।

কয়েক মাস পরে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিট্যুট অফ টেকনোলজির জন্যে নির্মীয়মাণ দূরবীনের বৃহদাকার টিউবের নির্মাণকার্যের শেষ পর্যায় দেখবার জন্যে ফিলাডেলফিয়ায় যাত্রা করেন। ডঃ মিলিকানও এই ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করার জন্যে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিলাডেল-ফিয়ায় গমন করেছিলেন। এই দুজন বিজ্ঞানী, যাঁরা আগে এক-যোগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে শেষ বোল্টুটিকে যথাস্থানে আটকাতে দেখলেন। ইস্পাতের এই নলটি তখন পর্যন্ত নির্মিত এইপ্রকার যন্ত্র-বিশেষের মধ্যে ছিল সর্ববৃহৎ। এর ওজন ছিল ৭৫ টন এবং এটি একদিন বিশ্বের বৃহত্তম দূরবীনের অংশ-বিশেষে পরিণত হবে—২০০ ইঞ্চি মহাকাশ-সন্ধানী চক্ষু।

ইতিমধ্যে ইউরোপের রাজনীতিক সঙ্কটের প্রতি অধ্যাপক আইন-ষ্টাইনের দৃষ্টি পুনরায় আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি জানতেন, হিটলার সমগ্র বিশ্বকে যুদ্ধে নিমজ্জিত করতে উদ্যত হয়েছেন এবং তাঁকে পরাজিত করার জন্যে বিশ্বের অবশিষ্টাংশকে যুদ্ধ করতে হবে।

তিনি লক্ষ্য করলেন. বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি কোনরূপ বাধা না দেওয়ায় হিটলার ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, ১৯৩৬ সালে জার্মানী রাইনল্যাণ্ড অধিকার করল এবং ১৯৩৮ সালে দখল করল অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া।

'এইটুকু শুধু আমরা চাই,' জার্মানী দাবী করল, 'অষ্টিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া যদি আমাদের দিয়ে দাও, তা হলে আমরা আর কিছু চাই না। আমাদের সমৃদ্ধির জন্যে স্থানের বিস্তৃতি প্রয়োজন।'

বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র জার্মানীর এ কথায় বিশ্বাস করল এবং তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করল।

ডঃ আইনষ্টাইন জার্মানীতে বাস করে এসেছেন। ১৯২১ সালে ডঃ র‍্যাথেনিউ-র হত্যাকাণ্ডের পর থেকে জার্মানীতে স্বৈরাচারী দলের উত্থান তিনি দেখে এসেছেন। তিনি জানতেন, নাৎসীদের ক্ষমতা-লাভের লিপ্সা কোনদিন মিটবে না এবং তারা বর্বরতা ও হত্যাকাণ্ড করে যাবেই।

তিনি এ-ও জানতেন, বিজ্ঞানই হবে শেষ উত্তর। তিনি জানতেন শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-সমৃদ্ধ জাতিই যুদ্ধে জয়লাভ করবে। সে কারণে তিনি সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক প্রগতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন।

একবিংশ অধ্যায়

পরমাণু বোমা

জার্মানীতে কাইজার ভিলহেম ইনষ্টিট্যুটে একটু লাজুক প্রকৃতির সাধারণ লম্বা ও অত্যন্ত সাদাসিধে একজন ইহুদী মহিলা-বিজ্ঞানী কয়েক বছর যাবৎ তেজস্ক্রিয় মৌল সম্পর্কে পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর নাম ডঃ লিজে মিটনার। তিনি ১৯০৮ সালে বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ডঃ মাক্স প্লাঙ্কের সহকারীরূপে তাঁর কৃতিত্বময় জীবনের কর্মধারা শুরু করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কাইজার ভিলহেম ইনষ্টিট্যুটে তাঁকে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত তেজস্ক্রিয়া বিভাগ সংগঠনের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১৯৩৮ সালে তিনি ইনষ্টিট্যুটে ডঃ অটো হান এবং ডঃ ই. ষ্ট্যাস-ম্যানের সহযোগিতায় ইউরেনিয়ম নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। এই তিনজন বিজ্ঞানী ইউরেনিয়ম পরমাণুকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে একটি নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল পদার্থ উৎপাদনে সমর্থ হন, যেটি ইউরেনিয়ম অপেক্ষা শক্তিশালী বলে মনে হলো। সেসময় তাঁরা এই রহস্যের মীমাংসা করতে পারেন নি। ইউরেনিয়ম পরমাণু যে চূর্ণ হয়েছে, এ ধারণা ডঃ হান এবং ষ্ট্যাসম্যান নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারেন নি, কিন্তু মিটনার এই ধারণা মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হতে থাকেন।

১৯৩৮ সালে জার্মানী প্রাক্-সভ্যতা যুগের বর্বরতায় ফিরে আস-ছিল। যে সন্ধিক্ষণে ডঃ মিটনার তাঁর গবেষণার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

ও চমকপ্রদ পর্যায়ে উপনীত হচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁকে 'অনার্য' রূপে চিহ্নিত করা হলো। তিনি কাজ বন্ধ রেখে জীবনরক্ষার জন্যে পালিয়ে যাবেন স্থির করলেন। মিটনারকে জার্মানীতে থেকে পরমাণু সংক্রান্ত তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে হিটলার প্রচণ্ড চাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের সাহায্যে তিনি সুইডেনের স্টকহলমে পালিয়ে গেলেন। যাবার সময় তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাঁর নোটবুক এবং প্রতিভাদীপ্ত মন—যে মনে ছিল অমূল্য তথ্য যা হস্তগত করতে পারলে জার্মানী যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারত।

স্টকহলমে উপস্থিতির অল্প কিছুকাল পরেই মিটনার পরমাণু-বিভাজন (পরমাণুকে ভেঙে ফেলা) সংক্রান্ত তাঁর পরীক্ষায় গাণিতিক রহস্যের মীমাংসা করে ফেলেন এবং বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন।

তাঁর নিকট-আত্মীয় ডঃ অটো আর ফ্রিশ মিটনারের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল নিউইয়র্ক শহরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ নীল বোর-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অধ্যাপক এনরিকো ফের্মির সহযোগিতায় ডঃ বোর মিটনারের পরীক্ষা নতুন করে আবার করলেন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ লিও জীলার্ড একই ধরনের কাজ করছিলেন। তিনি, ফের্মি, বোর ও অন্যান্য অনেকে মিটনারের আবিষ্কারে সামরিক গুরুত্বের সম্ভাবনা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই বিষয়ে তাঁরা অধ্যাপক আইনষ্টাইনের কাছে পত্র লিখলেন।

পারমাণবিক যুদ্ধে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে তা ব্যাখ্যা করে জীলার্ড একটি দীর্ঘ ও সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা-নিবন্ধ প্রস্তুত করলেন। এই নিবন্ধে তিনি জোর করে বলছিলেন, তাঁরা এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত নন যে মার্কিন বিজ্ঞানীরা জার্মান বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা গবেষণায় একধাপ এগিয়ে আছেন কিনা।

জীলার্ডের গবেষণা-নিবন্ধ সবিশেষ যত্নের সঙ্গে আইনষ্টাইন

অনুধাবন করেছিলেন। ১৯৩৯ সালের ২ আগষ্ট, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার ঠিক এক মাস আগে, তিনি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের কাছে এক পত্র লিখলেন।

২ আগষ্ট, ১৯৩৯

মহাশয়,

এনরিকো ফের্মি এবং লিও জীলার্ড—এই দুজন বিজ্ঞানীর সাম্প্রতিক কতকগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্য আমাকে পাঠানো হয়েছে। এগুলি থেকে আমি বুঝতে পারছি ইউরেনিয়ম মৌল অদূর ভবিষ্যতে একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ শক্তি উৎসে পরিণত হতে পারে। এই পরিস্থিতি-উদ্ভূত কয়েকটি বিষয় সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন বলে মনে হয় এবং প্রয়োজন অনুভূত হলে রাষ্ট্রের পক্ষে দ্রুত কার্যারম্ভ করা উচিত।

গত চার মাসে ফ্রান্সে জোলিও এবং আমেরিকায় ফের্মি ও জীলার্ডের গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বৃহৎ পরিমাণ ইউরেনিয়ম পিণ্ডে পরমাণুকেন্দ্রীন শৃঙ্খলক্রিয়া চালু করা সম্ভবপর হতে পারে এবং তার ফলে প্রভূত পরিমাণ শক্তি এবং রেডিয়মসদৃশ নতুন মৌল উৎপন্ন হবে। অদূর ভবিষ্যতে এটা যে সম্ভবপর হবে তা এখন প্রায় নিশ্চিত বলে মনে হয়।

এই নতুন ঘটনা বোমা তৈরির পথও রচনা করতে পারে। যদিও খুব নিশ্চয় করে বলা যায় না, তবু আমার অনুমান—নতুন ধরনের অতি শক্তিশালী বোমা এভাবে সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের একটিমাত্র বোমা জাহাজে নিয়ে গিয়ে কোন একটি বন্দরে বিস্ফোরণ ঘটালে সমগ্র বন্দরটি ও তার আশপাশের স্থানগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমি শুনেছি, জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করে সেখানকার খনি থেকে আহরিত ইউরেনিয়মের বিক্রয় সত্যসত্যই বন্ধ করে দিয়েছে। জার্মানী যে এত শীঘ্র এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তার সঙ্গত কারণ বোধ হয় এই যে, জার্মান রাষ্ট্রের উপ-সচিবের পুত্র ফন ভিজস্যাকার বার্লিনের কাইজার ভিলহেম ইনষ্টিট্যুটের সঙ্গে যুক্ত

আছেন এবং সেখানে ইউরেনিয়ম সম্পর্কিত কিছু কিছু মার্কিন গবেষণা-কার্যের পুনরাবৃত্তি বর্তমানে করা হচ্ছে।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত

এ. আইনষ্টাইন

নাৎসী সামরিক বাহিনী পোল্যাণ্ডকে বিধ্বস্ত করার দু-সপ্তাহ পরে ১৯৩৯ সালের ১১ অক্টোবর তারিখে ডঃ আইনষ্টাইনের পত্র ও জীলার্ডের গবেষণানিবন্ধ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছে এসে পৌঁছল।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ডঃ আইনষ্টাইনের সতর্কবাণীর গুরুত্ব বিশেষ-ভাবে অনুধাবন করলেন এবং এই বিষয়ে অনুসন্ধানকার্য আরম্ভ করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একদল বিজ্ঞানীকে সম্মিলিত করলেন। অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন এই বিজ্ঞানীদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। পরমাণু-বোমা সম্পর্কে তিনি কখনও কোন কাজ করেন নি। কারণ যে অস্ত্র মানুষের সর্বনাশ এবং অশান্তি সৃষ্টি করে তেমন অস্ত্র সম্পর্কে তিনি কোনদিন কাজ করতে পারতেন না।

১৯০৫ সালে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন যখন আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত তাঁর প্রথম গবেষণানিবন্ধ প্রকাশ করেন, তখন সেই নিবন্ধে ভর ও শক্তি সম্পর্কিত একটি গাণিতিক সূত্র ($E=mc^2$) লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকলে সেই সূত্রটি হৃদয়ঙ্গম করা একটু কঠিন।

সমস্ত বস্তু পরমাণু দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানীরা বলেন, জড়বস্তু হচ্ছে এমন জিনিস যার ওজন আছে, ভর আছে এবং বিস্তৃতি আছে। বস্তুর তিনটি রূপ—কঠিন, তরল ও বায়বীয়।

পরমাণুর কথা বলতে গেলে সোনা, রূপো বা লোহার মতো ধাতুর কথা ভাবা সহজ। এগুলি হচ্ছে মৌলিক পদার্থ এবং অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, তামা এবং ইউরেনিয়ম ইত্যাদি মৌল পদার্থের মতো এগুলিকে অন্য কিছুতে বিভক্ত করা বা ভাগ করা যায় না। কিন্তু জল মৌলিক পদার্থ নয়, এটি একটি যৌগিক

পদার্থ। কারণ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দুটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা জল গঠিত এবং একে এই দুটি পদার্থে বিশ্লেষণ করা যায়।

বিশ্বের সকল মৌলিক পদার্থই অণু দ্বারা গঠিত এবং প্রতিটি অণু আবার এক বা একাধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। কিন্তু পরমাণু মানুষের ধারণার বাইরে ক্ষুদ্র হলেও অবিভাজ্য নয়—অংশবিশেষে বিভাজ্য। এর কেন্দ্রে আছে প্রোটিন ও নিউট্রন সমন্বয়ে নিউক্লিয়স বা কেন্দ্রীন এবং নিউক্লিয়সের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায় ইলেকট্রন নামে অভিহিত ক্ষুদ্রতর কণিকা। এতে ব্যাপারটা যদি সুস্পষ্ট না হয়ে থাকে, আর এক দিক থেকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক। মঙ্গল, বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহসমেত এই সৌরজগতের কথা চিন্তা করা যাক। এই গ্রহগুলি নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে সর্বদা ঘুরছে। সৌরজগতের আয়তন ক্রমশ হ্রাস করতে করতে এমন ক্ষুদ্র করে ফেলো যাতে সেটাকে আর দেখা যায় না। তখন তুমি একটি পরমাণু পাবে—তার কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়স রূপে থাকবে সূর্য এবং ইলেকট্রনের মতো গ্রহগুলি তার চারদিকে ঘুরে বেড়াবে।

যে ডেস্ক-এর ওপর তুমি লিখেছ সেটা তোমার ধারণার মতো আপাতমৃত বস্তু নয়। সেটা একটা বিশ্বস্বরূপ—সেটা আবর্তনশীল সৌরজগতের পুঞ্জীভূত রূপ।

প্রত্যেক মৌলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরমাণু-বিন্যাস আছে। এই ব্যাপারটা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেনের পরমাণু-বিন্যাস সরলতম। কারণ এর পরমাণুর কেন্দ্রে আছে একটিমাত্র প্রোটিন এবং একটিমাত্র ইলেকট্রন নিউ-ক্লিয়সের চতুর্দিকে আবর্তন করে। রূপার পরমাণুতে নিউক্লিয়সের চারিদিকে ৪৭টি আবর্তনশীল ইলেকট্রন আছে। সীসা একটি অতি ভারী ধাতু, এর পরমাণুতে ৮২টি ইলেকট্রন নিউক্লিয়সের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। পরমাণুর এই গঠনবিন্যাস অপরিবর্তনীয়। যদি কোন সীসা পরমাণুতে নিউক্লিয়সের চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনের সংযোগ পরিবর্তনের জন্যে নিউক্লিয়সে কোন কিছু সংঘটিত হয়, তা হলে

সেই সীসা তখন আর সীসা থাকবে না, রূপান্তরিত হবে অন্য ধাতুতে। তখন তার আকৃতি-প্রকৃতি হবে ভিন্নপ্রকারের।

পরমাণু-শক্তি হচ্ছে সেই শক্তি যা কোন নির্দিষ্ট পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলিকে তাদের নিজস্ব নিউক্লিয়সের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে বিচরণশীল অবস্থায় ধরে রাখে। পরমাণুর অংশগুলিকে সম্মিলিতভাবে ধরে রাখে এই যে শক্তি তার পরিমাপ অতি প্রচণ্ড।

আইনষ্টাইন যখন ভর ও শক্তি সম্পর্কিত সূত্রটি উদ্ভাবন করেন, তখন তিনি বলেছিলেন ভর হচ্ছে বন্দী অবস্থায় রক্ষিত শক্তি এবং একদিন পরমাণু বিভাজন এবং শক্তি মুক্ত করার উপায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

৩৫ বছর পরে ১৯৩৯ সালে ডঃ জীলার্ডের গবেষণা-নিবন্ধের প্রতি যখন তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো, তিনি তখন এর অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। এই নিবন্ধে জীলার্ড বলেছিলেন যে, ইউরেনিয়ম মৌলের পরমাণু সাফল্যজনকভাবে বিচূর্ণ হয়েছে এবং এটা একটা প্রচণ্ড শক্তির উৎস বলে প্রমাণিত হয়েছে। আইন-ষ্টাইন জীলার্ডের পত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গে স্থির-নিশ্চিত হয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে তাঁর ঐতিহাসিক পত্রটি লেখেন।

ইতিমধ্যে মিটনার এবং অন্যান্য জার্মান বিজ্ঞানীরা অপর কোন তেজষ্ক্রিয় মৌল-উদ্ভূত বিকিরণ দ্বারা ইউরেনিয়ম পরমাণু আঘাত করে তাব বিভাজন সাধন করেন। এই বিকিরণগুলি ইউরেনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রে সরাসরি আঘাত করেছিল এবং তার ফলে নিউ-ক্লিয়স দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি বেরিয়ম এবং অপরটি একটি বিরল গ্যাস যেটাকে তারা ক্রিপটন বলে ভেবেছিলেন। বিভাজনকালে ইউরেনিয়ম পরমাণু থেকে যে প্রচণ্ড পরমাণুশক্তি বিমুক্ত হয় সেই শক্তি এই পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাতকারী শক্তির চেয়ে কমপক্ষে ৬০ লক্ষ গুণ বেশী।

বিশ্ব যে অগ্নিশিখায় ও ধূমজালে আচ্ছন্ন হতে চলেছে—সেটা

লক্ষ্য করে অধ্যাপক আইনষ্টাইন অধিকতর উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তিনি জানতেন, মানুষের প্রকৃত অভীপ্সা হচ্ছে বিশ্বশান্তি—মানুষ চিরকাল পরস্পরকে হত্যা করে ও ধনসম্পত্তি বিনষ্ট করে চলতে পারে না। বিশ্বে শান্তি ও সুখ স্থাপনের জন্যে তিনি তাঁর যথাসাধ্য করতে চেয়েছিলেন।

১৯৩৯ সালে গ্রীষ্মকালে তিনি 'শান্তি ও গণতন্ত্র এবং বিশ্বনেতা' নামক চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হতে সম্মত হয়েছিলেন। এই চলচ্চিত্রে কর্ডেল হাল, টমাস মান প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কেমন করে বিশ্বে শান্তি আনা যায় সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এই চলচ্চিত্রে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন বলেছিলেন, বিশ্বে শান্তিরক্ষার জন্য একটি বিশ্ব সরকার গঠন করতে হবে—যে বিশ্ব-সরকারকে পৃথিবীর সকল দেশ মানবে। নিউইয়র্ক বিশ্বমেলায় এই চলচ্চিত্রটি সহস্র সহস্র লোককে প্রতিদিন দেখানো হয়েছিল।

ইউরোপে সামরিক যন্ত্রসমূহ অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলছিল। দাবাগ্নির মত জার্মানদের বিজয়শিখা প্রসারিত হচ্ছিল এবং এক-বছরের মধ্যে নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স জার্মানীর পদানত হলো। এতে যে সংকেত পাওয়া গেল তা খুবই সুস্পষ্ট ছিল : হিটলার বিশ্বজয়ের জন্যে বদ্ধপরিকর। তাঁকে হারাতে হবে এবং তাঁকে যোগ্য উত্তর দেবার একমাত্র জিনিস হচ্ছে সৈন্যদল ও গোলা বারুদ।

অধ্যাপক আইনষ্টাইনের নেতৃত্বে সতেরজন বিজ্ঞানী প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছে এই মর্মে একটি পত্র প্রেরণ করলেন যে, গ্রেট-ব্রিটেন ও অন্যান্য মিত্রদলকে সাহায্য করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত করণীয়। বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবার পূর্বে হিটলারকে অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অধ্যাপক আইনষ্টাইন মনে করতেন, মানুষের পক্ষে যুদ্ধ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হচ্ছে যুদ্ধে যোগদানে অসম্মত হওয়া। কিন্তু যুদ্ধের সময় তাঁর চিন্তাধারা বহুল পরিমাণে

পরিবর্তিত হতে থাকে। হিটলার যখন রণমঞ্চে অবতীর্ণ, তখন যুদ্ধে যোগদানে অসম্মত হলে মানুষ নিজেই শুধু নিহত হবে।

১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্যে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে তিনি মনস্থ করেন।

তাঁর কন্যা মারগট এবং সচিব হেলেন ডুকাসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিউ জার্সির ট্রেনটন বিচারালয়ে পরীক্ষাদানের জন্যে উপস্থিত হলেন। মারগট ও ডুকাস ইতিমধ্যে ১৯৩৩ সালে ইউরোপ থেকে চলে এসে আইনষ্টাইন পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তাঁর মাথার চুল এখন তুষার-শুভ্র রূপ নিয়েছে এবং তাঁর বিনয়-নম্র করুণাঘন মুখমণ্ডলকে ঘিরে আলোক চক্রের মতো হয়েছে।

এই উপলক্ষে সাংবাদিকদল অবশ্য তাঁর অনুগমন করতে পেছপা হন নি। একজন সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাগরিকত্ব লাভের সম্ভাবনায় আপনি কি উৎফুল্ল বোধ করছেন?'

তিনি উৎফুল্ল হয়ে উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। কে না সুখী হবে!'

পরবর্তী নভেম্বর মাসের নির্বাচনে আইনষ্টাইন তাঁর ভোটাধিকার প্রথম প্রয়োগ করেন।

এক বছরের কিছু বেশি সময় পরে ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপানীরা পার্ল হারবারে মার্কিন নৌবাহিনীকে আক্রমণ করে। মিত্রপক্ষকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য করার প্রশ্ন তখন আর উঠল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন আপনা থেকে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ডঃ আইনষ্টাইন যুদ্ধের সময় পরমাণু বোমা বা অন্য কোন মারাত্মক অস্ত্র সম্পর্কে কোনরকম কাজ করেন নি। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র দপ্তরে গণিত বিষয়ক বিশেষ সমস্যার পরামর্শদাতা-রূপে তিনি কাজ করেছিলেন। প্রিন্সটন ইনষ্টিট্যুটে থেকেই তিনি এই কাজ করতেন।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত যুদ্ধকালীন বছরগুলির কাহিনী সকলেরই জানা। ইউরোপে হিটলারকে পরাজিত করার জন্যে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যু বরণ করেছিল এবং লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের সামগ্রীর প্রয়োজন হয়েছিল। 'ভি-ডে' বলতে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি বোঝায় নি। জাপানীদের সঙ্গে তখনও বোঝাপোড়া করবার ছিল।

১৯৪৫ সালে তাঁর ষট্‌ষষ্ঠিতম জন্মদিবসের অব্যবহিত পরেই ডঃ আইনষ্টাইন প্রিন্সটনের ইনষ্টিট্যুট-এর অ্যাড্‌ভান্সড্‌ স্টাডিতে তাঁর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু 'অবসরগ্রহণ' কথাটি যেন এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে। অধ্যাপক আইনষ্টাইনের মত কর্মঠ ও প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষে 'অবসরগ্রহণ' করা সম্ভব ছিল না। তিনি তখনও পর্যন্ত অত্যন্ত কর্মব্যস্ত লোক ছিলেন এবং ইনষ্টিট্যুটে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করতেন। তখন তাঁর সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, ১৯০৫ সালে তিনি যে গণিত তত্ত্ব-সমূহের অবতারণা করেন সেগুলিকে সম্পূর্ণ করতে হবে।

১৯৪৫ সালে গ্রীষ্মকালে তড়িৎগতিতে বিশ্বে ঘটনাসমূহ সংঘটিত হতে লাগল। ৬ আগষ্ট জাপানের হিরোশিমার ওপর প্রথম পরমাণু বোমা বর্ষিত হলো যা ইতিপূর্বে কখনও যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় নি। ১৯৪১ সালে পার্ল হারবার আক্রমণ যেমন আকস্মিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছিল, ঠিক তেমনি আকস্মিকভাবে চার বছর পরে পরমাণু-বোমা যুদ্ধের ছেদ টেনে দিল।

যুদ্ধের সবচেয়ে গোপনীয় তথ্য অকস্মাৎ ব্যক্ত হলো: পারমাণবিক পরিকল্পনার জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত তিনটি শহরের কথা প্রকাশ পেল। ১৯৩৯ সালে প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের কাছে অধ্যাপক আইনষ্টাইন পত্র লেখার পর থেকে পরমাণু-বোমা সম্পর্কে গবেষণারত লোকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় এক লক্ষে। এই বৈজ্ঞানিক কাজের অনেকটা গড়ে উঠে ১৯০৫ সালে সুইজারল্যাণ্ডে এক অপরিচিত তরুণ ইহুদী ছাত্রের রচিত গণিত-সূত্রের ওপর ভিত্তি

করে—যার মস্তকের জন্যে নাৎসীরা এক সহস্র পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

হিরোশিমায় পরমাণু বোমা যেদিন বর্ষিত হয় সেদিন ডঃ আইন-ষ্টাইন লেক সারান্যাকে অবসর যাপন করছিলেন। সাংবাদিকেরা যখন এ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তিনি তখন বিশেষ কিছু বলেন নি। এই বোমা-বর্ষণের কথা শুনে তিনি যে কত গভীর বেদনা পেয়েছিলেন, মানুষের মৃত্যুতে ও প্রলয়ংকর ধ্বংসকার্যে তাঁর অন্তর যে কি নিদারুণ মর্মাহত হয়েছিল তা কেউ কোনদিন জানবে না।

যে সাংবাদিকেরা সারান্যাকে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তাঁদের তিনি বলেছিলেন, পরমাণু শক্তি হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার, যেমন স্বাভাবিক হচ্ছে সারা-ন্যাক লেকে তাঁর নৌচালনা। অন্যান্য লোকের থেকে তিনিই এটা ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হবার পর এই পরমাণু শক্তি কী ভয়াবহ রূপে দেখা দেবে! মানুষের কল্যাণে এটি একটি প্রচণ্ড শক্তি হবে অথবা সমগ্র মানবজাতির বিনাশ সাধন করবে।

তিনি পত্রিকায় একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন, যতদিন পর্যন্ত না এই শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্ব সরকার গঠিত হয় ততদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হবে পরমাণু বোমার রহস্য গোপন রাখা।

পরবর্তী ব্রত যা তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন তা হচ্ছে তাঁর ধারণা মতো পরমাণু-শক্তির সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তোলা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিস্ময়কর, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

পরমাণুশক্তি প্রসঙ্গে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন বলেছিলেন : আমাদের রক্ষাকবচ অস্ত্রশস্ত্র, বিজ্ঞান, অথবা ভূনিম্নে গমনের মধ্যে নিহিত নয়, আমাদের রক্ষাকবচ হচ্ছে সুশৃঙ্খলা ও আইনপরায়ণতা।

পরমাণু শক্তির বিষয় আইনষ্টাইন গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং বিশ্বের অপর যে কেউ অপেক্ষা তিনি এই শক্তির সমস্ত বিপদ ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন পরমাণু শক্তির অপব্যবহার প্রতিরোধের জন্যে অবশ্যই কিছু করতে হবে এবং সে সম্পর্কে তাঁর কাজও আরম্ভ করেছিলেন

১৯৪৬ সালের মে মাসে অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে সভাপতি এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যারল্ড সি. উরে-কে সহ-সভাপতি করে পরমাণু বিজ্ঞানীদের জরুরী অবস্থার কমিটি গঠিত হলো। এই পরিকল্পনায় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিজ্ঞানজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা, যেমন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সেলিগ হেক্ট, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হানস্ এ. বেথে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক থরফিন আর. হগনেস্, ম্যাসাচুসেটস্ ইনষ্টিট্যুট অফ টেকনোলজির পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ফিলিপ এম. মোর্স, ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিট্যুট অফ টেকনোলজির রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক লাইনাস পাউলিং, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক লিও জীলার্ড

এবং ম্যাসাচুসেটস্ ইনষ্টিট্যুট অফ টেকনোলজির পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ভিক্টর এফ. ডিস্‌কফ।

এই সকল বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত হয়ে জরুরী কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত এই নতুন ও প্রলয়ঙ্কর শক্তি সম্বন্ধে মার্কিন জনসাধারণকে সচেতন করা। ডঃ আইনষ্টাইন ছাড়া অন্যান্য সকলেই যুদ্ধের সময় পরমাণু-শক্তি সংক্রান্ত কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই কমিটি গঠিত হবার পর থেকে তাঁরা পরমাণু-শক্তি সম্বন্ধে তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষামূলক অভিযান শুরু করলেন, যাতে জনসাধারণ পরমাণুশক্তি নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

কি উপায়ে এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হতে পারে? এই বিজ্ঞানীরা মনে করতেন নির্ভরযোগ্য বিশ্বসরকার গঠনই হচ্ছে এর একমাত্র উপায়। দ্বিধাবিভক্ত বিশ্বে, যে বিশ্বে শক্তিশালী জাতিসমূহ পরমাণু-বোমা প্রথমে প্রস্তুত করার জন্যে পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, সে-বিশ্বে কোন শান্তি থাকতে পারে না।

১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে আহূত কমিটির বিশেষ সভায় অনন্যসাধারণ বিজ্ঞানীদের প্রত্যেকেই এই সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন—ডঃ উরে, ডঃ হাগনেস্, ডঃ মরিসন, ডঃ জীলার্ড, অধ্যাপক হেক্ট।

পরবর্তী বক্তা হিসাবে ডঃ আইনষ্টাইনের পরিচয় যখন প্রদান করা হলো, কক্ষের অভ্যন্তরে সকলেই দাঁড়িয়ে উঠে হর্ষধ্বনি করলেন।

'পরমাণু-বোমা ও অন্যান্য জৈব অস্ত্রশস্ত্রের কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের যুদ্ধ থামাতে হবে। কারণ আমরা যদি যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে না পারি, তা হলে প্রত্যেক জাতি তার আয়ত্তাধীন যে-কোন পন্থা অবলম্বন করবে,' বললেন ডঃ আইনষ্টাইন।

তিনি মাত্র পাঁচ বা দশ মিনিটকাল বক্তৃতা করেছিলেন, কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি অনেক কিছুই বলেছিলেন।

উপসংহারে তিনি তাঁর সহযোগীদের বলেছিলেন : 'দেখো, আমি মনে করি জরুরী কমিটি সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে জোরালো মতবাদ না গড়ে উঠলে আমরা সত্যসত্যই ধ্বংস হয়ে যাব।...সুতরাং স্বল্প-কালের মধ্যে জনসাধারণকে মৌলিক ঘটনা সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এই হলো আমার একমাত্র বক্তব্য।'

তাঁর কথা শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তাঁরা উপলব্ধি করলেন, তিনি যথার্থ কথাই বলেছেন। মার্কিন জনসাধারণ এবং বিশ্বব্যাপী সকল মানুষকে যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে না পারার বিপদ ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। এই কাজই জরুরী কমিটি গ্রহণ করলেন।

জরুরী কমিটি গঠিত হবার দু-বছর পরে অধ্যাপক আইনষ্টাইন আর একটি সম্মান পেলেন 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড' পুরস্কার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যপাল, কংগ্রেসের প্রতিনিধি, সিনেটর, লেখক, শিক্ষক ও জননেতার শীর্ষস্থানীয়দের উদ্যোগে গঠিত ওয়ান ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড কমিটি তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করেন। ১৯৪৭-এর ২৭ এপ্রিল নিউইয়র্ক শহরের কার্নেগী হল-এ অধ্যাপক আইনষ্টাইন ও অপর দুজন মার্কিনকে একটি রূপোর ভূ-গোলক এবং ওয়েণ্ডেলউইলকী যে পথে সারা বিশ্ব পরিক্রমা করেছিলেন সেই পথ অনুসারী শুভেচ্ছা-দূতরূপে সারা বিশ্বভ্রমণের ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হলো।

শারীরিক অসামর্থ্যের দরুন আইনষ্টাইন স্বশরীরে সেই সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি, এই পুরস্কার গ্রহণে তাঁর সম্মতিপত্র সভায় তিনি প্রেরণ করেছিলেন। এই পত্রের অংশবিশেষে তিনি বলে-ছিলেন : 'মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যে কথা আমরা সকলের কাছে বিশেষভাবে বলব সেটা হচ্ছে এই যে, রাজনৈতিক জীবনে দৈহিক শক্তির একাধিপত্যের বিশ্বাস প্রাধান্য লাভ করতে পারে, কিন্তু এই শক্তি নিজেরই জীবনহানি করে এবং যে মানুষেরা এই শক্তিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের চিন্তা করে তাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী বলে

পথ জাতির ঊর্ধ্বে বিশ্বজনীন সংস্থা সংগঠনের পথ।

আমরা যদি ইচ্ছা করি, আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও বিস্ময়কর হবে। যে বিশ্বে প্রত্যেকটি মানুষকে স্বাধীনভাবে নিজের জীবন-যাপনের অধিকার দেওয়া হয় অর্থাৎ শান্তি ও সহনশীলতার বিশ্বে, সেখানেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে পারে।'

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

জীবনসায়াহ্নে

প্রিন্সটনে আসবার কিছুকাল পর থেকে আইনষ্টাইনকে একের পর এক প্রিয়পরিজন ও সুহৃদ্‌দের হারাতে হয়। ১৯৩৩ সালের শেষদিকে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পল এরেনফেস্টের মর্মান্তিক প্রয়াণ তাঁর মনে গভীর বেদনা সঞ্চার করে। হল্যাণ্ডের এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা ছিল। কিছুদিনের জন্যে হল্যাণ্ডে অবসর বিনোদন করতে গেলে তিনি এরেনফেস্ট পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করতেন অনেক সময়। শেষবারের মতো জার্মানী ছেড়ে তিনি যখন বেলজিয়াম ও ইংলণ্ড হয়ে প্রিন্সটনে আসেন, তখন বেলজিয়ামে আসবার আগে এই বন্ধুর গৃহে কয়েকদিন অতিবাহিত করেন এবং সেখান থেকে বার্লিনের প্রুশিয়ান আকাদেমির সদস্যপদ ত্যাগ করে পত্র দিয়েছিলেন। সেই হলো তুই বন্ধুর শেষ দেখা।

এরেনফেস্ট আত্মহত্যা করেছিলেন। এর কারণ যদিও জানা যায় নি, কিন্তু আইনষ্টাইনের মনে হয়েছিল—তাঁর বন্ধুর জীবনের শেষ কয়েক বছরের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর আত্মহননের নিগূঢ় কারণ। এই প্রসঙ্গে আইনষ্টাইন লিখেছিলেন: 'প্রতিভাধর মনীষীরা প্রায়ই এভাবে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন। কারণ পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে নতুন ও জটিল জীবনধারাকে মেনে নেওয়ার অপারগতা। নতুন ধারাকে মেনে নিতে না পারলে যে অসহনীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়,

তার থেকে পরিত্রাণের জন্যে এইভাবে মৃত্যুবরণ তাঁদের কাছে বাঞ্ছনীয় মনে হয়।'

১৯৩৪ সালের ৪ জুলাই আইনষ্টাইন হারালেন তাঁর আর একজন পরম অন্তরঙ্গ সুহৃদকে। তিনি মাদাম ক্যুরী। এই মহীয়সী নারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। তাঁর প্রয়াণে শ্রদ্ধা জানিয়ে আইনষ্টাইন লিখেছিলেন: 'তাঁর অপরিমেয় কর্মশক্তি, তাঁর পবিত্র সংকল্প, তাঁর কঠোর আত্মসংযম, তাঁর বাস্তবজ্ঞান, সততায় অটল তাঁর সিদ্ধান্ত—একজন মানুষের ভেতর এত গুণের সমন্বয় কদাচিৎ দেখা যায়।'

এরপর আইনষ্টানের ব্যক্তিগত জীবনে নেমে এলো একের পর এক প্রিয়জনের মৃত্যুর ছায়া। প্রিন্সটনে আসবার অল্প কিছুকাল পরে তাঁর সৎ বড় মেয়ে (এলসার প্রথম পক্ষের সন্তান) ইলসে প্যারিসে মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হন। সে খবর পেয়ে এলসা তাঁর ছোট মেয়ে মার্গটকে নিয়ে প্যারিসে এলেন। কিন্তু তাঁরা আসবার কয়েক দিনের মধ্যে ইলসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বড় মেয়ের অকাল মৃত্যুতে এলসা মনে কঠিন আঘাত পেলেন। শোকে মূহ্যমান হয়ে একটি পাত্রে মেয়ের দেহভস্মাবশেষ নিয়ে ভগ্নহৃদয়ে তিনি প্রিন্সটন ফিরে এলেন।

এই সময়ে আইনষ্টাইনের জন্যে ১১২ নম্বর মারসার ষ্ট্রীটে স্থায়ী বাড়ি তৈরী প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এলসা প্যারিস থেকে এসে সেই বাড়ির আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র দিয়ে সাজাবার তদারক করতেন। কিন্তু মেয়ের মৃত্যুশোক থেকে তিনি সেরে উঠতে পারলেন না। তিনি হৃদ্‌রোগে ও বহুমূত্রে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। দিনের দিন তাঁর অবস্থার অবনতি হতে লাগলো। আইনষ্টাইন বুঝলেন, এলসার জীবনীশক্তি শেষ হয়ে এসেছে। আইনষ্টাইনের বাইরের আচরণে এর প্রতিক্রিয়া দেখা না গেলেও তাঁর দেহে ও মুখে এলসাকে হারাবার আশঙ্কার ছাপ পড়েছিল। তিনি শীর্ণকায় হয়ে গেলেন।

বায়ু পরিবর্তনে এলসার স্বাস্থ্যের যদি উন্নতি হয় ভেবে ১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মকালে আইনষ্টাইন কানাডার মন্‌ট্রিলের একটি হ্রদের তীরে একটি সুন্দর বাড়ি ভাড়া করে সবাইকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সেখানে রোজ বিকেলে এলসাকে নিয়ে তিনি বাষ্পচালিত নৌকায় হ্রদের জলে বেড়াতেন। এলসার সেখানে খুব ভালো লাগলো এবং তাঁর স্বাস্থ্যেরও কিছুটা উন্নতি হলো। কিন্তু কঠিন রোগ থেকে তিনি সেরে উঠতে পারলেন না। ১৯৩৬ সালে ২০ ডিসেম্বর তিনি তাঁর প্রিয়তম অ্যালবার্টকে ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে গেলেন।

এলসার প্রয়াণেব পর মারসার স্ট্রীটের বাড়িতে আইনষ্টাইন তাঁর সৎ-মেয়ে মারগট ও একান্ত সচিব হেলেন ডুকাসকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। এখন থেকে মারগট তাঁর সৎ-বাবার সেবাযত্নের সব ভার তুলে নিলেন। ডুকাসও এবিষয়ে তাঁকে সাধ্যমতো সাহায্য করতেন। আর ছিল আইনষ্টাইনের প্রিয় টেরিয়ার কুকুর চিকো। মাঝে মাঝে দেখা যেত, মনিব রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে চিকো সামনে পিছনে ছুটোছুটি করে।

আইনষ্টাইনের মারসার ষ্ট্রীটের বাড়িটি ছিল দোতলা। বাড়ির দরজা পর্যন্ত রাস্তার দুধারে কাঁটা ঝোপের বেড়া। বাঁ দিকে একটি কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলা পর্যন্ত। দোতলায় আইনষ্টাইনের পাঠ-কক্ষের জানালার নিচে একটি সুন্দর বাগান। প্রবেশদ্বারের উল্‌টোদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে জানালা। বাঁদিকে ও পিছনের দেয়ালে বই-এর তাক। জানালার বাঁদিকে একটি বিশেষ জায়গায় গান্ধীজীর একটি ফটো। অহিংসার পূজারী গান্ধীজীর প্রতি আইনষ্টাইনের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর মহা-প্রয়াণে তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন: 'ভবিষ্যতের বংশধরেরা ভেবে বিস্মিত হবে যে রক্তমাংসে গড়া এমন একজন মানুষ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করেছিলেন।'

পড়বার ঘরের ডানদিকে দেয়ালে একটি দরজা ছাদে ওঠার জন্যে এবং আর একটি দরজা শোবার ঘরে যাবার জন্যে। এই দেয়ালে

আছে প্রখ্যাত চিত্রকর জোশেফ শার্লের আঁকা কয়েকখানা সুন্দর ছবি আর আছে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্যারাডে ও ম্যাকস্ওয়েলের ফটো। জানালার কাছে লেখাপড়া করবার জন্যে বড় আকারের একটি টেবিল আর তার পাশে একটি ছোট টেবিলে কতকগুলি পাইপ। ঘরে ঢোকবার দরজার পাশে থাকত একটি আরাম কেদারা। বেশির ভাগ সময় আইনষ্টাইন এই কেদারায় বসে হাঁটুর ওপর কাগজ রেখে তাঁর চিন্তায় যা আসত লিখতেন এবং লেখার পর কাগজগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলতেন।

প্রিন্সটনে আইনষ্টাইনের এই মারসার ষ্ট্রীটের বাড়িতে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বহু গুণীজন এসেছেন। তা ছাড়া এসেছেন নানা-ধরনের অগণিত মানুষ। ১৯৪৭ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী ও বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে নিয়ে এই বাড়িতে আইনষ্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

১৯৩৯ সালে আইনষ্টাইনের বোন মাজা ও তাঁর স্বামী ইতালির ফ্লোরেন্স শহর থেকে প্রিন্সটনে আইনষ্টাইনের কাছে চলে এলেন। তাঁদের ভাই বোনের চেহারায়, কথাবার্তায় ও আচরণে অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য ছিল।

প্রিন্সটনে এসে কয়েক বছর পরে মাজা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে তাঁর জীবনীশক্তি ক্ষয় পেতে থাকে। ১৯৪৭ সালে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি হতে লাগলো। এই সময় আইনষ্টাইন প্রায়ই বোনের শয্যাপাশে বসে তাঁদের প্রিয় লেখক গ্যেটে, শীলার প্রমুখের বই পড়ে শোনাতেন। ১৯৫১ সালের গ্রীষ্মকালে মাজা মারা যান।

এরপর শুধু মারগট ও হেলেন ডুকাসকে নিয়ে আইনষ্টাইন মারসার ষ্ট্রীটের বাড়িতে রইলেন। তাঁর সমমতের বিজ্ঞানী বন্ধুরাও একে একে প্রয়াণ করেন। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে আইনষ্টাইন তাঁর এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বন্ধু পল লাঁজভ্যাঁকে হারান। অন্যান্য সম-

কালীন বয়ঃকনিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা ছিলেন কণা-বলবিদ্যায় (Quantum Mechanics) বিশ্বাসী। তাই আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক কাজে তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। আইনষ্টাইন যদিও এই সব বিজ্ঞানীদের কাজকে কোনদিন অবহেলা করেন নি, কিন্তু বরাবর কঠিন সমালোচনা করে বলেছেন, এঁরা প্রকৃত সত্যকে জানতে পারছেন না।

তিনি নিজে এই সময় তাঁর 'একক ক্ষেত্র তত্ত্ব' (Unified Field Theory) প্রতিষ্ঠিত করতে গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, এই একটিমাত্র তত্ত্বের সাহায্যেই মহাকর্ষ শক্তি, তড়িৎ চৌম্বক শক্তি ও পরমাণু-কেন্দ্রীন শক্তি তথা বস্তুজগতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করবার পথ সুগম হয়ে উঠতে পারে। কয়েকটি বিভিন্ন সমীকরণ গোষ্ঠীর তুলনামূলক যোগাভার উপর ভিত্তি করে তাঁর এই মতবাদ গঠিত হয়। কিন্তু কয়েকটি গাণিতিক অসুবিধার দরুন পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই মতবাদ যাচাই করে দেখা এখনও সম্ভব হয় নি। এই গাণিতিক অসুবিধা দূরীকরণে আমাদের দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন এবং আইনষ্টাইন জীবিত থাকা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এবিষয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আইনষ্টাইন তাঁর প্রয়াসে সম্পূর্ণ সফল হতে না পারলেও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন : পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ না করে প্রথমেই এমন কথা বলা যায় না যে, এরূপ একটি তত্ত্ব শক্তি কণিকারূপকে ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

আইনষ্টাইন তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরমাকাঙ্ক্ষিত একক ক্ষেত্র তত্ত্বের সমাধানের জন্যে পূর্ণ মননশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন, কিন্তু সাফল্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হতে পারেন নি। কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। আইনষ্টাইন তাঁর আত্মজীবনীর শেষ অনুচ্ছেদে দীর্ঘকালব্যাপী একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সমাধানের নিরন্তর প্রয়াসের কথা লিখে শেষ করেছেন একটি উদ্ধৃতি দিয়ে : 'The search for truth is more precious than its

possession' (সত্যকে পাওয়ার চেয়ে সত্যের অনুসন্ধান বেশি মূল্যবান)। সেই সত্যেরই অনুসন্ধান তিনি করে গেছেন সারা জীবন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মহাপ্রয়াণ

১৯৪৯ সালের গোড়ায় আইনষ্টাইন পেটে তীব্র ব্যথায় কষ্ট পেতে থাকেন। চিকিৎসকরা নানাভাবে পরীক্ষা করে কিছু স্থির করতে না পেরে ক্যানসার বলে সন্দেহ করেন। নিশ্চিত হবার জন্যে তাঁর পেটে অস্ত্রোপচার করা হলো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দেখা গেল, তাঁরা যা সন্দেহ করছিলেন তা নয়। তারপর আইন-ষ্টাইন ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে বাড়িতে ফিরে এলেন।

এদিকে ১৪ মার্চ তাঁর জন্মদিন এসে গেল। এবারের জন্ম-দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটি তাঁর ৭০তম জন্মদিন। এই দিনটির বেশির ভাগ সময় তিনি কাটালেন তাঁর ছোট বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা ও গল্প করে।

৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বহুজন তাঁকে অভিনন্দন পত্র পাঠালেন। এইসব চিঠির উত্তরে অন্তরঙ্গদের তিনি যা লিখেছিলেন তাতে তাঁর নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতা বোধের আভাস পাওয়া যায়। প্রিয় বন্ধু সোলোভিনকে তিনি লিখেছিলেন : 'তোমার প্রীতিপূর্ণ চিঠি আমার মর্ম স্পর্শ করেছে। এই অস্বস্তিকর দিন উপলক্ষে অন্য যে অগণিত চিঠি আমি পেয়েছি, সেগুলির সঙ্গে তোমার চিঠির তফাৎ অনেক। তুমি মনে করেছ, আমি আমার কাজ স্মরণ করে মনে শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করি। কিন্তু গভীরভাবে যাচাই করে দেখলে বোঝা যাবে, ব্যাপারটা অতটা আনন্দদায়ক

নয়। এমন কোনো ধারণা নেই যে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত হতে পারি। এমন কি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি ঠিক পথে চলেছি কিনা। সমকালীন বিজ্ঞানীরা আমাকে প্রচলিত মতবাদের বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করেন। তাঁদের মত অনেকটা যেন এই যে, আমার দিন শেষ হলেও আমি বেঁচে রয়েছি।'

বস্তুত, আইনষ্টাইন চিরদিনই ছিলেন নিঃসঙ্গ পথের পথিক এবং এইভাবেই তাঁকে শেষ দিন পর্যন্ত চলতে হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে তিনি প্রিন্সটনের ইনষ্টিট্যুট-এর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু একক ক্ষেত্রতত্ত্বের সমাধানের কাজ থেকে নিরত হন নি, বরং পূর্ণ শক্তি নিয়ে তাতে আত্মনিয়োগ করেন। এই বছরেই ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আইনষ্টাইনের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে ইজরায়েলের প্রথম রাষ্ট্রপতি ওয়াইজম্যান প্রয়াত হলে সেখানকার অধিবাসীরা আইনষ্টাইনকে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানান। আইনষ্টাইন কিন্তু এই পদ গ্রহণে সম্মত হলেন না। তিনি প্রস্তাবকদের কাছে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে লিখলেন: 'মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কোন জ্ঞানই আমার নেই। সুতরাং এই পদ গ্রহণে আমি নিতান্ত অনুপযুক্ত।'

১৯৫৫ সালে এপ্রিল মাসের গোড়ায় আইনষ্টাইনের সৎ-মেয়ে মারগট বাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্যে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। তখন প্রতিদিন আইনষ্টাইন হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যেতেন। এদিকে ১৩ এপ্রিল তিনি নিজে পেটের ডান পাশে তীব্র ব্যথা বোধ করতে লাগলেন। মারগট যে হাসপাতালে ছিলেন সেখানেই আইনষ্টাইনকে চিকিৎসার জন্যে ভর্তি করা হলো। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করলেন পিত্তকোষের স্ফীতি। তাঁরা বললেন, ব্যথা উপশমের জন্যে অস্ত্রোপচার করা দরকার। আইনষ্টাইন অস্ত্রোপচারে সম্মত হলেন না।

তাই আর অস্ত্রোপচার করা হলো না। বিনা অস্ত্রোপচারে তাঁর চিকিৎসা চলতে লাগলো।

১৭ এপ্রিল সন্ধ্যাবেলায় মারগটকে চাকা লাগানো চেয়ারে বসিয়ে আইনষ্টাইনের শয্যাপাশে আনা হলো। মেয়েকে দেখে আইনষ্টাইন খুশী হলেন এবং তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তাও বললেন। তারপর শুভরাত্রি জানালে মারগটকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

মাঝরাতের কিছু পরে কর্তব্যরতা নার্স আলবার্তা রোজেল লক্ষ্য করলেন, আইনষ্টাইন ঘুমের মধ্যে জোরে জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করছেন। ভয় পেয়ে তিনি দরজার কাছে ছুটে গেলেন চিকিৎসককে ডাকতে। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছবার আগে তিনি শুনতে পেলেন রোগী জার্মান ভাষায় বিড় বিড় করে কিছু বলছেন। কিন্তু কুমারী রোজেল জার্মান ভাষা জানতেন না। তাই বুঝতে পারলেন না কি তিনি বলছেন। আইনষ্টাইনের শয্যার কাছে তিনি ছুটে এলেন। এসে দেখলেন, মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তখন রাত একটা বেজে পঁচিশ মিনিট। অন্তিম মুহূর্তে আইনষ্টাইন কি কথা উচ্চারণ করেছিলেন তা আর জানবাব উপায় রইল না এবং কোনোদিন কেউই আর তা জানতে পারবেন না!

বেতারের মারফৎ সারা বিশ্বে শোকসংবাদ ছড়িয়ে পড়লো: ১৮ এপ্রিল রাত ১-২৫ মিনিটে প্রিন্সটন হাসপাতালে বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী মহান মানব-প্রেমিক অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন মহাপ্রয়াণ করেছেন।

১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন যে আপেক্ষিকতাবাদ মহাতত্ত্বের কথা ঘোষণা করে বিজ্ঞান জগতে এক নবযুগের প্রবর্তন করেছিলেন, সেই আপেক্ষিকতাবদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল।' সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজন যখন চলছিল, তার মাত্র তিন মাস আগে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের তিরোধান ঘটলো। তাঁর তিরো-

খানে শুধু বিজ্ঞানীরাই হারালেন না তাঁদের যুগস্রষ্টা মহাগুরুকে; বিশ্বের সর্বসাধারণও হারালেন তাঁদের পরম সুহৃদকে।

আইনষ্টাইন আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মহা-জীবনের কথা, বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর দরদের কথা, বিশ্বশান্তি রক্ষায় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের কথা আজ আমরা তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং যুগ যুগ ধরে মানুষ তা স্মরণ করবে।

পরিশিষ্ট

জীবনপঞ্জী

১৮৭৯—১৪ মার্চ	:	জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশের উলম শহরে জন্ম।
১৮৮০—		মিউনিক শহরে পারিবারিক স্থানান্তর।
১৮৮৫—		মিউনিকের ক্যাথলিক স্কুলে ভর্তি।
১৮৮৯—		মিউনিকের লুইটপোলড্ জিমনাসিয়ামে ভর্তি।
১৮৯৪—		ইটালীর মিলান শহরে পারিবারিক স্থানান্তর।
১৮৯৫—		উচ্চ শিক্ষার জন্যে জুরিখে আগমন।
১৮৯৫—৯৬		অ্যারাউ-এর ক্যানটোনাল স্কুলে শিক্ষা।
১৮৯৬—অক্টোবর	:	জুরিখের সুইস ফেডারেল পলিটেকনিকে প্রবেশ।
১৯০০—জুলাই	:	জুরিখ পলিটেকনিক থেকে স্নাতক।
১৯০১—২১ ফেব্রুয়ারি	:	সুইস নাগরিকত্ব গ্রহণের আবেদন মঞ্জুর।
১৯০২—২৩ জুন	:	সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন শহরে পেটেণ্ট অফিসের কাজে যোগদান।
১৯০৩—৬ জানুয়ারি	:	জুরিখ পলিটেকনিকের সহপাঠিনী মিলেভা মারিকের সঙ্গে বিবাহ।
১৯০৪—		'গ্যাসের গতীয় তত্ত্ব' সংক্রান্ত গবেষণাপত্রের জন্যে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-ফিল ডিগ্রী লাভ। প্রথম সন্তান হানস্-এর জন্ম।
১৯০৫—		পেটেণ্ট অফিসে কর্মরত অবস্থায় 'অ্যানালেন দের ফিজিক' পত্রিকায় 'বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' সংক্রান্ত গবেষণাপত্র প্রকাশ ও বিজ্ঞানজগতে আলোড়ন।
১৯০৯—৬ জুলাই	:	পেটেণ্ট অফিসের কাজ থেকে পদত্যাগ এবং জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক পদ গ্রহণ।
১৯১০—জুন	:	দ্বিতীয় পুত্র এডওয়ার্ডের জন্ম।
১৯১১—মার্চ	:	প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকপদ গ্রহণ। বেলজিয়ামের ব্রুসেল শহরে প্রথম সল্‌ভে কংগ্রেসে যোগদান।

১৯১২—আগস্ট	:	জুরিখ পলিটেকনিকে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত।
১৯১৪—৬ এপ্রিল	:	বার্লিনে আগমন ও প্রুশিয়ান বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য নিযুক্ত।
১৯১৫—		'সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' প্রকাশ। সুইজারল্যাণ্ডে রোঁমা রোঁলার সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন বিষয়ে আলোচনা।
১৯১৯—১৪ ফেব্রুয়ারি	:	মিলেভার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ।
—২৯ মে	:	পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময় সাধারণ 'আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' পরীক্ষিতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত।
—২ জুন	:	খুড়তুতো বোন এলসাকে বিবাহ।
১৯২১—		'ফটো-ইলেকট্রিক তত্ত্ব'-এর জন্যে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ।
—১৯ মার্চ	:	জেরুজালেমে নির্মীয়মাণ হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বার্লিন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা।
—১৫ এপ্রিল	:	কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান।
—৯ মে	:	প্রিনস্টন পরিদর্শন।
—৮ জুন	:	গ্রেট ব্রিটেনে প্রথমবার পদার্পণ ও মাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আপেক্ষিকতাবাদ' সম্পর্কে বক্তৃতা দান।
১৯২২—২৮ মার্চ	:	ফরাসী বিজ্ঞানী পল ল্যাঁজভাঁ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে প্যারিসে আগমন এবং কলেজ দ্য ফ্রান্স-এ মাদাম ক্যুরী, ল্যাঁজভাঁ, বার্গসন প্রমুখের উপস্থিতিতে বক্তৃতা প্রদান।
—নভেম্বর-ডিসেম্বর	:	এক মাসের জন্যে জাপান পরিদর্শন।
১৯২৩—২ ফেব্রুয়ারি	:	তেল আভিভ-এ আগমন।
—৭ ফেব্রুয়ারি	:	হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং তেল আভিভের মুক্ত নাগরিক-এর সম্মানে ভূষিত।

১৯২৪—জুলাই		তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'প্লাঙ্ক সূত্র ও আলোক-কোয়ান্টা প্রকল্প' সংক্রান্ত গবেষণা-পত্র-এর অভিনবত্বে বিশেষভাবে আকৃষ্ট এবং স্বয়ং জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে 'ৎসাইটশ্রিফট ফ্যুর ফিজিক' পত্রিকায় প্রকাশ।
১৯২৫—	:	বার্লিনে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং 'বোস সংখ্যায়ন' সম্পর্কে নানা আলোচনা।
১৯২৯—	:	বার্লিনের সন্নিকটে ক্যাপুথে নিজস্ব গৃহ নির্মাণ।
১৯৩০—১৪ জুলাই	:	ক্যাপুথ আবাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং 'সত্যের প্রকৃতি' সম্পর্কে আলোচনা।
১৯৩৩—১০ মার্চ	:	জার্মানী পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৭—অক্টোবর	:	হিটলারের সর্বময় ক্ষমতা লাভে এবং জীবনের বিপদাশঙ্কায় চিরদিনের জন্যে জার্মানী পরিত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন। প্রিনসটনের ইনস্টিট্যুট অফ অ্যাডভানসড স্টাডি-তে অধ্যাপক রূপে যোগদান।
১৯৩৬—১০ ডিসেম্বর	:	পত্নী এলসার মৃত্যু।
১৯৩৯—২ আগস্ট	:	পরমাণু বোমা তৈরির পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ হবার জন্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে চিঠি।
১৯৪৫-	:	প্রিন্সটনে অধ্যাপকের পদ থেকে সরকারীভাবে অবসর গ্রহণ। পরমাণু-শক্তি যাতে মানুষের ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত না হয়, তার অনুরোধ জানিয়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে চিঠি।
১৯৪৯—৫০	:	'একক ক্ষেত্র তত্ত্ব' সংক্রান্ত গবেষণাপত্র প্রকাশ।
১৯৫৫—৫ এপ্রিল	:	বিশ্ব শান্তি রক্ষায় ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর প্রদান।
১৯৫৫—১৮ এপ্রিল	:	মধ্যরাত্রের এক ঘণ্টা পরে, ১-২৫ মিনিটে ৭৬ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ।